ডাক্তারের ডায়েরী

ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—কার্তিক, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—দেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস,
২১১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
অহিভূষণ মল্লিক
ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইন্ডার্স

তিন টাকা পঞ্চাশ ন.প.

আমার স্ত্রী মায়াকে—

বেঁচে থাকলে আজ যে সবচেয়ে বেশী খুশী হত

এই ডায়েরী যদিও আমারই লেখা, তবু কোনোদিন এটা লেখা হত না, যদি না আমার লক্ষ্মীছাড়া ভাগ্নেটার চোখে সেবার টিউবার-কুলোসিস হত। ঐ হতভাগাটা কোত্থেকে যে এই সাংঘাতিক রোগ বাধিয়ে এল, পুরো একটি বছর ওর পেছনে আমাকে খাটতে হল। ভাগ্যিস স্ট্রেপ্টোমাইসিন ছিল, পি এ এস ছিল, তাই শ্রীমান এ যাত্রায় বেঁচে গেল। সেরে উঠল।

ও যদিও বাঁচলো, কিন্তু আমাকে ফাঁসিয়ে গেল। একদিন অন্তর একদিন ইন্‌জেক্‌শন নিতে আসত। ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে তবে উঠত। একদিন হঠাৎ ধরে বসল, তোমার রোগীদের নিয়ে একটা ফীচার লেখ, খুব কাটবে।

শ্রীমান নিজে সুসাহিত্যিক। রম্যরচনায় পাকা হাত। নাম-করা কয়েকখানা গ্রন্থের রচয়িতা। তার ওপর খবরের কাগজের রিপোর্টার। সব কিছুতেই গল্পের উপাদান দেখে।

নিজে এতদিন বিনা পয়সায় আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিচ্ছে তাতেও ওর মন ভরল না। এখন আবার লেখা বার করতে চায়। এ না হলে আর ভাগ্নে ?

প্রথমে তো ওর কথা হেসেই উড়িয়ে দিলাম। ভাগিয়ে দিলাম। কিন্তু অত সহজে হটবার পাত্র শ্রীমান গৌর নয়। তখন থেকে রোজ এসে আমাকে ওসকাতে লাগল। ফাঁপিয়ে ফুসলিয়ে লেখাবার চেষ্টা করতে লাগল।

দেখলাম, চাটুবাক্য সত্যি বড় মধুর। তোমার মধ্যে অনেক গুণ আছে, প্রতিশ্রুতি আছে, পাবলিকের তা জানবার অধিকার আছে, এসব কথা শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে। নিজেকে অনেক বড় মনে হয়। তুমি গুণী, তোমার শিল্পী-মন, কিন্তু খুব র‍্যাশনাল, একবার যদি লিখে ফেল ইত্যাদি কথার কেমন যেন একটা জাদু আছে। মোহ আছে।

বলব কি, ওর কথায় সত্যি একদিন ফাঁদে পা দিলাম। কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। রাত জেগে দু-পাতা লিখে ফেললাম।

পরদিন গৌর এসে দেখে মহা খুশী। বলল, চমৎকার হয়েছে। লিখে যাও। খুব ভাল হবে।

এর আগে দুটি একটি প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছু কখনও লিখিনি। সংলাপ কি করে লেখে তা জানতাম না। গৌর সেটি শিখিয়ে দিল। এখানে দু-লাইন কেটে, ওখানে এক লাইন বসিয়ে, কোথাও বা দুটি একটি কথা যোগ করে। দেখলাম তাতেই যেন গোটা লেখাটাই বদলে গেল। অনেক বেশী সুপাঠ্য হল।

এমনি করে তিনটি লেখা শেষ হল। গৌর নিয়ে 'দেশ' পত্রিকার আপিসে সেটি দিয়ে এল।

আমার অনুজ-তুল্য বন্ধু সাগরময় ঘোষ তখন 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। একদিন দেখা হতে বলল, আপনার লেখা পড়লাম। খুব ভাল হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে 'দেশে' ছাপা হবে। কিন্তু আরও লেখা চাই। মাসে ক-টা এরকম লিখতে পারবেন?

ক-টা যে পারব তা জানব কি করে? আগে কি কখনও লিখেছি নাকি? একটু সংকোচের সঙ্গেই বললাম, ধর যদি দুটো করে লিখি?

সাগর বলল, চারটে হলে ভাল হত। প্রতি সপ্তাহে বার করা যেত। তা আপনি না হয় দুটো করেই লিখুন। কিন্তু দেখবেন যেন বাদ না যায়।

সাগরেরই দেওয়া নাম 'ডাক্তারের ডায়েরী'। প্রথম কিস্তি 'দেশে' বেরিয়ে গেল।

একদিন বিকেল বেলা বাড়ি ফিরে দেখি এক ভদ্রলোক আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। বললেন, সাগরের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে এখানে এসেছেন। ইনিই বেঙ্গল পাবলিশার্স। শচীনবাবু।

বললেন, 'দেশে' লেখা শেষ হলে বইটা ছাপাতে চাই।

শুনে আমি তো হতভম্ব! ভদ্রলোক বলেন কি? লেখাই মোটে হল না, এখনি বই ছাপার কথা? প্রকাশক নিজে আমার বাড়িতে?

এত বড় একজন প্রকাশক নিজে যখন এসেছেন, মনে হল, আমার লেখার নিশ্চয় একটা বাজার দর আছে। চাহিদা আছে। মনে খুব গর্ব হল।

বললাম, লেখা শেষ হোক আগে। তার পর তো বই-এর কথা।

ভদ্রলোক বললেন, সাগরবাবু বলেছেন, লেখা এখন অনেক দিন চলবে। তাই আগে-ভাগেই কথা পাকাপাকি করে নিতে চাই।

প্রথমে গৌর তারপরে সাগর, দেখুন কোথা থেকে কোথায় আমায় নিয়ে এল। ডাক্তার থেকে লেখক। লেখক থেকে গ্রন্থকার।

ভদ্রলোককে বিদায় করবার জন্য বললাম, বেশ তো সাগর যদি বলেই থাকে তাই হবে। লেখা শেষ হলে আপনিই না হয় ছাপবেন।

তারপর একদিন সাগর আমায় শচীনবাবুর আপিসে নিয়ে গেল। কথা পাকা হয়ে গেল। গৌর শুনে বলল, খুব ভাল হয়েছে। তুমি এবার এনতার লিখে যাও।

দেখুন, হতভাগাটা কি করে আমায় ফাঁসালো। এতদিনে ওর ইনজেকশন নেওয়া শেষ হয়েছে। এ-মুখো আর হয় না। এদিকে এক সপ্তাহ অন্তর 'দেশে' লেখা চাই। কিন্তু কি লিখি? কাকেই বা দেখাই। গৌরের কোনো পাত্তা নেই। শুনলাম রিপোর্টিং নিয়ে শ্রীমান নাকি এখন খুব ব্যস্ত। এখানে আসার আর ফুরসত নেই। দেখুন আমাকে

ডুবিয়ে লক্ষ্মীছাড়াটা কেমন অনায়াসে কেটে পড়ল। আমি হাবুডুবু খাচ্ছি জানে, তবু কড়ে আঙুলটি বাড়িয়েও আর ধরতে এল না। এ না হলে আর ভাগ্নে ?

লেখা শুরু হয়েছিল গৌরের তাগিদে। শেষ হল সাগরের তাগাদায়। বই ছাপা হচ্ছে শচীনবাবুর গরজে। 'ডাক্তারের ডায়েরী'র এইটুকুই ভূমিকা।

গ্রন্থকার

এই ডায়েরীতে বর্ণিত চরিত্র সবই কাল্পনিক

॥ ১ ॥

বিনায়ক শর্মা যদিও আমাদের সঙ্গেই ম্যাট্রিক পাশ করে তবু ওর সঙ্গে আমার কোনোদিন আলাপ ছিল না। না থাকবার কারণও ছিল। ও পড়ত কলকাতায় আর আমি মফস্বলে। আমি যখন বি. এস-সি পাশ করে কলকাতায় এসে মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হয়েছি তখন বিনায়ক সায়েন্স কলেজে কেমিস্ট্রিতে এম. এস-সি পড়ে। তারপর দু-বছর পরে ভাল করে পাশ করে হঠাৎ একদিন ল কলেজে ভরতি হয়ে যায়। পিতা বিরক্ত হন, বন্ধুরা অবাক হয় কিন্তু বিনায়ক অটল। সে ঠিক করে ফেলেছে আইন শিখে হাইকোর্টেই প্র্যাক্‌টিস্‌ করবে এবং অবশেষে তাই করল। প্র্যাক্‌টিস্‌ বিশেষ জমলো না। কিন্তু তাতে দমে যাবে এমন পাত্র বিনায়ক নয়। একখানা একখানা করে আইনের কেতাব কিনে কিনে বিরাট একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলল। আর দিনরাত ঐ আইনের ব্যাখ্যায় ডুবে রইল। বয়েস বেড়ে বেড়ে যে পঞ্চাশের কোঠায় পড়ল সে খেয়াল আর হল না।

ঠিক এই সময় ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। ওর বাড়ির সামনেই আমার ডিস্‌পেন্সারি। সকাল নটার সময় যখন দোকান খুলে আমি বসতাম, দেখতাম বিনায়ক আদালতে যাবার পোশাক পরে উল্টো দিকের ট্রামে উঠে বসল। পরে শুনেছি উল্টো ট্রামে ওঠার অর্থ হল ভাল করে বসবার একটি জায়গা পাওয়া। ডিপো ঘুরে এই ট্রামই যখন হাইকোর্টের দিকে যাবে তখন তাতে ওঠা কোনো ভদ্রলোকের কর্ম নয়। এ কথা বিনায়কই আমায় বলেছে: বলেছে—এই জন্যই মশাই একটু আগেই আমি বেরুই। ডিপো ঘুরে ফিরে আসতে বড় জোর দশ পনের মিনিট বেশী লাগবে। না হয় একটু আগেই বাড়ি থেকে বেরুলাম। তবু একটা বসবার জায়গা তো পাব। কি বলেন? আমি সায় দিয়ে বলেছি—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা তো ঠিকই।

রোজই ডিস্‌পেন্সারি থেকে বিনায়ককে দেখি কিন্তু আলাপ হয় না। আমার কম্পাউণ্ডার দেখলাম সব খবর রাখে। বললে—ঐ ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে। এখনও বিয়ে থা করেনি। বাড়িতে শুধু বুড়ী মা আর ঐ ছেলে। অতবড় বাড়ির মালিক তবু ট্রামে যাতায়াত

করবে। একে কঞ্জুস তার ওপর বদমেজাজী। তাই ঝি-চাকর বাড়িতে টেঁকে না। বুড়ী মা রাঁধে তাই মায়ে-ছেলে খায়। মক্কেল তো একটিও ঢুকতে দেখি না, তবু নাকি দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকে। অত পড়লে প্র্যাক্‌টিস হয় কখনও?

নতুন ডিস্‌পেন্সারি খুলেছি, রুগীপত্তর বড় একটা কেউ আসে না। যা-ও বা দু একটি আসে তাও হয় এক প্যাকেট অ্যাস্‌প্রো নয় দুটো বাইকোলেটের খদ্দের। বেশীর ভাগ সময় তাই বসেই কাটাতে হয়।

পড়বার সময় হাসপাতালে যখন ডিউটি করেছি এমারজেন্সীতে তখনও কতদিন থাকতে হয়েছে বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা অবধি একটানা ছোট্ট একটা টুলে বসে। কতদিন একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট কেসও সে সময় আসেনি। তখন ডিউটির সময় কেস্ না এলেই লাগত ভাল। মনে হত আনন্দ। ঠিক যেমন ক্লাসে একদিন মাস্টার না এলে ছেলেদের মনে হয়। কেস্ না এলেই আড্ডাটা জমত ভাল আর তাতেই ছিল মজা। এখন ডিস্‌পেন্সারি খুলে কখন রুগী আসবে সেই আশায় চুপটি করে বসে থাকি, কিন্তু রুগী আসে না; এখন টের পাই কাকে বলে মজা!

কম্পাউণ্ডারটি বলে—এমনি করে চুপ-চাপ বসে থাকলে স্যার রুগী কখনও আসে? আর প্রেস্‌কৃপ্‌শন না হলে কি দোকান কখনও চলে? বাইরে বেশ বড় করে সাইনবোর্ড লিখে দিই স্যার, এখানে রোজ সকাল বিকাল এক ঘণ্টা করে গরীব রুগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। তাইতে দেখবেন কিছু কিছু রুগী আসবেই। আর তাদের ভেতর থেকে বেছে নেব এখন কার ট্যাঁকে কী আছে। দোকানের খরচা তুলতে হলে স্যার রোজ অন্তত চারখানা প্রেস্‌কৃপ্‌শন চাই দু টাকা করে। আট দাগের মিকশ্চার দেড় টাকা আর পুরিয়া কি মলম একটা আট আনা। অষুধের দাম ছ আনা আর শিশি বোতল লেবেল কাগজ ধরুন গিয়ে দু আনা। বাকী দেড় টাকা লাভ।

—লাভটা তো বেশ কষেছ দেখছি। কিন্তু বিনামূল্যে চিকিৎসার খরচাটা?

—সে স্যার আপনি ভাববেন না। লাল, সবুজ আর শাদা এই তিন রকম মিকশ্চার দিয়ে সে আমি ম্যানেজ করে নেব। চারখানা দু টাকার প্রেস্‌কৃপ্‌শন তো আগে আসুক, দেখবেন ফ্রি অষুধের বোতল সব সময় ভরতি থাকবে।

ডাঃ সেন আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র। কন্‌সালট্যাণ্ট প্র্যাকটিস্

করেন। সেদিন ক্লাবে জেনারেল প্র্যাক্‌টিস্‌ নিয়ে কথা হতে বলছিলেন—বিনাপয়সায় রুগী দেখে আর অষুধের দাম বেশী নিয়ে ডাক্তাররা প্রফেশনটাকেই ডিজেনারেটেড করে ফেলেছে। রুগী দেখে তুমি যে ব্যবস্থা দিলে তার দাম রুগী কেন দেবে না? রুগীর অবস্থা বুঝে তুমি কম ফী নিতে পার, বিনা পয়সাতেও দেখতে পার। কিন্তু অষুধের দাম বেশী নেবে কেন? একটা মিকশ্চারে যদি আট আনা খরচ হয় তার দাম দেড় টাকা নেওয়া জোচ্চুরী—ব্ল্যাক-মার্কেটিং। রুগী দেখে তুমি বরং এক টাকা ফী নাও; কিন্তু অষুধের দাম নাও আট আনা। তাতে তোমার এথিক্স ঠিক থাকবে; রুগীরও মর‍্যাল ইম্‌প্রুভ করবে। রুগী দেখে ব্যবস্থা দেওয়া যে একটা স্কিল্‌ড্‌ লেবার এবং তারও একটা মূল্য আছে তা লোকে বুঝবে।

কম্পাউণ্ডারকে বলতে সে তো হেসেই কুটিকুটি। বললে—এই এড্‌ভাইস মত চললে স্যার দোকান লাটে উঠতে তিনটি মাসও লাগবে না। বড় বড় লোকের স্যার বড় বড় কথা! আমরা তো তবু আট আনা খরচা করে তবে দেড় টাকা কি এক টাকা লাভ করি। আর উনি নিজের ঘরে বসে রুগীর শুধু নাড়ী টিপে, বুক পিঠ আঙুল দিয়ে টকাটক্‌ বাজিয়ে যে ষোলটি করে টাকা নেন সেটা কি? ব্ল্যাক-মার্কেটিং নয়? ফীই যদি দেবে স্যার তাহলে নতুন ডাক্তারের দোকানে আসতে তাদের ভারি বয়ে গেছে! অষুধের দাম ও-রকম সস্তা করলে লোকে কী বলবে জানেন? বলবে—ঐ ডাক্তার অষুধ না দিয়ে জল রং করে অষুধ বলে চালায়। এ যদি না বলে স্যার কম্পাউণ্ডারী আমি আর করব না। নিজের দু-কান মলে বাড়ি গিয়ে চাষবাস করব। এইত বক্‌সীবাবু এসেছেন, দেখুন না ওঁকে জিজ্ঞেস করে।

বক্‌সী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একই স্কুলে লেখাপড়া শিখেছি, একই কলেজ থেকে বি. এস-সি পাশ করেছি। কম বয়সে একটা ফ্যাক্টরীতে ঢুকে এখন ইন্‌স্‌পেক্‌টর। দিনের বেলা আপিস করে, সন্ধে বেলা আড্ডা দেয়। আমার নতুন দোকান, রুগীর ঝামেলা নেই। আড্ডা দেওয়ার এমন উৎকৃষ্ট জায়গা পাবে কোথায়? তাই সন্ধে হতে না হতেই ও এসে হাজির হয়। এই কম্পাউণ্ডারটিকেও ও-ই এখানে এনেছে।

ঘরে ঢুকেই কম্পাউণ্ডারকে বক্‌সী বললে—কি হে কানাই, আজও কোন রুগী ধরতে পারনি তো? এই লাইনে তুমি অমন ঘাগু লোক দেখেই না ডাক্তারের সঙ্গে তোমাকে ভিজিয়ে দিলুম। এতদিনে একটা

রুগীও ধরতে পারলে না?

কানাই বললে—রুগী ধরে আর কি হবে স্যার? ডাক্তারবাবু বলছেন রুগী দেখলেই ফী চাই এক টাকা করে। আর আট দাগ মিক্‌শ্চার লিখলে আট আনা। বলুন দেখি স্যার, এ করলে কখনও রুগী আসে? এলেও বাপ্‌-বাপ্‌ বলে ভয়ে পালিয়ে যাবে না?

বক্‌সী বললে—তা তো যাবেই। ভাববে পাগলা ডাক্তারের হাতে পড়েছি, আর রক্ষে নেই। দেখ ডাক্তার, অষুধের দাম-টাম নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। এ ভারটা কানাই-এর ওপরই রেখ; তোমার চেয়ে এটা ও অনেক ভাল বুঝবে। সব দোকানে যা করে তোমাকেও তো তাই করতে হবে। দেড় টাকার অষুধ তুমি যে আট আনায় সত্যি দিচ্ছ তা লোকে বিশ্বাস করবে কেন? কেমন করে বুঝবে দেশ সুদ্ধ সবাই ডাকাত আর একা তুমি গোঁসাই ঠাকুর?

এমনি সময় আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমাকে দেখে দোকানে উঠে এলেন।—এই যে ডাক্তারবাবু, নমস্কার। আপনি আজকাল এইখানেই বসেন বুঝি?

দশ বছর আগে যখন এঁকে প্রথম দেখি তখন ইনি চাকরি করতেন একটা পাবলিসিটি ফার্মে। এখন নিজেই সেই ফার্মের মালিক। তখন নিজে ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপন যোগাড় করে নিয়ে আসতেন। এখন এঁর কর্মচারীরা সে কাজ করে। তখন ঘোরাঘুরির কাজ ছিল তাই চেহারা ছিল রোগা মেদহীন। এখন অপিসে বসে শুধু হুকুম করেন, তাই চেহারাও হয়েছে নাদুস-নুদুস, মেদবহুল।

বললাম—এটা আমারই দোকান। দু-বেলাই বসি।

—বটে? বটে? বেশ! বেশ! ভালই হল। বাড়ির পাশে একজন চেনা ডাক্তার থাকা অনেক সুবিধে।

—আপনি তো চেহারাটা দিব্ব বাগিয়েছেন দেখছি। অনেক পয়সা কামাচ্ছেন বুঝি?

—তা কামিয়েছিলাম মন্দ নয়। বাড়িও করেছিলাম একটা। শেষটায় লোভে পড়ে দিলাম ডবল দামে বিক্রি করে। দেখছেন এই চেহারা, কিন্তু ভেতরে কিচ্ছু নেই। একদম ফাঁপা। পেট ভরতি শুধু উইন্ড। আছে আপনাদের উইণ্ডের কোনো অষুধ?

—আছে বৈ কি!

—তাহলে দিন দেখি একটা। এলোপ্যাথী অষুধ অনেক খেয়েছি কিচ্ছু

হয় না। বড় বড় ডাক্তার সব ফেল মেরে গেছে। কবরেজীও করে দেখলাম এই দু বছর। এখন ভাবছি হোমিওপ্যাথী করাব।

—স্টুলটা পরীক্ষা করিয়েছেন কখনও?

—অনেকবার। কিচ্ছু পাওয়া যায় না। শুধু শুধু টাকা নষ্ট।

—আবারও যে পরীক্ষা করাতে হয়।

—সে ভাই আর পারব না। ও সব পরীক্ষা-টরীক্ষার মধ্যে আমি আর নেই। এ ক-বছরে অনেক ডাক্তার গুলে খেয়েছি। ও ফাঁদে আর পা দিচ্ছি না। কোনো অষুধ সত্যি থাকে তো দিন।

—আচ্ছা চলুন ভেতরে, পেটটা একবার দেখি।

—পেটে আর নতুন কি দেখবেন?• সবই তো শুনলেন। দিন না একটা অষুধ, দেখি ক-দিন ট্রাই করে।

—পরীক্ষা না করে কি করে বুঝব কোন অষুধ আপনার দরকার?

—তা হলে এখন থাক। আজ উঠি। আগে হোমিওপ্যাথী করেই দেখি কিছুদিন। ফল না পেলে তখন না হয় এসে পরীক্ষা করানো যাবে। আচ্ছা নমস্কার।

ভদ্রলোক বাইরে যেতেই কানাই বললে—দেখলেন বক্‌সীবাবু, স্যারের কান্ডটা! কত বড় শাঁসালো একটি মক্কেল কেমন হাতছাড়া হয়ে গেল। উইন্ডের একটা অষুধ চাইছিল অত করে, দিলেই হত একটা প্রেস্‌কৃপ্‌শন লিখে। দুদিন খেয়ে আবার আসত। তখন আবার একটা দিতেন। এমনি করেই তো রুগী আসে আর এমনি করেই তাকে হাতে রাখতে হয়। পুরনো ব্যামো, চট্‌ করে তো আর সারত না! অনেক দিন ধরে অষুধ খেত। চাই কি মাসের বাড়ি ভাড়াটাও হয়ত এর ওপর দিয়ে উঠে আসত।

বক্‌সী বললে—তাইত হে ডাক্তার। কাজটা কি ভাল হল? নাঃ কানাই! তোমার জন্য দেখছি এবার অন্য কোথাও চেষ্টা করতে হয়!

আমি একটা জবাব দেব ভাবছি হঠাৎ দেখি বিনায়ক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আমার কাছেই এসে উপস্থিত হয়েছে। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি, পায়ে চটি, পরনে ঢিলে পা-জামা। আমি বসতে বলবার আগেই ও হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—এই যে ডাক্তারবাবু! দয়া করে এক্ষুণি একবার আসবেন? মার খুব জ্বর। কি রকম যেন করছেন। বলেই টেবিলের ওপর রাখা আমার ডাক্তারী ব্যাগটি তুলে নিয়ে বললে—চলুন।

আমি উঠে বললাম—ব্যাগটা আমার কাছেই দিন। বিনায়ক ব্যস্ত হয়ে ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেবে গেছে। বললে—তাকি হয়?

আপনাকে আমি ডেকে নিয়ে যাচ্ছি নিজের গরজে বিপদে পড়ে। আমার জন্য এই ব্যাগটা আপনি বইবেন কেন? রাস্তাটা পার হয়ে ঐ কাপড়ের দোকানের পাশে গলির ভিতর আমার বাড়ি। জানালা থেকে আপনার ডিস্‌পেন্সারি দেখা যায়।

সদর রাস্তা পার হয়ে গলি দিয়ে বিনায়ক আমাকে নিয়ে ওর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বললে—আপনি একটু বসুন। আমি ভেতরে খবর দিয়ে আসি।

তাকিয়ে দেখি যে ঘরে ঢুকেছি, সে ঘরের দেয়াল দেখা যায় না। যা চোখে পড়ে তা সব বই। এত বই একসঙ্গে আমি কোনো বাড়িতে আজও দেখিনি। মনে হয় যেন একটা বই-এর দোকানে ঢুকেছি। দেয়ালের গায় তাকের পর তাক মোটা মোটা আইনের বই দিয়ে ঠাসা। আইন ছাড়া অন্য কোনো বই নেই।

চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছি এমন সময় বিনায়ক এসে বললে—চলুন ভেতরে। ওর সঙ্গে ভেতরে গিয়ে দেখলাম ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধা বিধবা মহিলা জ্বরে ভুগে এবং উপোস করে রক্তশূন্য হয়ে পড়েছেন। ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা লিখে নীচে এসে বসতেই বিনায়ক বললে—বাঁচালেন মশাই! মার অসুখটা তাহলে গুরুতর কিছু নয়। অসুখ হলে যে কাছে বসে একটু দেখাশোনা করবে, এমন আর কেউ এ বাড়িতে নেই। ঝির হাতের জল মা খাবেন না। তাহলে দেখুন, আমাকেই আদালত কামাই করে ঘরে বসে থাকতে হয়। মক্কেলের কাজ হাতে নিয়ে তা কি করে সম্ভব বলুন তো? যতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন, আমি নিজের মত চলেছি: নিজে রোজগার করে শুধু বই কিনেছি আর পড়েছি। এত যে বই দেখছেন সব নিজের পয়সায় একটি একটি করে কেনা। বাবার ইচ্ছে ছিল ওঁর ব্যবসা আমি দেখি, কিন্তু তা যখন হল না, তখন সব বেচে দিয়ে মার নামে নগদ টাকা রেখে গেছেন। যতদিন উনি ছিলেন সংসারের কোনো ঝামেলা আমাকে পোহাতে হয়নি। উনি মরে গিয়ে দেখুন কী ফ্যাসাদে আমাকে ফেলে গেছেন! মাকে দেখবার দ্বিতীয় প্রাণী নেই অথচ ঝি চাকর নার্স এসব কিছুই মা সহ্য করতে পারেন না। কি করি বলুন দেখি?

—এরকম ক্ষেত্রে আর পাঁচজন যা করে আপনিও তাই করুন। চটপট বিয়ে করে ফেলুন।

—আপনিও একথা বলছেন? মার জন্য দেখছি শেষটায় তাই করতে হবে। অথচ আমার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করাটা কি ঠিক? মানলাম না হয় বেশী বয়সের মেয়ের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু

শুধু মার জন্য বিয়ে করাটা কি অন্যায় নয়?

—শুধু মার জন্য কেন? নিজের জন্যই করুন না? আপনাকে একটু দেখাশুনা করাও তো দরকার।

মাপ করবেন, ওসব দেখাশুনা এই বয়সে আর সইবে না। এই বেশ আছি। আহার নিদ্রা পোশাক পরিচ্ছদ লেখাপড়া আমোদ-প্রমোদ সবই এতদিন নিজের ইচ্ছেমত করে এসেছি। কাউকে কখনও জবাবদিহী করিনি। দেখা-শুনা মানেই এসবে আর একজনের খবরদারি মেনে নিতে হবে। না মশাই, সে আর আমি পারব না। আচ্ছা, মার জন্য তাহলে ভয়ের কিছু নেই?

বললাম—না, ভয়ের কিছুই তো দেখছি না! ওষুধ পথ্য যেরকম লিখে দিয়েছি, সেই রকম চালিয়ে কাল একবার খবর দেবেন। আচ্ছা, নমস্কার। বলে উঠে এলাম।

সেই থেকে বিনায়কের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। মার অসুখ সেরে গেল, কিন্তু বিনায়ক আমাকে ছাড়ল না। সন্ধ্যার পর প্রায়ই আমার কাছে আসে, ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে তবে ওঠে। মাসখানেক পর একদিন বললে—আমার পিঠটা আপনাকে একবার দেখাব ভাবছি কতদিন ধরে। কি যেন একটা হয়েছে, ভারি চুলকোয়।

বললাম—বেশ তো, জামাটা খুলুন। দেখি কি হয়েছে।

বললে—এইখানে? না থাক। তার চেয়ে চলুন না একবার বাড়িতে; চা-টা খেয়ে দেখবেন এখন।

ওর সঙ্কোচ দেখে বললাম—বেশ তো; তাই চলুন তাহলে!

লাইব্রেরী ঘরে আমাকে বসিয়ে চাকরকে চা আনতে বলে বিনায়ক জামা খুলে ওর পিঠটা দেখালে। দেখলাম সমস্ত পিঠ জুড়ে প্রকাণ্ড একটি বাঘা দাদ। বললাম—তাইত! এটা তো দেখছি একটা দাদের মত দেখাচ্ছে। এত বড় কি করে হল?

শুনেই বিনায়ক বললে—দূর মশাই! আমার দাদ হবে কী করে? দাদ তো হয় জানি মুটে মজুরদের, যারা নোংরা থাকে। মাস চারেক আগে এক ডাক্তার দাদের মলম দিয়েছিল, সেটা লাগিয়েই তো এত বেড়ে গেল। দেখুন দেখি, আর একবার ভাল করে।

ওর মনের ভাব বুঝে জানালার কাছে ওকে নিয়ে আবার দেখে বললাম—এটা তাহলে বোধ হয় ফাঙাস্।

খুশী হয়ে বিনায়ক বললে—তাই বলুন! চার মাস থেকে ভুগছি,

খুব চুলকোয়। রক্তটা খারাপ হয়নি তো? দেখবেন একবার পরীক্ষা করে?

বললাম—একটা লোশন দিচ্ছি; একটু জ্বালা করবে। তিনদিন লাগিয়ে দেখুন একবার করে।

—জ্বালা করুক; কিন্তু সারবে তো?

—নিশ্চয় সারবে।

—তাহলে দিন লিখে।

তিন দিন লোশন লাগিয়ে বিনায়ক যেদিন এল সেদিন ওর আনন্দে উদ্ভাসিত জ্বলজ্বলে মুখখানা আজও আমার চোখে ভাসে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—চমৎকার আপনার অষুধ, একেবারে অব্যর্থ। লাগালে বেশ কিছুক্ষণ জ্বালা করে কিন্তু কি আশ্চর্য, চুলকানিটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। চার মাস পর কাল প্রথম ঘুমিয়েছি। একবারও চুলকোয়নি। এতদিন কী কষ্টই যে পেয়েছি। একবার শুরু হলে আর রক্ষে থাকত না। ইচ্ছে হত ঝামা দিয়ে পিঠটা ঘষি। মুটেদের দেখেছি গাছের গুঁড়িতে পিঠ লাগিয়ে দাদ ঘষতে। দেখলেই কেমন গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করত। আমার তো ঐ নোংরা রোগটা হয়নি কিন্তু ফাঙাসেও কি এত চুলকোয়? আমি নিজে এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি, রোজ সরষের তেল মেখে স্নান করি, ওটাও তো একটা এণ্টিসেপ্‌টিক, তবু এই রোগ হল কি করে বলুন দেখি? ট্রামে বাসে যাতায়াত করি কত রকম লোকের গা ঘেঁষে চলতে হয় তাই থেকেই হয়ত হয়েছে, কি বলেন? আচ্ছা, ধোপারা তো কত রকম রুগীর জামা কাপড় নিয়ে একসঙ্গে ফেলে রাখে; সেখান থেকেও তো এর বীজাণু আসতে পারে। আমার যিনি সিনিয়র তাঁর আঙুলে এগ্‌জিমা আছে আজ পাঁচ বছর, তিনি মাঝে মাঝে আমার পিঠ চাপড়ে দেন, হাত ধরেন; সেখান থেকে হয়নি তো?

বললাম—অত ভেবে আর কী হবে? কমে তো গেছে, চলুন এইবার দেখি।

পিঠটা আবার দেখলাম। সত্যি অনেক কমে গেছে। বললাম—এখনও একেবারে সারে নি। একটা মলম দিচ্ছি; দুবার করে তিন দিন লাগিয়ে আবার আসুন।

দিন তিনেক পরে বিনায়ক আবার যখন এল দেখলাম মুখের সেই জ্বলজ্বলে ভাবটি মিলিয়ে কিসের যেন একটা উদ্বেগের ছাপ পড়েছে। চোখের কোণে কালি, ভাবনায় মুখ শুকনো। জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? শরীর খারাপ নাকি? মা ভাল আছেন?

বললে—মা দিব্বি আছেন; আপনার অষুধ-বিষুধ কিছু খাচ্ছেন না। আবার আগের মতো সারাদিন অনিয়ম এবং অকাজ করে বেড়াচ্ছেন।

—তাহলে অমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? কোর্টে আজ হার হয়েছে বুঝি?

—কোর্টে হারজিত মশাই গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওতে কিচ্ছু হয় না আজকাল। মন-মেজাজ খারাপ হয়ে আছে আপনার এই মলম মেখে। অতি বিশ্রী অষুধ।

—কেন? কি হল?

—আগের লোশনটা লাগিয়ে মনে হয়েছিল এবার বোধ হয় ও রোগটা থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু এই মলম মেখে দেখছি আবার ওটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ঘাড়ের কাছটা বেশ চুলকোচ্ছে কাল থেকে। মলম মেখে সারা গা চট্‌চটে হয়ে থাকে; ভারি খারাপ লাগে। দেখুন দেখি আবার কি হল?

এবারে দেখলাম পিঠে যে প্রকাণ্ড দাদটি ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ঘাড়ের কাছে নতুন একটি হয়েছে। বললাম—মলমটা থাক, নতুন একটা লোশন দিচ্ছি; আগেরটার চেয়ে একটু বেশী জ্বালা করবে। সাবান দিয়ে স্নান করে যেখানটায় চুলকোয় সেখানে শুধু লাগাবেন একবার করে। তিন দিন পর অবার দেখব।

—এটা কি সারবে না?

—নিশ্চয় সারবে। কাপড় জামা তোয়ালে রোজ ব্যবহার করে যদি পরদিন সাবান জলে আধ ঘণ্টা সেদ্ধ করতে পারেন তাহলে সাতদিনেই সেরে যাবে।

—ওষুধে সারবে না?

—সারবে, কিন্তু আবারও যাতে না হয় তার জন্যই দেখুন না কদিন একটু কষ্ট করে—একেবারে সেরে যাবে।

—অত হাঙ্গামা কে করবে? আচ্ছা, দেখি তো এই অষুধটা লাগিয়ে।

তারপর অনেকদিন বিনায়কের আর দেখা নেই। সকালের দিকে হাস-পাতালের কাজ সেরে যখন ডিস্‌পেন্সারিতে যেতাম ততক্ষণে বিনায়ক আদালতে চলে গেছে। রাত্রেও ওকে কখনও দেখতে পেতাম না।

মাস তিনেক পর এক সন্ধ্যায় হঠাৎ এসে বললে—ডাক্তারবাবু, কাল আমার বিয়ে। আপনাকে যেতেই হবে।

খুব খুশী হয়ে হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—খুব ভাল খবর। কনগ্রাচুলেশনস। তাই এতদিন দর্শন মেলেনি!

মেয়েটি বুঝি খুব স্মার্ট?

—মেয়ে তো আমি দেখিনি।

—বলেন কি?

—ঘটা করে মেয়ে দেখতে মশাই আমার প্রবৃত্তি হল না। মার এই বয়সে একা থাকতে কষ্ট হয় তাই বিয়ে করা। মা যখন পছন্দ করেছেন তখন আমি দেখে আর কি পরমার্থ লাভ করব বলুন দেখি?

—ওঃ বুঝেচি; মেয়েটির ছবি দেখেই আপনি কাত? বিয়ের রাতে তাহলে তো নির্ঘাত ফিট!

—না মশাই, ওসব ছবিটবিও আমি দেখিনি। মেয়ের মামা খুব ধরেছিলেন একবারটি মেয়ে দেখতে। কিছুতেই যখন রাজী হলাম না তখন বললেন একটা ফটো তুলে এনে দেখাবেন। এতক্ষণ বেশ বোকা-বোকা হাসি হেসে ভদ্রলোককে খাতির করেছি; কিন্তু এখন মনে হল ভদ্রলোক একটু বাড়াবাড়ি করছেন। আমার বাপ-ঠাকুর্দা কেউ মশাই বাড়াবাড়ি কখনও বরদাস্ত করেন নি; আমিও করি না। মামার কথা শুনে বাপ-ঠাকুর্দার সেই রক্ত চট করে মশাই মাথায় উঠে গেল। বলে ফেললাম, ওসব ফটোটটো যদি তুলতে যান তাহলে কিন্তু আমি বিয়েই করব না। ঐ ফটো দিয়ে অন্য পাত্র ধরবেন। ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লেন। ভাবলেন বোধ হয় জামাইএর মাথায় একটু ছিট্ আছে। আর তা তো বিলক্ষণ আছেই। নইলে এই পঞ্চাশ বছর ব্যাচিলর থেকে আজ হঠাৎ মার দুঃখে গলে গিয়ে কেউ কখনও বিয়ে করে? আচ্ছা আজ উঠি। কাল কিন্তু নিশ্চয় আসবেন। বলে বিনায়ক তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

কি একটা কাজে আটকে গেলাম, বিনায়কের বিয়েতে আর যাওয়া হল না। বৌভাতের দিন ওর বাড়িতে গিয়ে খুব খেয়ে এলাম। বহু লোকের নেমন্তন্ন। মেয়েদের ভিড়ই বেশী। ভিড় ঠেলে বৌ দেখা আর হয়ে উঠলো না।

আবার কিছুদিন বিনায়ক ডুব মেরে রইল। কোনো পাত্তা নেই। মাসখানেক পর একদিন হঠাৎ এসে হাজির। এ কদিনেই চেহারায় বেশ জলুস এসেছে; সেই উস্কো-খুস্কো ভাব আর নেই। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, মাথার চুল পরিপাটি করে ব্রাশ করা, ধবধবে ফিটফাট পোশাক। মুখে সেই খুশী-খুশী জ্বলজ্বলে ভাব। দেখে খুব ভাল লাগল।

বললাম—এতদিন ডুবে থেকে আজ হঠাৎ যে ভেসে উঠলেন? ব্যাপার

কি? বিনায়ক বললে—ব্যাপার খুবই সঙ্গীন! নইলে ডাক্তারের কাছে কেউ আসে? যেতে হবে এক্ষুণি!

—কেন? মার আবার কি হল?

বিনায়ক বললে—মার কিছু হয়নি। এবার ব্রাহ্মণীকে নিয়েই ভারি মুশকিলে পড়েছি। কাল থেকে খুব সর্দি, সারাদিন নাক দিয়ে জল ঝরছে। তার ওপর মশাই এক বাতিক—জল-ঘাঁটা। বিয়ের পরদিন থেকেই যে শুরু হয়েছে বাসি জামাকাপড় সব রোজ সেদ্ধ করে নিজের হাতে কাচা আর ঘরদোর জল দিয়ে সাফ করা, একদিনও তার কামাই নেই। কোথাও এতটুকু ময়লা জমতে দেবেন না। আজ ভোরে উঠেই দেখলাম খুব হাঁচছেন। বললাম, নাকে একটু অষুধ লাগাতে আর বারণ করলাম জল ঘাঁটতে। তা মশাই হেসেই সে কথা উড়িয়ে দিলেন। দেখুন দেখি কী রকম ছেলেমানুষী? একদিন জামাকাপড় না কাচলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? কোর্টে যাবার আগে দেখে গেলাম ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে নাক মুছচেন আর কাপড় কাচছেন! বার-লাইব্রেরীতে গিয়ে বসতেই শুনি এডভোকেট মুখার্জী বলছেন, সর্দি খুব খারাপ জিনিস, নেগলেক্ট করলে এ থেকে নিউমোনিয়া, টি বি সব হতে পারে। জস্টিস মল্লিকের মেয়ের মেন্ইন্জাইটিস্ হয়েছে, আজ পাঁচ দিন অজ্ঞান হয়ে আছে, বাঁচবে কি না সন্দেহ। শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার দেখে বলেছেন, যখন সর্দি হয়ে মাথা ধরেছিল তখনই স্টেপ নিলে আর এমনটি হত না। দেখুন দেখি কি সাংঘাতিক! আচ্ছা, সর্দি থেকে র‍্যাপিড্লি কিছু সিরিয়স হতে পারে কি? সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তখন এত খারাপ কিছু বুঝিনি; কিন্তু কোর্টে গিয়ে এই সব শুনে মনটা ভারি দমে গেছে। তাই ভাবলাম একেবারে আপনাকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি যাই। আসবেন এক্ষুণি দয়া করে? বুকে সর্দি বসেছে কি না দেখবেন একবার পরীক্ষা করে? বলবেন ব্রাহ্মণীকে একবার বুঝিয়ে?

ওর এই অকারণ উদ্বেগ দেখে ভারি কৌতুক বোধ হল। মাকে দেখবার জন্যই যাকে ঘরে আনা তার প্রতি এত দরদ কোত্থেকে এল? জামাকাপড় সেদ্ধ করার কথায় ওর পিঠের সেই দাদটির কথা হঠাৎ মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পিঠের সেই চুলকনির কথা তো কই অনেকদিন কিছু বলেননি? ওটা আর হয়নি তো?

একগাল হেসে বিনায়ক বললে—না মশাই, ওটার হাত থেকে এতদিনে সত্যি বেঁচেছি। কি করে শেষটায় গেল জানেন? আমি গায়ে মাথা

সাবানের যে ব্রাণ্ডটা গত চার মাস থেকে মেখে আসছি ব্রাহ্মণী তা দেখেই বললেন, এর গন্ধটা যদিও মিষ্টি, কিন্তু ভেতরটায় শুধু চুন। বেশীদিন মাখলে চামড়া খারাপ হয়, স্কিন ডিজিজ হয়। অমনি মনে পড়ল এই সাবান মাখার কিছুদিন পর থেকেই তো আমি ফাঙাসে ভুগছি! আপনার অষুধে কমে যাচ্ছে; কিন্তু আবার তো হচ্ছে। অথচ দেখুন আজ দশ বছর ব্রাহ্মণী যে সাবান মাখেন তাতে স্কিন ডিজিজ তো দূরের কথা, গায়ে একটা ফুসকুড়ি পর্যন্ত হয়নি। স্কিনটিও তাই এত সফ্‌ট্‌। তক্ষুণি মশাই আমার সাবান ছুঁড়ে ফেলে ব্রাহ্মণী যা মাখেন তাই এক ডজন কিনে এনে রোজ মাখছি। আর বলতে নেই, বেশ ভালই আছি। আপনার ঐ হুল-ফোটানো লোশনের একদিনও দরকার হয়নি। দেখলাম মশাই, আপনাদের অষুধ-টষুধ সব বাজে; তার চেয়ে স্ত্রীর অষুধই ভাল।

একটু হেসে বললাম—হ্যাঁ, স্ত্রীই হল আসল অষুধ; বিশেষ করে পঞ্চাশোর্ধে।

॥ ২ ॥

সেদিন বেলা এগারটা নাগাদ ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়ে দেখি, আমার কম্পাউন্ডার কানাই দুটি দেহাতী লোককে রোগীর বেঞ্চে বসিয়ে হাতমুখ নেড়ে খুব লেকচার দিচ্ছে। চোখে-মুখে খুশী যেন উপছে পড়ছে। দেখেই বেশ বোঝা গেল, কানাই আজ দুটি রুগী বাগিয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমি ঢুকতেই উঠে বললে—অনেকক্ষণ থেকে স্যার এঁদের আটকে রেখেছি। মজিলপুরে থাকেন, নিজেদের জমিতে চাষ-আবাদ করেন ; আবার এই বারোটার ট্রেনেই ফিরে যাবেন। যদি একটু তাড়াতাড়ি করে স্যার দেখে একটা প্রেস্‌কৃপ্‌শন করে দেন। বলেই আমার খুব কাছে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—ব্যাটা এক নম্বরের ঘুঘু! একটু কড়া করে স্যার টিপতে হবে। তাহলেই ঠিক পয়সা বার করবে সুড়সুড় করে।

দেখলাম, বছর চৌদ্দ বয়সের একটি ছেলের সঙ্গে একজন বয়স্ক দেহাতী লোক। আমাকে দেখে বয়স্ক লোকটি উঠে দু-হাত জোড় করে বললে—হুজুর! আপনি আমার বাম-মা! আমার এই ছেলেটিকে বাঁচান।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

উত্তরে লোকটি ছুটে এসে আমার দু পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে-ককিয়ে যা বললে তার অর্থ হলঃ—গতকাল থেকে ছেলেটির ইউরিন হচ্ছে না। দু-তিন দিন আগে থেকেই এ কষ্ট চলছিল। গাঁয়ের এক ডাক্তার চার টাকা ফী নিয়ে দু দিন রবার ক্যাথিটার ঢুকিয়ে দিয়ে ইউরিন বার করে দিয়েছে। কিন্তু আজও আবার দু টাকা না দিলে সে ক্যাথিটার দিতে পারবে না। কিন্তু ওর কাছে আছে মাত্র একটি টাকা। তাই নিয়ে দু ক্রোশ পথ হেঁটে ট্রেন ধরে কলকাতায় এসে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল। পথে এই কম্পাউন্ডারবাবু ধরে এনে এইখানে বসিয়েছে। এখন আমি দয়া করে ওর ছেলেটিকে যদি বাঁচাই।

ছেলেটিকে বললাম—চল দেখি ভিতরে।

পেটে হাত দিয়ে দু পা ফাঁক করে অতি কষ্টে এঁকে-বেঁকে ছেলেটি উঠে এল। হাঁটবার রকম দেখেই বেশ বোঝা গেল পেটে কী রকম যন্ত্রণা। পরীক্ষা করে বুঝলাম, এক্ষুণি ক্যাথিটার দেওয়া দরকার। ২৪ ঘণ্টার ওপর ইউরিন বন্ধ। আরও দেরি করলে প্রাণের আশঙ্কা ঘটতে পারে।

অবাক হয়ে ভবলাম এই নিয়ে চার মাইল পথ হে'টে ও কি করে এল?

ডিস্‌পেন্সারিতে এসব কাজের যে খরচা তার সিকিভাগও যে দেবে এমন অবস্থা এদের নয়। তা ছাড়া ওষুধের দোকানে এ সব কাজের অসুবিধাও অনেক। তাই ভাবলাম হাসপাতাল তো কাছেই; আজ না হয় এদের নিয়ে আর একবার গেলাম। আর এস কে বলে এর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। এক্ষুণি একটা রিলিফ না দিলে ছেলেটা বিপদে পড়বে।

আর এস মানে রেসিডেণ্ট সার্জেন। হাসপাতালের ভেতরেই তাঁর বাসা। সকাল-বিকাল ইন্‌ডোর বেডের রুগী দেখা ছাড়া এমারজেন্সী কাটা-ছে'ড়া করা তাঁর কাজ। কোন ছেলে ফুটবল খেলে পা ভেঙে এসেছে তার প্লাস্টার কর। কে বাজী তৈরি করতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে তার ড্রেস কর। কোন গোঁয়ার মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে তা সেলাই কর।

আমাদের ছোট হাসপাতাল। ফ্রি বেড খুব কম। ওষুধটাও কিনে দিতে পারে না এমন রুগী যত কম হয় তত হাসপাতালের পক্ষে ভাল। এই রুগীটির কোনো ওষুধ লাগবে না ভেবে বিনা দ্বিধায় আর এস-এর কাছে হাজির করে বললাম—

রিটেনশন অফ ইউরিনের একটা কেস এনেছি। ২৪ ঘণ্টার ওপর পেচ্ছাব বন্ধ। তাই নিয়ে পাঁচ মাইল হে'টে এসেছে। এক্ষুণি ক্যাথিটার না দিলে বেচারা মারা পড়বে। তাড়াতাড়ি যদি ভাই এটা একটু করে দাও!

আর এস বললে—এই সামান্য কাজটা স্যার নিজের ডিসপেন্সারিতে করলেই তো পারতেন। কিছু বাণিজ্য হত।

বললাম—তা হত। লাভ না হয়ে কিছু লোকসান হত। গাঁয়ের ডাক্তার দু টাকা ফী নিয়ে ক্যাথিটার দিচ্ছিল। আজ সে টাকা যোগাড় করতে পারে নি বলে পাঁচ মাইল পথ হে'টে আমার কাছে এসেছে।

আর এস বললে—বাঃ, খাসা একখানা কেস্‌ বাগিয়েছেন তো? দুদিন ক্যাথিটার দেওয়া হয়ে গেছে এর মধ্যে? তাও আবার গাঁয়ে? তাহলে আর দেখতে হবে না। ইনফেকশনটি ঠিক বাধিয়ে এনেছে! যাক ক্যাথিটার আমি পাস করে দিচ্ছি, কিন্তু পেচ্ছাবের সঙ্গে সঙ্গে যদি পুঁজ বেরোয় তখন কিন্তু ফ্রী বেড দিতে পারব না। আগে থেকেই বলে রাখছি।

বললাম—পাগল নাকি? ফ্রী বেড কে দেবে ওকে? আজকের মত পেচ্ছাবটা তো ভাই করিয়ে দাও তারপর যাক ব্যাটা যেখানে খুশি সেখানে।

ভাগ্যক্রমে তক্ষুণি অন্য কোনো অপারেশন ছিল না। ওটি খালি পাওয়া

গেল। যে ঘরে অপারেশন করা হয়, তার নাম অপারেশন থিয়েটার। আর এস যেমন রেসিডেণ্ট সার্জন, ও টি তেমনি অপারেশন থিয়েটার। আর যে নার্সের ওপর ও টির ভার, তিনি থিয়েটার সিসটার।

আর এস ছেলেটিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে টেবিলে শুইয়ে ক্যাথিটার রেডি করতে বলে নিজে হাত ধুতে গেল।

ও টির ঠিক পাশেই আর এস-এর বসবার ঘর। যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন এই ঘরেই আমরা বসি ; চা-টা খাই, আড্ডা দিই। আর এস-এর ওপর এই কেসটি চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে এক কাপ চা-এর অর্ডার দিয়ে খবরের কাগজ খুলে বসলাম।

চা খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু সিনেমা এবং ঘোড়-দৌড়ের খবর তখনও সবটা দেখা হয়নি এমনি সময় থিয়েটার সিসটার এসে বললে—স্যার, আপনার কেসটায় ক্যাথিটার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইউরিন আসছে না। আর এস আপনাকে ডাকছেন।

বিরক্ত হয়ে বললাম—আমি গিয়ে আর কি করব? রবার ক্যাথিটার না গেলে মেটাল ক্যাথিটার দিতে হবে। ক্যাথিটার গরম জলে ফোটাতে দিন, আমি আসছি।

মেটাল ক্যাথিটার গরম জলে ফুটিয়ে বীজানু-শূন্য করতে লাগে ১০।১৫ মিনিট। ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই কাগজ পড়া শেষ করে ও টি-তে ঢুকলাম।

আর এস বললে—দেখুন দেখি কোথা থেকে এক আপদ জুটিয়ে এনেছেন, কেবল ভোগাচ্ছে। রবার ক্যাথিটার সবটা ঢোকানো হয়েছে তবু পেচ্ছাব আসছে না। ব্লাডার নিশ্চয়ই ফাঁকা, ভেতরে মাল নেই।

বললাম—ক্যাথিটার ব্লাডারে গেলে তবে তো মাল বেরুবে? রবারের সরু নল তো? ব্লাডারের মুখের কাছে গিয়েই দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে. ভেতরে ঢুকছে না। ক্যাথিটার দাও দেখবে ঠিক বেরুবে।

সিসটার ইতোমধ্যে মেটাল ক্যাথিটার ফুটিয়ে নিয়ে এল। আর এস আবার হাত ধুয়ে মেটাল ক্যাথিটার মূত্রনালীতে ঢুকিয়ে দিল। তবু কোনো ইউরিন এল না। বললাম, ঠিক পথে যাচ্ছে না, আর একবার ট্রাই কর। বার কয়েক ট্রাই করবার ফলে ইউরিন তো এলই না, উল্টে ক্যাথিটারের মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরুতে লাগল।

আর এস বললে—দেখলেন কী হল? এখন ঠ্যালা সামলান।

সামান্য একটা ক্যাথিটার দিতে গিয়ে এ বিপত্তি হবে বুঝলে কে ওকে

এখানে নিয়ে আসতো? এখন উপায়?

বললাম—গাঁয়ে তো এ-দুদিন ক্যাথিটার বেশ যাচ্ছিল, পেচ্ছাবও হচ্ছিল। তোমরাই রক্ত বার করে ছাড়লে। এখন পেট কেটে সুপ্রা-পিউবিক কর।

সুপ্রা-পিউবিক মানে তলপেট একটু কেটে ব্লাডার ফুটো করে ক্যাথিটার ঢুকিয়ে দেওয়া। মূত্র নালী দিয়ে ক্যাথিটার ঢোকানো যখন আর যায় না, তখন এই ভাবেই ক্যাথিটার ঢুকিয়ে ইউরিন বার করে দিতে হয়। ছোট অপারেশন। কিন্তু অজ্ঞান করতে হবে বলে রুগীর সম্মতি চাই, অভিভাবকের মত চাই। রুগী তো নিজের যন্ত্রণায় অস্থির; কাটা-ছেঁড়া অজ্ঞান করা সব কিছুতেই রাজী। শুধু চাই কষ্ট দূর করে দাও, তা সে যেমন করেই হোক। বাইরে এসে ওর বাবাকে সব বুঝিয়ে সম্মতিপত্রে টিপসই করিয়ে নিয়ে বললাম, ভয়ের কিছুই নেই, অজ্ঞান করে তলপেট ফুটো করে একটা নল বসিয়ে দেওয়া হবে। তাই দিয়েই দু তিন দিন পেচ্ছাব করবে। তারপর নলটা খুলে নিলে আবার স্বাভাবিকভাবে পেচ্ছাব হবে।

লোকটি বললে—তাহলে বাবু, বাড়ি নিয়ে যাব কি করে?

বললাম—তিন চার দিন এখন হাসপাতালে থাকুক। নল খুলে দিলে বাড়ি যাবে।

এমনি সময় আমাদের হাসপাতালের যিনি বড় সার্জন, তিনি হঠাৎ এসে পড়লেন। আজ তাঁর অপারেশন নেই, আসবার কথাও ছিল না। শালীর বাড়িতে নেমন্তন্ন; এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। একটা অপারেশন রেখেছেন চেম্বারে আজ সন্ধ্যায়। আর এস যাবে, থিয়টার সিসটার যাবে। সেই কথাই বলতে এসেছেন।

এই সার্জনটির বয়েস কম, কিন্তু হাতখানি ভারি পাকা। বিলেতের এক হাসপাতালে কাটা-ছেঁড়া করে হাতখানা পাকিয়ে এখানে এসেছেন। এঁকে দেখেই মনে খুব ভরসা হল। বললাম—আপনি এসেছেন না বাঁচিয়েছেন! এক ক্যাথিটার দিতে গিয়েই দেখুন কী-কান্ড! একেবারে রক্তারক্তি! এখন সুপ্রা-পিউবিক না করলে আর গতি নেই। চলুন ও টি-তে

সার্জন বললেন—বলেন কি? ক্যাথিটার দেওয়া গেল না?

বললাম—গাঁয়ে তো বেশ দেওয়া যাচ্ছিল, এখানে এসেই সব গড়বড় হয়ে গেল। এখন আপনি ভরসা।

সার্জন বললেন—কিন্তু আমি যে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি। তাও আবার

শালীর বাড়িতে। দেরি হলে কি হবে বুঝতেই তো পাচ্ছেন। আচ্ছা, চলুন দেখি।

ও টি-তে গিয়ে রুগী পরীক্ষা করে সার্জন বললেন, ব্লাডার তো দেখছি ইউরিনে ভরতি। যে করেই হোক বার করে দিতেই হয়। ক্যাথিটার বোধ হয় আর দেওয়া যাবে না। তবু দেখি একবার চেষ্টা করে। যদি না যায়, সুপ্রা-পিউবিকই করে দেব। পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না।

এই বলে কোট খুলে হাত ধুয়ে আর একবার ক্যাথিটার দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন—নাঃ, এ আর যাবে না। রাস্তা ছিঁড়ে এখন শুধু রক্ত আসছে। সুপ্রা-পিউবিকই করে দিই। নিন 'আণ্ডার' করুন।

আণ্ডার করা মানে অজ্ঞান করা। ক্লোরোফরম, ইথার অথবা গ্যাস শুঁকিয়ে এমন বেহুঁশ করতে হবে যাতে দেহে ছুরি চালালেও রুগী টের না পায়। ব্যথা না লাগে। 'শক' না হয়। অজ্ঞান করে এই অবস্থায় আনাকে বলে আণ্ডার করা। সার্জনের কথামত যিনি অজ্ঞান করবেন, তিনি রুগীর চোখ ঢেকে মুখের ওপর তুলোর প্যাড দিয়ে তার ওপর মাস্ক বসিয়ে ইথার ঢালতে লাগলেন।

আবার হাত ধুয়ে রবারের দস্তানা পরে সার্জন চট করে তৈরী হয়ে নিলেন। ছোট্ট অপারেশন। একটা ছুরি, কাঁচি, গোটা কয়েক ফরসেপস আর সেলাই করবার জিনিস। আর এস-ও এই সব এগিয়ে দেবার জন্য তৈরী হল।

রুগী আণ্ডার হতেই সার্জন ছুরি বসিয়ে দিলেন। দু মিনিটের মধ্যেই ব্লাডার বার করে ফুটো করা হয়ে গেল। এইবার ফোয়ারার মত ইউরিন বেরিয়ে আসবার কথা। কিন্তু একী হল? এক ফোঁটা ইউরিনও তো এল না?

সার্জন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন, আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ২৪ ঘণ্টার ওপর ইউরিন হয়নি; গেল কোথায়? পেট অত ফুলে উঠেছে, বাজালে ঢ্যাব-ঢ্যাব করে; ভেতরে তা হলে কী? পেট জুড়ে কি একটা টিউমার হয়েছে?

সার্জন ব্লাডারের ভেতর একটা আঙুল ঢুকিয়ে চারদিক ঘেঁটে দেখে বললেন—ইউরিন মোটে জমেইনি ব্লাডারে। সামান্য একটু নীচে পড়ে আছে মাত্র। এটুকু অপারেশনে কিছু বোঝা যাবে না। কি হয়েছে দেখতে হলে বড় করে কেটে সমস্ত পেটটা দেখতে হয় কোথায় কি হয়েছে। আর তা না করে একে ছেড়েই বা দেওয়া যায় কি করে? আচ্ছা ফ্যাসাদ হল তো?

সার্জন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

পেট বড় করে কেটে দেখার মানে একটি মেজর এবডমিনাল অপারেশন। এত বড় অপারশনের জন্য আমরা মোটেই তৈরী ছিলাম না। সার্জন নয়, আর এস নয়, আমিও না। একথা শুনে আমরা পরস্পরের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল যেন গভীর এক গাড্ডায় পড়ে গেছি, কি করে বেরুব বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

এত বড় অপারেশনের আগে রুগীকে তৈরী করতে হয়, স্পেশাল খাট বিছানা ঠিক করতে হয়, ও টি আলাদা করে সাজাতে হয়। এর জন্য সেসব কিছুই করা হয়নি। তার ওপর রুগীর বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকেও বোঝাতে হয়। তার মত না থাকলে অপারেশন করা যায় না।

বললাম—এখন আর পেট কেটে না দেখে উপায় কি? আপনারা তৈরী হয়ে নিন আমি ওর বাবাকে বুঝিয়ে আসি।

বাইরে এসে দেখি লোকটি বারান্দার এক কোণে চুপ করে বসে আছে। আমাকে দেখেই উঠে হাত জোড় করে বললে—হয়ে গেছে বাবু? ভাল আছে তো?

ওকে সব বুঝিয়ে বললাম, পেট বড় করে কেটে না দেখলে আর ওকে বাঁচানো যাবে না। শুনে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললে—ছেলেটা বাঁচবে তো? ওর মা এসে দেখতে পাবে তো? তারপর বললে—আপনি আমার বাপ-মা, যা ভাল হয় তাই করুন।

অপারেশনের জন্য তৈরী হতেই আধ ঘণ্টার ওপর লাগল। সার্জনের নেমন্তন্ন খাওয়া হল না। টেলিফোন করে জানিয়ে দেওয়া হল, যেতে দেরি হবে। অনেক যন্ত্রপাতি, ২।৩ ড্রাম ভরতি তোয়ালে, গজ চাদর তুলো সব স্টেরিলাইজড্ করা হল। অপারেশন টেবিলের ওপরের বড় শ্যাডোলেস্ লাইটটা জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সার্জন আরও দুজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নিলেন। এ'রা তিনজন হাত ধুয়ে, রবারের এপ্রন দস্তানা পরে তারপর সাদা কাপড়ের স্টেরিলাইজ্ড লম্বা জামা পরে নিলেন। মাথায় মুখে কাপড়ের মুখোস পরলেন। শুধু চোখ দুটো খোলা রইল। যিনি রুগীকে বেহুঁশ করেছিলেন, তিনি অল্প অল্প ইথার শুঁকিয়ে শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। সার্জন অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের নিয়ে তৈরী হয়ে আসতেই তিনি রুগীকে আবার আণ্ডার করে দিলেন।

অপারেশন আরম্ভ হয়ে গেল। মুখে একটা কাপড়ের মুখোশ পরে আমিও দেখতে লাগলাম। পেটটাকে লম্বা করে কেটে সার্জন পাঁচ

মিনিটের মধ্যেই দু ফাঁক করে ফেললেন। একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দুটো যন্ত্র ঢুকিয়ে দুহাত দিয়ে টেনে পেটটা ফাঁক করে রাখল। সার্জন ভেতরে হাত দিয়ে একটা করে অর্গান দেখে বললেন—ওপরের পেটে পিলে, পাকস্থলী, লিভার কিড্‌নী, ইন্‌টেস্‌টাইন সব ঠিক আছে। তলপেটে পেল্‌ভিসের ভিতর হাত দিয়ে বললেন, ব্লাডারও ঠিক আছে কিন্তু তার নীচে নরম মত কী একটা হাতে লাগছে। পর্দা দিয়ে ঢাকা—কিন্তু টিউমার নয়। পর্দাটা একটু সরাবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ সার্জনের হাতটা পেল্‌ভিসের ভেতর ঢুকে গেল। দেখলাম সার্জনের চোখে যেন একটা অজানা আতঙ্কের ছায়া পড়ল। মনে হল কি যেন একটা ফেটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পেটের ভিতরের গর্তটা শাদা পুঁজের মত একটা তরল পদার্থে ভরা উঠে ফোয়ারার মত উপচে পড়ে রুগীর গায়ের চাদর ভাসিয়ে অপারেশন টেবিল থেকে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যেতে লাগল। একটা কটু দুর্গন্ধে অপারেশন থিয়েটার ভরে গেল। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম।

এ আবার কি হল? এত পুঁজ কোত্থেকে এল? তোয়ালে, গজ, চাদর যা ছিল তা দিয়ে মুছে শেষ করা যাচ্ছে না, এত পুঁজ কোথা থেকে আসছে? সার্জন হিমসিম খেয়ে গেলেন। বললেন—একটা 'সাক্‌কার' থাকলে হত। পাম্প করে তাড়াতাড়ি টেনে সাফ করা যেত। দেখুন তো পাল্‌স্‌ কেমন?

যিনি আণ্ডার করেছেন তিনি বললেন—খুব ভাল; চালিয়ে যান।

পেটের ভেতর এত পুঁজ এর আগে আমরা কখনও দেখিনি। আর সে কী দুর্গন্ধ! অপারেশন থিয়েটার ছাপিয়ে এ দুর্গন্ধ হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে একতলা দোতলা তিনতলায় ছড়িয়ে গেল। রুগীরা থাকতে না পেরে নাকে কাপড় দিয়ে উঠে বসল। ভয় পেয়ে একজন নার্স তাড়াতাড়ি সুপারিণ্টেণ্ডেটকে ফোন করে দিল। তিনি সবে খেতে বসেছিলেন, খাওয়া ফেলে গাড়ি ছুটিয়ে তাড়াতাড়ি এসে গেলেন। হাসপাতালে ঢুকতেই ঐ গন্ধ তাঁর নাকে ভক্‌ করে ঢুকলো।

ইনি যখন ও টি-তে এলেন ততক্ষণে সার্জন দুটি ড্রাম ভরতি তুলো গজ ভিজিয়ে পেটের ভিতরটা কোনরকমে পরিষ্কার করেছেন। তখন বোঝা গেল ব্লাডারের পেছনে একটি বি কোলাই এবসেস্‌ হয়েছিল। তাই ফেটে এত পুঁজ। ভেতরটা ভাল করে ধুয়ে মুছে আবার সেলাই করে দেওয়া হল। পাঁচ মিনিটের অপারেশন অবশেষে তিন ঘণ্টায় শেষ হল।

আর এস বললে—আচ্ছা কেস্‌ একটি এনেছিলেন বটে!

বললাম—তোমরা তো খুব লাকি! পঞ্চাশ বছর বয়সে আমি যা দেখিনি পঁচিশ বছরেই তা দেখে নিলে। এইবারে চা-টা আনবার ব্যবস্থা কর।

ও টি থেকে বেরুতেই রুগীর বাবা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ বাবু! ওর পেট থেকে নাকি গামলা গামলা পুঁজ বেরিয়েছে তাই এত দুর্গন্ধ? বাঁচবে তো?

বল'লাম—বাঁচবে বই কি। সেই জন্যই তো অপারেশন করা হল।

এমনি সময়ে স্ট্রেচারে করে ছেলেটিকে ও টি থেকে ওয়ার্ডে এনে ওর নির্দিষ্ট বেডে শুইয়ে দেওয়া হল। ওর বাবাকে পাশে একটা টুলে বসতে বলে সার্জনের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম। সার্জন গেলেন বেলা তিনটের সময় নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার সময় হাসপাতালে গিয়ে শুনি ছেলেটির পালস্ খারাপের দিকে। সার্জনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তক্ষুণি অক্সিজেন দেওয়া হল। সেলাইন গ্লুকোজ ফোঁটা ফোঁটা করে উপ-শিরার ভেতর ইন্‌জেক্‌শন করে চালিয়ে দেওয়া হল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সার্জন এসে গেলেন। রুগীর অবস্থা দেখে সেই যে আটকে পড়লেন রাত দুটোর আগে আর উঠতে পারলেন না। সন্ধ্যার সময় চেম্বারে যে অপারেশন করবেন ঠিক ছিল তা ফোন করে বন্ধ করে দিলেন। দেখলেন রুগীকে রক্ত দেওয়া দরকার। ডোনার নেই; রুগীর টাকাও নেই। কি করা যায়? মনে পড়ল ব্লাড-ব্যাঙ্কে আছে এক ডাক্তার বন্ধু। ছুটলেন গাড়ি নিয়ে তার কাছে। পরের দিন ডোনার যোগাড় করে দেবেন বলে নিয়ে এলেন এক বোতল ব্লাড। রুগীকে বাঁচাতে হলে অনেক দামী অষুধ দরকার এক্ষুণি। কোথায় টাকা? সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ফোন করে হাসপাতালের পুওর ফাণ্ড থেকে টাকা দেবার হুকুম বার করে নিলেন।

তারপর শুরু হল লড়াই। থেকে থেকে রুগীর নাড়ী দেখছেন আর একটা করে ইন্‌জেক্‌শন দিতে বলছেন। আর এস অষুধ নিয়ে সিরিঞ্জ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে—বলতে না বলতে ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে। কখনও চামড়ার নিচে, কখনও মাংসের ভেতর কখনও বা উপশিরার মধ্যে। ব্লাড দেওয়া শেষ হল; আবার স্যালাইন চালাও। স্যালাইন যাচ্ছে না; উপশিরা পাওয়া যাচ্ছে না; চামড়া কেটে উপশিরা বার করে তার মধ্যে ইন্‌জেকশনের নিড্‌ল চালিয়ে দিলেন। হাসপাতালের নার্স ডাক্তার সব সেদিন এই একটি রুগী

নিয়ে মেতে গেল। যেমন করেই হোক একে বাঁচাবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি হতে দেবে না। রাত বারোটার সময় অবস্থা একটু ভালোর দিকে দেখে আমি উঠে এলাম। কিন্তু সার্জন নড়লেন না।

আর এস বললে—এঁর জন্যই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ। ওঁকে ছাড়বেন না।

পরদিন হাসপাতালে যেতেই আর এস বললে—কাল রাত দুটো পর্যন্ত ভুগিয়ে আপনার রুগী এখন ভাল আছে। যান দেখে আসুন।

গিয়ে দেখি নাড়ীর অবস্থা বেশ ভাল। খুব ঘুমুচ্ছে। সেই থেকে ভালর দিকে গিয়ে দিন দশেক পরে জ্বর ছাড়ল। তারপর আরও কয়েক-দিন পরে সেলাই জুড়ে গেল। মাসখানেক থাকবার পর যেদিন ছুটি দেওয়া হবে ঠিক হল সেদিন থেকেই আবার হঠাৎ জ্বর হল। সঙ্গে কোমরের কাছে একটা জায়গা ফুলে ব্যথা হল। পরে বোঝা গেল পেটের মধ্যে যে পুঁজ ছড়িয়ে পড়েছিল তার কিছুটা এই পথে বেরুচ্ছে। আবার এটা কাটতে হল।

আরও মাসখানেক পর.আর এস একদিন বললে—আর তো পারি না মশাই! কী এক রুগী দিয়েছেন, জ্বালিয়ে খেলে।

—কেন কি হয়েছে?

—যখনি ঠিক করি ওকে ছুটি দেব তক্ষুনি আবার একটা জায়গা ফুলে ওঠে; কাটতে হয়। আবার একটি মাস বেডটা আটকে থাকে। তার ওপর অষুধের খরচা। প্রায় শ দুই টাকার অষুধ খরচা হয়ে গেছে। আপনার রুগী কখনও নেব না।

এমনি করে মাস তিনেক কাটিয়ে অবশেষে একদিন ওর ছুটি হল। সবাইকে প্রণাম করে হাসিমুখে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেল।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে। ওর কথা ভুলেই গেছি। একদিন সকালে ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়ে দেখি ছেলেটি বাবার সঙ্গে বসে আছে। আমি যেতেই আমাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। দেখলাম এ ক-মাসেই বেশ বড়সড় হয়েছে, জোয়ান দেখাচ্ছে। মুখে গোঁফ দাড়ির রেখা উঠেছে। রং তামাটে হয়েছে।

আমার কম্পাউন্ডার কানাই দেখলাম গম্ভীর হয়ে বসে আছে। মুখে বিরক্তি। মনে হল যেন খুব রেগে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে কানাই?

কানাই যেন ফেটে পড়ল। বললে—ব্যাটা আপনার জন্য ভিজিট

এনেছে। দেখুন সেই ভিজিট। বলে কম্পাউন্ডারের পাশ থেকে তুলে উঁচু করে দেখালে ছোট্ট একটি মানকচু। বললে—দেখলেন ব্যাটার আক্কেল?

লোকটি বললে—আমার বাড়ির গাছ হুজুর। খেতে খুব মিষ্টি।

বললাম—ছেলে তো বেশ জোয়ান হয়েছে দেখছি। কাজকর্ম করছে? শরীর বেশ ভাল? পেট আবার ফোলেনি তো?

লোকটি বললে—সেইজন্যই হুজুর আপনার কাছে আসা। আপনি ওর প্রাণ দিয়েছেন। আমরা চাষাভুষা লোক; খেটে খাই। আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

বললাম—আবার কী হল? একটু উদ্বিগ্নও হলাম।

লোকটি আমার হাত জড়িয়ে বললে—আপনি ওর প্রাণ দিয়েছেন, এবার হুজুর ওর একটা চাকরি করে দিন।

॥ ৩ ॥

শীতের রাত। কনকনে হাড়কাঁপানো হাওয়া। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে লেপের নীচে ঢুকব ভাবছি এমন সময় দরজার কড়া খট্‌খট্‌ করে নড়ে উঠলো। বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেখি আমার এক পুরনো রুগী আর অচেনা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

বললাম—ব্যাপার কি?

পুরনো রুগীটি ঐ ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন—এর ছেলের আজ তিনদিন থেকে সর্দিজ্বর। হঠাৎ খুব বেড়েছে, তাই আপনাকে নিতে এসেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—কত জ্বর?

ভদ্রলোক বললেন—১০০° থেকে আজ হঠাৎ ১০৪° উঠেছে। কেমন যেন ছট্‌ফট্‌ করছে।

বললাম—দিনে এলেই ভাল হত, দেখাবার সুবিধে হত। ছেলের কত বয়স?

ভদ্রলোক বললেন—তিন বছর। বাচ্চাদের সর্দিজ্বর তো লেগেই থাকে, হোমিওপ্যাথী অষুধ খায়, সেরে যায়। এবার বড্ড বাড়াবাড়ি দেখছি। এত জ্বর আগে কখনও হয়নি, খুব ছট্‌ফট্‌ করছে। যদি একটু তাড়াতাড়ি করে আসেন। গিন্নী বড্ড উতলা। রিক্‌শা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

লেপের তলায় ঢুকব ভেবেছিলাম, আবার বাইরে বেরুতে হল। পোশাক পরে রিক্‌শায় গিয়ে উঠলাম। কাছেই বাড়ি। ভিতরে গিয়ে দেখি, ছেলেটির গায় লেপ চাপা। জ্বরের ঘোরে বার বার হাত দুখানি বাইরে বার করছে। ছট্‌ফট্‌ করছে। মা পাশে বসে বার বার ঐ হাত লেপের ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। পাশেই একটা হারিকেন লণ্ঠন, তার ওপর ছোট এলুমিনিয়মের বাটিতে সরষের তেল আর কালজিরা গরম হচ্ছে। মাঝে মাঝে ঐ বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে একটু তেল নিয়ে মা ঐ ছেলের বুকে পিঠে মালিশ করছেন। দরজা জানালা বন্ধ।

বললাম—এই বন্ধ ঘরে আমারই দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাচ্চার তো আরও কষ্ট হবার কথা। একটা জানালা অন্তত খুলে দিন।

শুনে ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেলেন। ইতস্তত করে বললেন—কিন্তু এই শীতে জানালা খুললে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হবে না?

একটু হেসে বললাম—নিউমোনিয়ায় এই বন্ধ ঘরে থাকলে আরও খারাপ হবে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হবে।

লেপ উঠিয়ে দেখি ছেলেটির পায়ে মোজা, গায়ে উলের হাতওয়ালা কোট। তার নীচে উলের সোয়েটার। তার নীচে সুতির একটা জামা। জামা তুলে বুক পরীক্ষা করেই বুঝলাম নিউমোনিয়া। এত গরম জামা পরিয়ে দরজা জানালায় খিল দিয়ে ঠাণ্ডা লাগা বন্ধ করেও যাকে ঠেকানো যায়নি।

বললাম—বুকে একটু সর্দি বসেছে, নিউমোনিয়া বলেই মনে হচ্ছে।

ছেলের মা বললেন—প্রথম দিনই আমি বলেছি, এবার জ্বরটা আমার ভাল লাগছে না, তা সে কথা উনি কানেই তুললেন না। এখন কি হবে?

বললাম—ভয় পাবার কি আছে? পেনিসিলিন দিচ্ছি, সেরে যাবে। বলে ব্যাগ থেকে একটা চার লাখ ইউনিটের পেনিসিলিন বার করলাম। সিরিঞ্জ এলকোহল দিয়ে স্টেরিলাইজ করে শুকোতে শুকোতে মনে পড়ল, প্রথম যখন পেনিসিলিন দিই তখন কত হাঙ্গামাই না ছিল! শোনা গেল, পেনিসিলিন দিতে হলে ইথার দিয়ে সিরিঞ্জ স্টেরিলাইজ করে নিতে হয়। এলকোহল দিলে চলে না। এই চললো কতদিন। মেয়েরা অনেকে এ গন্ধ সইতে পারেন না। গা গুলিয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি? একটা বাচ্চাকে একবার পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি পেনিসিলিন দিতে হল। ডাক্তার দেখলেই ভীষণ কাঁদে, হাত পা ছোঁড়ে। তাই ঠিক হল নীচে থেকে সিরিঞ্জ রেডি করে ওপরে উঠেই চট্ করে ফুঁড়ে দেব। একবার দেবার পর নীচে এসে আবার যখন সিরিঞ্জে ইথার ঢেলেছি, শুনি ওপরে বাচ্চার চিৎকার। সেই থেকে ইথারের গন্ধ পেলেই ও চ্যাঁচাতো। ভাবতো আবার বুঝি ওকে ফোঁড়া হবে।

ডিস্টিল্ড ওয়াটারের এম্পুল থেকে এক সি সি জল নিয়ে পেনি-সিলিন গুলে ইন্জেক্শন করে দিলাম। বললাম—বারো ঘণ্টার মধ্যে আর ইন্জেক্শন দেবার দরকার হবে না। কাল সকালে একবার খবর দেবেন।

ছেলের মা বললেন—জ্বর যদি বাড়ে তাহলেও সকালে ইন্জেক্শন দেবেন না?

একটু হেসে বললাম—জ্বর বাড়বে না, কোনো ভয় নেই। মালিশটা বন্ধ করে দিন, মিশ্রির জল বেশী করে খাক, দেখবেন কাল জ্বর অনেক কমে যাবে।

মনে পড়ল পেনিসিলিন দিতে হলে আগে কত কষ্টই না সইতে হত। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিন ঘণ্টা পর পর ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে. নইলে কাজ হবে না। দেহে ওষুধের ধারা ছিঁড়ে যাবে, বীজাণু ঠিক মত ধ্বংস হবে না। দিতে-রাত্তে দেড় ঘণ্টা কি দু ঘণ্টার বিশ্রামও এক সঙ্গে পাওয়া যেত না। ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বাড়ি এসেই আবার এলার্ম বেজে উঠতো। শুতে না শুতেই আবার উঠে ছুটতে হত। তখন এক লাখ ইউনিট পেনিসিলিন দশ সি সি জলে গুলে রেফ্রিজারেটার অথবা ফ্লাস্কে বরফ দিয়ে রাখতে হত। নইলে ওষুধ নষ্ট হয়ে যেত। তিন ঘণ্টা অন্তর এক কি দেড় সি সি করে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হত। এখন ঝামেলা কত কম। দিনে একটা করে ইন্‌জেক্‌শন বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত। আর দামও কত সস্তা! আগে এক লাখ ইউনিটেরই দাম দেখেছি ২০।২৫ টাকা। এখন চার লাখ ইউনিট দশ আনা।

পেনিসিলিন দিয়ে রিক্‌শায় চড়ে শীতে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে বাড়ি ফিরে এলাম। আগে নিউমোনিয়া দেখলে মনে একটা উদ্বেগ থাকত। বাঁচবে কিনা সন্দেহ হত। আজকাল আর সে ভয় নেই। নিউমোনিয়াতে বড় একটা কেউ মরে না। বরং এসব কেস হাতে এলেই ভাল। চট্ করে ওষুধের ফল দেখানো যায়। রুগীরা খুশী হয়, ডাক্তারের মান বাড়ে।

পরদিন সকালে খবর পেলাম জ্বর অনেক কমেছে। দুপুরে গিয়ে দেখি, সেই ছট্‌ফট্ ভাব আর নেই। বেশ খাচ্ছে। হরলিক্‌স, দুধ আর মিশ্রির জল বেশী করে খাওয়াতে বলে আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে চলে এলাম। বললাম—আজই জ্বর ছেড়ে যাবে এখন। কিচ্ছু ভাববেন না।

ভাবলাম এই বছর বারো তের আগেও পেনিসিলিনের নাম আমরা শুনিনি। যুদ্ধের সময় যখন চার্চিল সাহেবের নিউমোনিয়া হল, শুনলাম এম বি ট্যাবলেট আর পেনিসিলিনে সাত দিনেই সেরে উঠে আবার তিনি যুদ্ধের কাজে লেগে গেছেন। এম বি ট্যাবলেটের তখন এখানে খুব চল। গাঁয়ে পর্যন্ত পেঁছেচে। নিউমোনিয়া তাতে সারত বটে, কিন্তু শরীর খুব দুর্বল হয়ে যেত—১৫।২০ দিন লাগত তা ঠিক হতে।

পরদিন ছেলের বাবা এসে খুশীর উচ্ছ্বাসে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন—ডাক্তারবাবু, কাল রাত্রেই জ্বর ছেড়ে গেছে। এখন ভাত খাবার জন্য বায়না ধরেছে, কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না।

বললাম—দিন খেতে ভাত, মাছ, দৈ, সন্দেশ। তাহলে পারবেন তো সামলাতে? শুনে ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মুখে কথা বেরুলো

না। আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।"

সত্যি অবাক হবারই কথা। নিউমোনিয়াতে যে দু দিনেই জ্বর ছাড়ে আর জ্বর ছাড়লেই যে এসব খাওয়ানো যায়, তা আমরাই কি আগে জানতাম? ১০।১৫ বছরের মধ্যে চিকিৎসার ধারাটাই কি বদলালো কম? পেনিসিলিনের আগে ছিল সালফাডায়াজিন, সিবাজল, এম বি ট্যাবলেট। এইসব শক্তিশালী সাল্‌ফা ড্রাগ। তারও আগে ছিল প্রন্‌টসিল। সেই প্রথম সাল্‌ফা ড্রাগ। রক্তের সঙ্গে মিশে বীজাণুধ্বংসকারী প্রথম ওষুধ, জার্মানীর আবিষ্কার। আবিষ্কারক নোবেল প্রাইজ পেলেন। কিন্তু ইহুদীর দান বলে হিটলার সে পুরস্কার নিতে দিলেন না।

প্রন্‌টসিল তখন সবে এখানে এসেছে। হাসপাতালে নিউমোনিয়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে। যুদ্ধের বছর দুই আগের এক নভেম্বর মাস। খুব শীত। আট মাস বয়সে আমার ছোট ছেলের একদিন জ্বর হল। যে শিশু-চিকিৎসকের ওপর আমার স্ত্রীর তখন খুব আস্থা, তিনি এসে দেখে বলে গেলেন, বি কোলাই। তিন দিনের মধ্যেই জ্বর বেড়ে ১০৫° উঠে গেল। বুকে ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ভদ্রলোকের তখন উঠ্‌তি প্র্যাকটিস্‌। খুব ব্যস্ত। খবর পেয়েই ছুটে আসতে পারলেন না। বললেন—হাসপাতালে ভরতি করে দাও। শুনে আমার স্ত্রী ক্ষেপে গেলেন। আমার বাড়ির বিনা পয়সার চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করলেন। সেই থেকে নিত্য দেখছি, ডাক্তারের চাকরি কত ক্ষণভঙ্গুর! এই আছে, এই নাই!

ভাগ্যক্রমে এই সঙ্কটকালে আমার এক বন্ধু সদ্য পাশ করা ডাক্তার সেদিন হঠাৎ আড্ডা দিতে এসে পড়লেন। আমার এই বিপদের কথা শুনে ওপরে উঠে ছেলেকে দেখে বললেন—বি কোলাই-এ কখনও এরকম হয়? এটা নিউমোনিয়া।

বলে চিকিৎসার ভার নিজে নিয়ে সকাল বিকাল দেখে যেতে লাগলেন। কি কুক্ষণে যে আমার বাড়ির চিকিৎসার বোঝা সেদিন তিনি যেচে নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন, আজও তা ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। বিনা পয়সার চাকরিটি তাঁর আজও তেমনি অটুট আছে।

এই বন্ধুটির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল, একজন বড় কাউকে দেখিয়ে রাখা ভাল। আমাদের কলেজে যিনি মেডিসিন পড়াতেন তাঁকে এনে দেখালাম। তিনি দেখে বললেন—নিউমোনিয়া, প্রন্‌টসিল দাও।

প্রন্‌টসিলে কী খারাপ হয় তা তখন আমাদের জানা। বন্ধুটি কিছুতেই রাজী হলেন না। একে ছেলে জল কম খাচ্ছে, ইউরিন ভাল হচ্ছে না; তার

ওপর প্রনটসিল দিতে আমাদের সাহস হল না।

জ্বর সমানে ১০৫° চলছে, জ্ঞান নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিন আট আউন্সের বেশী কিছুতেই সারাদিনে খাওয়ানো গেল না। ফলে ইউরিন বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুটি দেখে বলে গেলেন, আজ রাতের মধ্যে কুড়ি পঁচিশ আউন্স গ্লুকোজের জল খাওয়াতে না পারলে কি হয় বলা কঠিন। আট মাসের শিশু। জ্ঞান নেই। ফিডিং-বট্‌ল্‌ মুখে দিলে টানে না। এত জল কি করে খাওয়াব?

মনে পড়ে সেদিনের সেই শীতের রাত্রি। চামচে করে গ্লুকোজের জল একটু একটু করে ছেলের মুখে দিচ্ছি। একবার ঢোঁক গিললে আবার এক চামচ দিচ্ছি। সারাদিন খেটেখুটে আমার স্ত্রী ছেলের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে, আমার বন্ধু অমন যত্ন করে দুবেলা এসে দেখে যাচ্ছেন, আমি সারাদিন পাশে আছি; দেখে তিনি ভরসা পেয়েছেন, নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ক্লান্ত ঘুমন্ত মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আমার চোখে ঘুম নেই। বেহুঁশ ছেলের মুখে একটু একটু করে গ্লুকোজের জল দিচ্ছি আর নাড়ী ও নিঃশ্বাসের গতি গুনছি। নখের রঙ নীল হচ্ছে কিনা বার বার টর্চ দিয়ে দেখছি। এই গভীর রাত্রে অতর্কিতে কখন মৃত্যু এসে দেখা দেয় সেই আতঙ্ক বুকে নিয়ে খাটের পাশে আলো জেলে বসে আছি।

ভোর চারটে নাগাদ ইউরিন হল। যে কুড়ি আউন্স জলে গ্লুকোজ গুলে রেখেছিলাম ভোর হবার আগেই দেখলাম শেষ হয়ে গেল। আবার ফিডিং-বট্‌লে খেতে শুরু করল। ক্রাইসিস্‌ কেটে গেল। কয়েকদিন পরে ছেলে চোখ মেলে চাইল। জ্বর ছেড়ে গেল।

আর আজ দুটো পেনিসিলিন দিয়েই আমার এই রুগীর জ্বর ছেড়ে গেছে। ভাত খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে। ভাত খেতে দিন, বলায় ছেলের বাবা হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। ভদ্রলোককে ভরসা দিয়ে বুঝিয়ে বললাম—জ্বর যখন ছেড়ে গেছে আর পেট যখন ভাল আছে তখন একটু গলা ভাত আর মাছ সেদ্ধ দিতে পারেন, কোনো ভয় নেই। বিকেলে একটু মিষ্টি দই আর একটা সন্দেশ দেবেন। আমি গিয়ে আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আসব।

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলেন। হাসপাতালের কাজ সেরে দুপুরবেলা ইন্‌জেক্‌শন দিতে এঁদের বাড়ি গিয়ে দেখি ছেলেটি উঠে বসে বিছানায় খেলা করছে। মা পাশে শুয়ে বই পড়ছেন। আমি যেতেই

মা তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। ছেলেটি মার কোলে আশ্রয় নিল। বললাম—এই তো ছেলে দিব্বি উঠে বসেছে। ভাত খেয়েছে?

মা বললেন—আজ সবে জ্বর ছেড়েছে। আজই ভাত খাবে কি? আজ দুধ বার্লি দিয়েছি। উনি বলছিলেন বটে, আপনি নাকি গলা ভাত, মাছ সেদ্ধ, দই আর সন্দেশ খাওয়াতে বলেছেন। কি শুনতে কি শুনে এসেছেন। ওঁর কাণ্ডই এ-রকম। কোনো কিছুতে যদি খেয়াল থাকে। নইলে প্রথম যেদিন খোকার জ্বর হল সেদিনই বলেছিলাম ডাক্তার ডাকতে, তা উনি ভুলেই গেলেন। পরের দিনও বলে বলে ওঁকে পাঠাতে পারলাম না। শেষ-কালে সেই গেলেন ছুটে যখন জ্বরে ছেলে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ল। আগে যদি যেতেন তাহলে কখনও এত বাড়াবাড়ি হয়?

মনে পড়ল আমার মার কথা। মাও ঠিক এমনি কথা একদিন বাবাকে বলেছিলেন। সেদিনও ঠিক এমনি কোলে শুয়ে ছিল আমার ছোট্ট ছ মাসের ভাই মাখন। তুলতুলে দেহ, ধবধবে রঙ, নিউমোনিয়া হয়ে কেমন নিমেষে নীল হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তখন আমার কতই বা বয়েস, বছর দশেক হয়তো-বা। কিন্তু মৃত্যুর সেই হিমশীতল পরশ, সেই সাংঘাতিক ভয়াল রূপ, জীবনের সেই প্রথম অভিজ্ঞতা মনে হলে বুক এখনও তেমনি কেঁপে ওঠে।

তখন আমরা পূর্ব পাকিস্থানের এক গাঁয়ে নিজের জন্মভূমিতে থাকি। বাবা গাঁয়ের হাসপাতালের সরকারী ডাক্তার। হাসপাতাল আর প্র্যাক্‌টিস্ নিয়ে তিনি সারাদিন ব্যস্ত, ঘরের রুগী দেখার সময় কোথা? এইটেই মার অভিযোগ।

একদিন সকালে মার কান্না শুনে ঘুম ভেঙে শুনলাম মার এই নালিশ! বললেন—আর দুদিন আগেও বুকটা পরীক্ষা করে যদি একটা ওষুধ দিতে তাহলে আর এ সর্বনাশ হত না। নিউমোনিয়াতে এসে দাঁড়াত না। এত বড়াবাড়ি হত না।

বাবা কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অবসরপ্রাপ্ত এক প্রবীণ চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে নাড়ী দেখে বুক পরীক্ষা করে বাবাকে নিয়ে বাইরে গেলেন। তারপর শুরু হল চিকিৎসা।

বাবা হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন আনিয়ে যন্ত্রটা ঠিক করে বসিয়ে দিলেন। বড়রা পালা করে নাকের কাছে ফানেল ধরে বসে রইল। ঘড়ি ধরে ওষুধ পথ্য চলতে লাগল।

মনে পড়ল বাবার সেই বিষণ্ণ অপরাধী মুখ। মনে পড়ল মার কান্না। হাসপাতালের অক্সিজেনের স্টক্ ফুরিয়ে এসেছে। আজ রাতটা কাটে কিনা সন্দেহ। বিকেলের গাড়িতেই সদরে লোক পাঠানো হল, রাত্রে কিনে ভোরের আগেই পৌঁছে যাবে। আগের দিন কলকাতায় টেলিগ্রাম করা হয়েছে, কালই হয়ত পার্সেল এসে পড়বে।

জ্যাঠামশাই কবিরাজ। তিসি বেটে গরম করে বুকে পিঠে পুলটিসের ব্যবস্থা করলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে দেওয়া হল। মকরধ্বজ, তুলসী-পাতা, আদার রস আর মধুতে আধ ঘণ্টা ধরে খলে মেড়ে খাওয়ান হল। বিকেলের দিকে তিসির বদলে পেঁয়াজ বেটে পুলটিস্ দেওয়া হল। আমাদের এক আত্মীয় হোমিওপ্যাথ পালসেটিলা খাওয়ালেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সকালবেলা অক্সিজেন ফুরিয়ে গেল, সদর থেকে তখনও লোক ফিরল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

মনে পড়ল ক্লাসে যখন নিউমোনিয়ার চিকিৎসা পড়ানো হয় প্রফেসর বলতেন—নিউমোনিয়ার কোনো অষুধ নেই ; কিন্তু চিকিৎসা আছে। চিকিৎসা হল রুগীর কষ্ট দূর করা। নিঃশ্বাসের কষ্টে রক্ত নীল হতে দেখলে অক্সিজেন দাও। প্রচুর গ্লুকোজের জল খাওয়াও একটু একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে। যত বেশী জল খাবে রুগী তত ভাল থাকবে। ওষুধ কিছু নেই। মকরধ্বজ, পালসেটিলা, পুলটিস্, এণ্টিফ্লোজেস্টিন এ সবে কিছু হয় না। যারা বাঁচবার তারা অমনি বাঁচে, যারা মরবার তারা মরে।

আজ আমার তিন বছরের রুগীটির দুটো পেনিসিলিন নিয়েই নিউমোনিয়া জ্বর ছেড়ে গেছে। উঠে বসে খেলছে। এখন আমরা জানি, নিউমোনিয়ার ওষুধ আছে। কিন্তু যে প্রফেসর বলেছিলেন ওষুধ নেই তিনি দেখে যেতে পারেননি। স্যার আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন আবিষ্কারের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমার এই বাচ্চা রুগীটিকে আবার একটা পেনিসিলিন দিয়ে রুগীর মাকে বললাম—আর জ্বর হবে বলে মনে হয় না। নির্ভয়ে ভাত দিতে পারেন।

রুগীর মা ভরসা পেলেন না। ভাত খেলেই আবার হয়তো জ্বর আসবে এই ভয়ে রাজী হলেন না। স্বামীর গাফিলতিতে একবার ছেলের বাড়াবাড়ি হয়েছে, ভাত খাইয়ে আবার যদি হয়?

মনে যে ধারণা একবার বদ্ধমূল হয়ে থাকে, একদিনে এক কথায় কখনও

তা যায় কি? দীর্ঘদিনেও দেখি যায় না। কবে আমার ছোট্ট ভাইটির মৃত্যু হয়েছে, চিকিৎসার কত অদলবদল হয়েছে, তবু মার কিন্তু এখনও ধারণা : বাবা যদি দুদিন আগেও একটা ওষুধ দিতেন তাহলে আর নিউমোনিয়া হত না; মাখন বেঁচে যেত।

॥ ৪ ॥

তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। পাকিস্থানের জন্ম হয়নি। শুধু জল্পনা-কল্পনা আর তাই নিয়ে কাগজে কাগজে কথার লড়াই চলছে। দেশ থেকে আমার একটি আত্মীয় একটি রুগী পাঠালেন।

মফস্বলের রুগী কলকাতায় আসে, বড় ডাক্তার দেখাতে। চিকিৎসাটা কি হল সেটা গৌণ। নামকরা কোন বড় ডাক্তার দেখানো হল, কে কি বললেন সেইটেই মুখ্য। বড় বড় ডাক্তার দেখাও, ঘটা করে চিকিৎসা কর। ফিরে গিয়ে যেন বলতে পারি—অমুক ডাক্তার দেখিয়েছি, এত এত পরীক্ষা হয়েছে, এত টাকা খরচ হয়েছে। এ রকম দুটি একটি রুগী হাতে থাকলে মনটা বেশ হালকা থাকে। কাজ করে সুখ পাওয়া যায়। টাকার কথা ভাবতে হয় না। পকেটে বেশ দু পয়সা আসে।

এই রুগীটি দেখে কিন্তু চক্ষু চড়ক-গাছে উঠে গেল। ছ মাসের একটা বাচ্চা। প্রায় মাসখানেক হল জ্বর হচ্ছে। একটা চোখ ফুলেছে। ফোলা নয় যেন চোখের গর্ত থেকে চক্ষু-পিণ্ডটা ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। শুধুই কি চোখ? পিঠে কাঁধের নীচে দুদিক এবং দু হাঁটুর নীচে পায়ের পেছনে দুদিক ফুলে ঢিবি হয়ে উঠেছে। পরীক্ষা করে মনে হল সব কটার ভিতরেই পুঁজ হয়েছে। জ্বর ১০৫ ডিগ্রী।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি করে এতটা বাড়লো?

ছেলের বাবা বললেন—মাস দেড়েক আগে মাথায় ঘা হয়ে শুকিয়ে যাবার মুখে ছেলেটা একদিন বিছানা থেকে পড়ে চোখে ব্যথা পায়। তার পরই মাথার ঘা শুকিয়ে গেল। কিন্তু চোখটি ফুলে উঠলো।

বললাম—তখন ওষুধপত্র কিছু দেননি?

ভদ্রলোক বললেন—গাঁয়ে থাকি, ধারে-কাছে ভাল ডাক্তার নেই। তাই নিজেই—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখেছি। বাড়িতে বসে বই পড়ে, আর বিনা পয়সায় অষুধ বিলিয়ে। প্রথম দিন থেকেই বই দেখে লক্ষণ মিলিয়ে অষুধ দিয়েছি। পরে জ্বরটা ক্রমশ বাড়ছে দেখে দু মাইল দূরে থেকে এলোপ্যাথী ডাক্তার নিয়ে এলাম। তিনি সিবাজল দিলেন। চোখে বরিক্‌ কম্‌প্রেস্‌ করতে বললেন।

বললাম—কটা সিবাজল পড়েছে?

ভদ্রলোক বললেন—আধখানা করে ছ দিনে তিনটে। তাতে জ্বরটা কিছু কমেছিল কিন্তু ফোলাটা কমেনি। তারপর ডাক্তারবাবু কি একটা টনিক দিলেন আর কম্প্রেস্ বন্ধ করে এণ্টিফ্লোজেস্টিন লাগাতে বললেন। তাই চললো কিছুদিন। জ্বরটা আবার বেড়ে গেল। তখন বললেন, পেনিসিলিন দিতে হবে।

বললাম—কত লাখ পেনিসিলিন পড়েছে?

ভদ্রলোক বললেন—অতটুকু বাচ্চাকে তিন ঘণ্টা পর পর ফোড়া হবে ভেবে প্রথমটায় আমরা রাজী হলাম না। কয়েকদিন বায়োকেমিক করে দেখলাম। কিন্তু জ্বরটা কমে আবার ১০৩° ডিগ্রী উঠে গেল দেখে পেনিসিলিন দেওয়াই ঠিক হল। দুদিন এক লাখ পেনিসিলিন দেওয়া হল। কিন্তু জ্বরটা ১০০° ডিগ্রীর নীচে নাবলো না। চোখের ফোলা যেমন ছিল তেমনি রইল। হঠাৎ একদিন গালটাও ফুলে উঠলো। ডাক্তারবাবু বললেন, চোখের ভিতর থেকে পুঁজটা বোধ হয় গাল দিয়ে বেরুচ্ছে। কেটে দিলেই বেরিয়ে যাবে। জানেন তো কাটাকুটিতে আমাদের কত ভয়, তবু রাজী হলাম। ডাক্তারবাবু গালে অপারেশন করলেন কিন্তু পুঁজ বেরুলো না। দেখে আমরা ঘাবড়ে গেলাম। পরদিন জ্বর ১০৫° ডিগ্রী উঠে গেল। পিঠে আর পায়ে চার জায়গা ফুলে উঠলো ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি এখানে চলে এলাম। এখন আপনিই একমাত্র ভরসা।

শেষ অবস্থায় রুগী দেখাতে নিয়ে এলে কোনো ডাক্তারেরই মেজাজ ঠিক থাকে না। ডাঃ তলাপাত্র হলে স্পষ্টই বলে দিতেন—এত দেরি করে আমার কাছে এসেছ কেন? এখন শকুন ডেকে নিয়ে যাও।

কিন্তু সত্যি কি শেষ অবস্থা? অমন ফুটফুটে বাচ্চাটা বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে? একটা চোখের দৃষ্টি যদিও বা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, প্রাণটা যাবে কেন? এখুনি সব কটা জায়গায় অপারেশন করে পুঁজ বার করে বেশী করে পেনিসিলিন দিলে কেন বাঁচবে না?

ছেলের বাবাকে বুঝিয়ে বললাম—রোগটা হল 'অরবিটাল সেলুলাইটিস', অর্থাৎ চোখের গর্তের ভেতরে পুঁজ হয়েছে। সেই পুঁজ বাইরে বেরুবার চেষ্টা করে চোখটাকে ঠেলে বার করে দিচ্ছে। পুঁজটা বেরুতে না পেরে অবশেষে রক্তের সঙ্গে মিশে পাইমিক অ্যাব্‌সেস্ হয়ে এক এক জায়গায় ফুটে বেরুচ্ছে। এক্ষুণি সব জায়গা থেকে পুঁজ বার

করে দেওয়া দরকার। একটা চোখের দৃষ্টি হয়ত গেছে। কিন্তু প্রাণটা তো রক্ষা পাবে।

শুনে ভদ্রলোক আমার দু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন—আপনার ভরসাতেই এত দূর থেকে এসেছি। সব চেয়ে বড় সার্জন দেখিয়ে যা ভাল হয় তাই করুন।

সব চেয়ে বড় সার্জন কে? যাঁর সব চেয়ে বেশী নাম? একবার যাঁর নাম হয়েছে প্রয়োজনের সময় তাঁকে পাওয়া সব চেয়ে বেশী কঠিন। এত বেশী লোক তাঁর কাছে যায় যে, রুগীর প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যটুকুও সব সময়ে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। লোকে ভুলে যায় চিকিৎসক একজন মানুষ মাত্র। তাঁরও ক্ষমতার একটা সীমা আছে। দেশ-বিদেশ থেকে যত লোক একই সঙ্গে তাঁর কাছে আসে, দেখে মনে হয় এঁরা যেন সব তীর্থযাত্রী। দেবদর্শনে এসেছে। বড় ডাক্তার একবার দেখলেই বুঝি এদের রোগ সেরে যাবে।

তখন বেলা বারোটা। কোনো সার্জনকেই টেলিফোনে পাওয়া যাবে না। এটা হাসপাতালে থাকবার সময়। হাসপাতালের পর যদি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, এই ভেবে হাসপাতালে এলাম। এসে দেখি প্রথম সার্জন অপারেশন করছেন। ঘণ্টাখানেক বাইরে ঘোরাঘুরির পর তিনি বেরুলেন। আমাকে চিনতেন, দেখেই বললেন—কি হে, কি খবর?

নিবেদন করলাম—দেশ থেকে একটি রুগী এসেছে, অরবিটাল সেলুলাইটিস থেকে পাইমিক্ অ্যাব্‌সেস্, জ্বর ১০৫°। বাড়ি ফেরবার পথে যদি দয়া করে একবার দেখে যান।

সার্জন বললেন—আজকে তো ভাই হয় না। তিন দিন পর্যন্ত আমি বুক্‌ড্। বিকেলে চেম্বারে নিয়ে এস, দেখে দেব এখন।

মফস্বলের রুগী। একবার বুঝিয়েছি সার্জনকে বাড়ি নিয়ে আসব। এখন না পারলে আমার প্রেস্‌টিজ থাকবে না। ভাববে আমি কিছুই পারি না। তাই দ্বিতীয় সার্জনের খোঁজে বেরুলাম। সারা হাসপাতাল খুঁজে তাঁকে পাওয়া গেল না। শুনলাম এই এক্ষুণি তিনি বাড়ি চলে গেলেন।

বিকেলে চারটের সময় তাঁকে ফোন করে ঠিক হল সাড়ে ছ-টার সময় তিনি রুগী দেখতে আসবেন। ছ-টার সময় রুগীর বাড়িতে গিয়ে এ খবর দিয়ে বললাম—কালই অপারেশন করিয়ে দেব।

ঠিক সাড়ে ছ-টায় ইনি এলেন। বেশ খুশ-মেজাজে গাড়ি থেকে নেমে

হাসি-গল্প করতে করতে ভেতরে ঢুকে রুগী দেখেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—তাইত, চোখটা এরকম হল কি করে?

সব শুনে বললেন—পিঠের এবং পায়ের যে ক'জায়গায় এ্যাব্‌সেস্‌ হয়েছে কালকেই তা কেটে দি। বেশী করে পেনিসিলিন দেওয়া হোক। চোখটা পরে দেখা যাবে।

বললাম—চোখটা থেকেই যখন শুরু, ওটা ফেলে রাখা কি ভালো হবে? একবার যখন পাইমিক্‌ এ্যাব্‌সেস্‌ আরম্ভ হয়েছে আরও তো হবে। তার চেয়ে একসঙ্গেই সব করে দিন না? হাঙ্গামা চুকে যাক।

শুনে সার্জন আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুখখানা কালো করে বললেন—চোখটায় হাত দেওয়া এখন ঠিক হবে না। এগুলো আগে হোক, জ্বরটা কমুক, তখন দেখা যাবে।

বুঝলাম, চোখে ইনি হাত দিতে চান না। কিন্তু কেন? যত কঠিন কঠিন অপারেশন ইনি করেছেন তাতে এ তো একটা অপারেশনই নয়। শুধুই ফোঁড়া কাটা। তবু কেন এত আপত্তি? বিনা পয়সার কেস্‌ও নয়! তবে? চোখ বলেই কি এই দ্বিধা? এটা কি তাহলে চোখের সার্জনের কাজ?

বললাম—যদি দরকার মনে করেন তাহলে চোখের সার্জনও কাউকে দেখাই। আপনারা দুজনে একসঙ্গে সব কটা অপারেশন একদিনেই করে দিন।

তবু ইনি রাজী হলেন না। মুখখানা আরও কালি করে বললেন—আমার মতে চোখটা এখন ডিস্‌টারব্‌ করা ঠিক হবে না।

ইনি বাম-পন্থী সার্জন, আমাদেরই সমবয়সী। এ'র কাছ থেকে এরকম কথা কখনও আশা করিনি। ডাঃ তলাপাত্রের কথা মনে পড়ল। তলাপাত্র বলতেন—ফ্র্যাক্‌চার ভাই আমি কখনও সেট করি না। ঠিক মত যদি জোড়া না লাগে হাত বেঁকে যাবে কি পা খোঁড়া হয়ে থাকবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে দীর্ঘকাল বেঁচে বলে বেড়াবে আমি ওর পা খোঁড়া করে দিয়েছি। সুনাম বজায় রাখতে হলে অনেক ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়, বুঝলে?

ইনিও কি ভাবলেন, ছেলেটা কানা হয়ে বেঁচে থেকে এ'র বদনাম করে বেড়াবে? যাই হোক, বোঝা গেল এ'কে দিয়ে হবে না। ইনি বিদায় হলে ছেলের বাবাকে বললাম—চোখটাই আসল, তাই ইনি ছোঁবেন না। বাকি ফোঁড়াগুলো তো আমিই কেটে দিতে পারি। তার চেয়ে চলুন প্রথম যাঁর

কাছে গিয়েছিলাম। দেখাতে হলে সব চেয়ে যিনি বড় তাঁকে দেখানোই ভাল।

মিছিমিছি একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল। ভেবেছিলাম কালই অপারেশন করিয়ে দেব, তা আর হল না। প্রথম সার্জন বাড়ি এসে দেখে যেতে পারবেন না। অগত্যা পরদিন রুগী নিয়ে ওঁর চেম্বারে গেলাম।

তখনও চারটে বাজেনি কিন্তু ঘর ভরতি লোক। সবাই অবশ্য রুগী নয়। একজন যদি রুগী, সঙ্গী তার তিনজন। শহরের লোক, গ্রামের লোক, দূর দেশের লোক। যে আগে এসে স্লিপে নাম লিখেছে তাকে আগে ডাকা হবে। স্লিপে নাম লিখে চাকরের হাতে দিয়ে টেবিলে রাখা বহু পুরনো বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলাম। দেখতে দেখতে ভিড় আরও বাড়তে লাগল। একজন যদি বেরোয় তিনজন নূতন আসে। কারুর হাতে প্লাস্টার, কারুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কেউ পা ভাঙ্গা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থাকবার পর আমাদের ডাক এল। ভেতরে ঢুকতেই নার্স এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে পরীক্ষা-ঘরে চলে গেল। ছেলের বাবাকে নিয়ে আমি সার্জনের ঘরে ঢুকলাম।

সার্জন একটা এক্স-রে প্লেট দেখছিলেন। দেখা শেষ করে যে ডাক্তার দাঁড়িয়েছিল তাকে কি করতে হবে বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বসো। এইবার বল তোমার কি কেস্।

কেস্টা বুঝিয়ে বললাম। এর মধ্যেই দুবার ফোন এল। সার্জন ফোনে ব্যবস্থা দিতে দিতে আমার কথা শুনতে লাগলেন। শেষ হলে বললেন—চল, তোমারটাই আগে দেখে আসি।

ভেতরে গিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে এঁর মুখখানাও কালো হয়ে গেল। বললেন—তাইত হে, তোমার কেস্ তো বিশেষ ভাল দেখছি না। চোখটা এরকম হল কি করে? একেবারে শেষ করে নিয়ে এসেছ?

মনে মনে বললাম, কেস্ ভাল হলে আর আপনার কাছে আসব কেন? নিজেই তো ম্যানেজ করে নিতাম। কেসটা আবার সব বুঝিয়ে বললাম।

সার্জন রবারের দস্তানা পরে রুগী পরীক্ষা করে বললেন—কালকেই পিঠের আর পায়ের অ্যাব্‌সেস্‌গুলো কেটে দি।

বললাম—চোখটা?

সার্জন বললেন—ওটা এখন থাক। এইগুলিই আগে দরকার।

বললাম—চোখ থেকেই তো অন্য জায়গা অ্যাব্‌সেস্ হচ্ছে। এটা ফেলে রাখা কি ঠিক হবে?

সার্জন আরও গম্ভীর হয়ে বললেন—অ্যাবসেস্‌গুলো এক্ষুনি কেটে

দেওয়া দরকার। দেরি হলে খারাপ হবে।

বলে চোখের কথা এড়িয়ে গিয়ে পাশের টেবিলের রুগী দেখতে চলে গেলেন।

বুঝলাম ইনিও চোখটায় হাত দিয়ে নাম খারাপ করতে রাজী নন। এ'দের এত নাম তবুও বদনামের এত ভয়? কিন্তু কিসের বদনাম? একটা চোখের দৃষ্টি হয়ত নষ্ট হয়েই গেছে, অপারেশন করে সেটা আর কি খারাপ হবে? ভেতরে যে পুঁজ আছে তা বার করে না দিলে আরও অন্য জায়গায় ফুটে বেরুবে, শেষে হয়ত মৃত্যু হবে। তবুও ইনি চোখে হাত দিতে চাইছেন না। নিজের চোখে না দেখলে একথা বিশ্বাসই করতাম না। পর পর দুজন নামকরা সার্জন কেমন অনায়াসে এড়িয়ে গেলেন। নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। অপরিসীম বিস্ময়ে হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। সস্তা সুনামের মোহ বিজ্ঞানীকে কোথায় নিয়ে যায় দেখে স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। পরীক্ষার সময় কোনো ছাত্র এ'দের কাছে রুগীর এই ব্যবস্থা দিলে এ'রাই তাকে ফেল করিয়ে দিতেন।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ছেলের বাবা বললেন—এত নামকরা বড় বড় দুজন সার্জন যখন অপারেশন করতে সাহস পাচ্ছেন না, তখন ভাবছি হোমিওপ্যাথিই করে দেখি। ছেলেটা তো বাঁচবেই না, মিছিমিছি কাটাছেঁড়া করে কি হবে?

একথার কি জবাব দেব? এমন একটা পরিস্থিতি যে হতে পারে, আমিই কি আগে ভেবেছি? এখন কি করে বলি, বড় ডাক্তার দেখানোর শখ মিটলো তো?

ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বললেন—খুবই আশা করে কলকাতা এসে-ছিলাম। ভেবেছিলাম অপারেশন করিয়ে ছেলেটাকে ভাল করে তুলে বাড়ি নিয়ে যাব। আমার কপালে তা হল না। ছেলেটা দেখছি আর বাঁচবে না। আর এখানে থেকে কি হবে? কাল সকালে একজন বড় হোমিওপ্যাথ দেখিয়ে ব্যবস্থা নিয়ে বিকেলের গাড়িতেই ফিরে যাব।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, ছেলেটা বাবার কোলে ঘুমুচ্ছে। ফুটফুটে, ফর্সা, গোলগাল, হাঁদলা-হোঁদলা। এক্ষুণি অপারেশন করিয়ে দিলে এখনও বেঁচে যায়। সে কথা কি করে এ'কে বোঝাই? কাকে দিয়েই বা অপারেশন করাই? সার্জন বন্ধুদের কাছে গেলে এক্ষুনি করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু বড় বড় সার্জনদের এই কথার পর ছেলের বাবা রাজী হবেন কেন? কেনই

বা ভাববেন না, ওঁর ছেলেকে দিয়ে আমরা একটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করতে চাইছি?

তাহলে সত্যি কি ছেলেটা শেষে মরে যাবে? এত অর্থব্যয় করেও বাঁচবার এই শেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে? নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় বলে মনে হল। বাঁচবার উপায় হাতের কাছে, তবু কাজে লাগাতে পারলাম না।

ছেলের বাবা বললেন—আপনিও আমাদের বাড়ি চলুন। ওর মাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।

সব শুনে ছেলের মা কেঁদে ফেললেন। বললেন—আপনার ভরসাতেই এখানে আসা, আপনিও কিছু করতে পারলেন না?

বললাম—অত অধীর হবেন না। একটা ব্যবস্থা হবেই। কলকাতা শহর, অপারেশন করানো যাবে না, তা কি কখনও হয়? দেখি কি করতে পারি?

ছেলের বাপ বললেন—ও চেষ্টা আর করবেন না। এত দেরি হয়ে গেছে অপারেশন ছেলে সইতে পারবে না, টেবিলেই মারা যাবে। অত বড় দু দুজন সার্জন যেখানে সাহস পেলেন না, সেখানে কার কাছে আর যাবেন?

সত্যি, এখন কার কাছেই বা যাব? সুনাম দুর্নামের পরোয়া করেন না এমন বিখ্যাত সার্জন কোথায় পাব? হঠাৎ মনে পড়ল এমন একটি লোক এখনও তো বেঁচে আছেন এবং প্র্যাক্‌টিস্‌ও করেন! একদিন তাঁর নামটাই আগে মনে আসত। এখন কি আশ্চর্য এতক্ষণ মনেই পড়েনি! কিন্তু তিনি ভারতীয় নন। ইউরোপীয় সাহেব এবং বিখ্যাত ব্যক্তি।

বললাম—দুজন নামকরা সার্জন সাহস পাননি বলেই প্রমাণ হয়নি চোখটি অপারেশনের বাইরে চলে গেছে। আমি এখনও মনে করি অপারেশন করা যায় এবং করা উচিত। না করলেই খারাপ হবে, ছেলেটা হয়ত বাঁচবে না। আপনারা যদি মত করেন তাহলে আমি একজন ইউরোপীয় সার্জনকে দেখাই। এঁর নাম আপনারাও জানেন। ইনিও যদি ঐ একই কথা বলেন তাহলে বুঝব আমিই ভুল বুঝেচি।

ছেলের মা বললেন—বেশ, আপনি তাহলে আজকেই সায়েবকে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। কাছেই একজনের বাড়ি থেকে ফোন করে ঠিক করলাম। সায়েব বললেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবেন।

ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে সায়েবের গাড়ি এসে রুগীর বাড়িতে থামল।

সায়েব নেমে বাইরের ঘরে বসে কেসটা আগে সব শুনলেন। তারপর বললেন—চল এইবার রুগী দেখি। ছেলের বাবা কোলে করে বাচ্চাটাকে নিয়ে এলেন। চোখটা দেখেই সায়েব বললেন—চোখটা অনেক আগেই অপারেশন করা উচিত ছিল। বড্ড দেরি হয়ে গেছে, এখন দৃষ্টিটা ফিরবে কিনা বলা শক্ত। পাইমিক্ অ্যাব্সেস্ যখন শুরু হয়েছে আর দেরি করা চলে না। কাল সকালেই ব্যবস্থা কর, অপারেশন করে দি।

বললাম—সবগুলি একসঙ্গে হবে তো?

সায়েব বললেন—নিশ্চয়। একবার আণ্ডার করে চোখটা আগে কেটে বাকি চারটে অ্যাব্সেস্ ওপ্‌ন্ করে দেব। পনের মিনিটের বেশী লাগবে না।

ছেলের বাবা তবু ভরসা পেলেন না। সায়েব যেমন বিখ্যাত ব্যক্তি তেমনি কুখ্যাতও বটেন। ওঁর বদনাম, অপারেশন করে অনেক নাম-করা লোককে নাকি উনি মেরে ফেলেছেন। অপারেশন করা যেখানে দরকার সায়েব সেখানে কোনো বাধা মানেন না। অস্ত্রোপচার করে রুগীকে বাঁচবার শেষ সুযোগ দেন। অপরে যেখানে দ্বিধা করে সাহেব সেখানে নির্ভয়। তাই এই বদনাম।

ছেলের বাবা বললেন—অপারেশনের ফলে প্রাণহানি হবে না তো?

সাহেব হেসে বললেন—অপারেশন করলে হবে না। না করলে হবে।

ছেলের বাবার তবু ভয় গেল না। আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলে ফেললেন—ছেলের মার কাটাছেঁড়াতে বড্ড ভয়। তাই আমরা সাহস পাচ্ছি না।

সাহেব উঠে বললেন—চল, ছেলের মাকে বুঝিয়ে আসি। অগত্যা সায়েবকে ভেতরে নিয়ে যেতে হল। ছেলের মার কাছে গিয়ে সায়েব বললেন—আপনার ছেলেকে কাল আমি অপারেশন করব। একসঙ্গে পাঁচ জায়গায় অপারেশন করলে ছেলে বেঁচে যাবে। তার জীবনের জন্য আমি দায়ী থাকব। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখনও অপারেশন করলে আপনার ছেলে বাঁচবে, কিন্তু না করলে বাঁচবে না। অপারেশনে কোনো রিস্‌ক্ নেই। লাইফের জন্য আমি নিজে গ্যারাণ্টি থাকব। বলে নিজের বাঁ হাত মুঠো করে বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের বুক ঠুকে বার বার নিজেকে দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

সায়েবকে অত জোরে কথা বলতে দেখে ছেলের মা তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলেন। ছেলের বাবার মনেও কিছু ভরসা হল। কিন্তু সায়েবকে দিয়ে

অপারেশন করাতে না জানি কত টাকা লাগবে এই ভেবে একটু ইতস্তত করে আমার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন—সায়েব কত নেবে?

সায়েব তক্ষুনি জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলের বাবা ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বললেন?

সায়েবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম—কত দর্শনী দিতে হবে না জানলে এরা সাহস পাচ্ছে না।

সায়েব তক্ষুণি বললেন—আই য়্যাম নট এ গ্রীডি ম্যান। তোমার পার্টি তুমিই ভাল জানবে এদের অবস্থা। তুমি যা দেবে তাই আমি নেব। কিন্তু কালকেই অপারেশন করা চাই।

ঠিক হল, পরদিন সকালে সায়েবের নার্সিং-হোমে অপারেশন হবে।

৯টার সময় অপারেশন। ভোর সাতটায় রুগীকে নার্সিং-হোমে নিয়ে যাওয়া হল। সিস্‌টার বাচ্চাটাকে রেডি করতে নিয়ে গেল। নটার একটু আগে সাহেব এলেন। সিস্‌টারকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন সব ঠিক আছে কি না। তার পর হাত ধুয়ে তৈরী হতে গেলেন। রুগীর মা বাবা রুগীর নির্দিষ্ট ঘরে বসে রইলেন। আমি অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলাম।

অতটুকু বাচ্চা; চট্‌ করে আণ্ডার হয়ে গেল। সায়েব ভুরুর নীচে এক ইঞ্চি আন্দাজ কেটে একটা লম্বা ফরসেপ্‌স্‌ ঢুকিয়ে চাড় দিলেন। অমনি চোখের গর্তের ভেতর থেকে পুঁজ আর কালো রক্ত ভক্‌ করে বেরিয়ে এল। চট্‌ করে একটা সরু গজ ঢুকিয়ে রুগীকে উল্টে দিতে বললেন। যিনি অজ্ঞান করছিলেন তিনি আর আমি বাচ্চাটাকে উল্টে দিলাম। এইবার পিঠের অ্যাব্‌সেস্‌ ছুরির এক টানে ওপ্‌ন্‌ করে ফরসেপ্‌স্‌ দিয়ে মুখটা ফাঁক করে দিলেন। পুঁজ রক্ত আপনি বেরিয়ে এল। অমনি গজ ঢুকিয়ে দিলেন। এমনি করে চট্‌পট্‌ চারটে অ্যাব্‌সেস্‌ কাটা হল। পনের মিনিট লাগবে বলেছিলেন, দশ মিনিটেই হয়ে গেল।

দুদিন নিজে ড্রেস করে সায়েব বললেন—এইবার বাড়ি নিয়ে যাও, একদিন অন্তর ড্রেস কোরো।

আট দশ দিনের মধ্যেই সব কাটা জুড়ে গেল। জ্বরটা কিন্তু একেবারে ছাড়লো না। রোজ বিকেলের দিকে গা একটু গরম হয়ে ৯৯° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠতো, আবার রাত্রে ছেড়ে যেত। সায়েব সব অষুধ বন্ধ করে দিয়ে বললেন, আপনিই আস্তে আস্তে এটা সেরে যাবে।

ছেলের মা বললেন—সব ভাল হয়ে এই একটা খুঁত নিয়ে আমি ছেলে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না। পরে যদি বেড়ে যায়? এই জ্বরটুকুও

সারিয়ে দিন।

বললাম—বেশ তো, কয়েকদিন থেকেই যান না? ওষুধ বন্ধ করে দিন সাতেক দেখা যাক।

দিন তিন চার পরে গিয়ে দেখি জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে। ছেলের মা বললেন—কাল থেকে জ্বর ছেড়ে গেছে। তাই ফিরে যাবার উদ্যোগ করছি।

বললাম—দেখলেন তো, ওষুধ বন্ধ করেই কেমন জ্বর ছেড়ে গেল! তখনি বলেছি আর ওষুধের দরকার নেই। ছেলের বাবা হেসে বললেন—বিনা ওষুধে মোটেই সারেনি। আপনাদের ওষুধ দুদিন বন্ধ করেও যখন দেখলাম জ্বর ছাড়লো না, তখন আমি নিজেই লক্ষণ মিলিয়ে দিলাম এক ফোঁটা ওষুধ। তাইতেই পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল। আমাদের ওষুধ ঠিকমত লাগাতে পারলে এক ফোঁটাতেই কাজ দেয়। দেখলেন তো ফলটা?

॥ ৫ ॥

আমাকে কিছুদিন নিজ হাতে রান্না করে খেতে হয়েছে। একবার সেই জাপানী বোমা পড়বার সময়। আর একবার দশ বারো বৎসরের ছেলে দুটি নিয়ে যখন এ বাড়িটায় এলাম সেই সময়। আমার একটা বাচ্চা চাকর ছিল। আমার ছেলে দুটির চেয়ে ৩। ৪ বছরের বড়। সে-ই আমাদের তিন-জনের রান্নাবান্না সব কাজ করে দিত।

একদিন রুগী দেখা শেষ করে দুপুর বেলা বাড়ি ফিরে দেখি সেই চাকরটি শুকনোমুখে সিঁড়ির নীচে বসে আছে। চেহারা দেখেই মনে হল স্নান-খাওয়া কিছুই হয়নি। জিজ্ঞাসা করলাম—কি রে এখনও চান করিস নি? এত বেলায় নীচে বসে আছিস?

চাকরটি বললে—বড়দাদাবাবু ওপরে উঠতে বারণ করেছে।

বললাম—কেন? কি হয়েছে?

চাকরটি বললে—বড়দাদাবাবু আমাকে বরখাস্ত করেছে। বলেছে আপনি ফিরলে মাইনে নিয়ে চলে যেতে।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। এ ছোকরাটি প্রায় বছর দুই আমার কাছে আছে। ছেলেদের প্রায় সমবয়সী। তাই মাঝে মাঝে কথা-কাটাকাটি ঝগড়া-ঝাঁটি এমনকি হাতাহাতিও কখনো-সখনো হয়েছে। আমি এসে নালিশ শুনে মামলা মিটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ আমি বাড়ি ফিরবার আগেই চাকরি থেকে একেবারে ডিস্‌মিস্‌ হয়ে গেল শুনে ভাবনা হল, নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—রান্নাবান্না সব করেছিস?

মাথা হেঁট করে চাকরটি বললে—আজ্ঞে না বাবু। দাদাবাবু রান্নাঘর থেকে বার করে দিয়েছে। ওপরে উঠতেই দিচ্ছে না।

মে মাসের দুপুর রোদে বেলা দেড়টা নাগাদ অভুক্ত থেকে বাড়ি ফিরে একথা শুনলে মেজাজখানা কি রকম হয় একবার ভেবে দেখুন। গরম গরম এর ঝালটি গিন্নীর ওপর ঝাড়তে পারলে সেই পরিমাণ সুখটি হয় কিনা তাও একবার ভাবুন। কিন্তু আমার ভাগ্য অন্যরূপ। এই সুখটুকু থেকেও আমি বঞ্চিত। কারণ আমি বিপত্নীক। বছর দুই আগে আমার ঝঞ্ঝাট আমারই ঘাড়ে ফেলে আমার স্ত্রী গত হয়েছেন। তাই মুখখানা প্যাঁচার

মত কালো করে গম্ভীর হয়ে বললাম—আচ্ছা, চল ওপরে। দেখি কি হয়েছে।

ওপরে উঠতেই দেখি আমার বড় ছেলে গেরুয়া রঙের পাজামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে রান্নাঘরে জল ঢেলে ঝাঁটা দিয়ে সাফ করছে। উনুনে মাছের ঝোল ফুটছে। কুকার নাবানো। থালা বাটি সব মাজা হয়ে গেছে। এইবারে বাবু ঘর সাফ করছেন।

আমাকে দেখেই বললে—রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে। এইবারে তুমি খেতে বসতে পার।

রান্না হয়নি শুনে মনের মধ্যে যে আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, খাবার তৈরী শুনে তাই যেন ফুট্‌স্ করে নিভে গেল। তবুও মুখ গোমড়া করেই বললাম—কিন্তু এসব কি? পড়াশুনা না করে রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর ধোয়া? চাকর ছাড়িয়ে দিয়ে এ সবই করবি নাকি?

বুক ফুলিয়ে ছেলে বললে—হ্যাঁ, আমরাই করব যতদিন না অন্য লোক পাওয়া যায়।

আমরা অর্থাৎ উনি নিজে এবং ওঁর ছোট ভাই। একজনের বয়স বারো, আর একজনের দশ।

বেশ একটু রাগ করেই বললাম—তাহলে এখন থেকে ঘরের কাজই কর। ইস্কুলে গিয়ে আর কি হবে?

ছেলে বললে—ইস্কুলে যাব না কেন? আমরা দুভায়ে ভাগ করে সব কাজ করব। একবেলা আমি, একবেলা ছোটবাবু।

ছোটবাবুটি এতক্ষণ বাথরুমে ছিলেন। স্নান সেরে গা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বললেন—হ্যাঁ বাবা, আমরা দুজনে ভাগ করে সব কাজ করে ফেলব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তাছাড়া পাড়ার ছেলেদের বলে রেখেছি, আজই বিকেলে দেখো লোক এসে যাবে।

আমার এই দুই ছেলের মধ্যে বয়সের ব্যবধান মাত্র ষোল মাস। কিন্তু দুজনের মধ্যে এতটুকুও মিল নেই; না চেহারায়, না স্বভাবে। বনিবনাও ছিল না। একজন যদি হাঁ বলে আর একজন ঠিক না বলবে। খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে খটাখটি ঝগড়াঝাঁটি শেষ পর্যন্ত মারামারি রোজই লেগে যেত। কোনো কিছুতেই দুজনে কখনো একমত হত না। কিন্তু এই চাকর তাড়ানোর ব্যাপারে দেখলাম দুজনেই এক এবং অভিন্ন।

বললাম—কিন্তু ওর অপরাধটা কি শুনি?

অপরাধ যা শুনলাম, সে হলঃ চাকরটি ইদানীং নাকি ভয়ানক

ইম্‌পারটিনেন্ট হয়েছে। কথা বললে গ্রাহ্যই করে না। ডাকলেও নাকি সাড়া দিতে চায় না। কৈফিয়ত চাইলে বলে শুনতে পায়নি। কিছু একটা হুকুম করলে সে কাজ তো করেই না, উল্টে নিজের মনে বিড়বিড় করে কি সব বলে। তার ওপর ভীষণ নোংরা। রোজ স্নান করে না। নিজের জামাকাপড় কাচে না। গায়ে দুর্গন্ধ। ওর হাতে ছেলেরা খাবে না।

নোংরা থাকা নিয়ে ছোকরাটাকে আমিও অনেক বকাঝকা করেছি। আজকাল তাই স্নানও করত, জামাকাপড়ও পরিষ্কার রাখত। আজ নাকি উনুন ধরাতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, কলের জল চলে গেছে। তাই ও বলেছিল বিকেলে স্নান করবে। সেই কথাতে দাদাবাবুরা ক্ষেপে গেছে। বলেছে ওর হাতে আর খাবে না।' এর পর এ বাড়িতে আর ও কাজ করবে না।

বুঝলাম দু পক্ষই এখন বেশ গরম। এক্ষুণি কোন মীমাংসা করা যাবে না। তাই চাকরটাকে বললাম—এখন তো খাওয়াদাওয়া কর। যেতে হয় ও-বেলা যাবি।

চাকরটি মাথা নীচু করে বললে—না বাবু, আমি এখানে খাব না।

সেই যে ঘাড় নীচু করে না বললে, তাকে আর হ্যাঁ বলাতে পারলাম না। বুঝলাম ছেলেরা ওর হাতে খাবে না বলাতেই ওর মনে খুব লেগেছে। তাই বাবুদের হাতেও ও আর খাবে না। ছেলেদেরও বোঝাতে পারলাম না একথা বলা ওদের অন্যায় হয়েছে। নোংরা লোকের হাতে খেতে নেই একথা নাকি হাইজিনে আছে। মাস্টারমশাই বলেছেন।

কাজেই চাকরটিকে বিদায় করতে হল। ছেলেরা মহা উৎসাহে ঘরের কাজে লেগে গেল। এমনি করে তিন চারদিন কেটে গেল। পাড়ার ছেলেরা কেউ নতুন চাকর যোগাড় করে দিতে পারল না। কিন্তু রোজই শুনতাম—ও বেলাই লোক আসবে।

একদিন রাত দশটা নাগাদ কাজ সেরে বাড়ি ফিরে দেখি আমার বড়-ছেলে বাড়ির দোরগোড়ায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি রে এই অসময়ে এখানে যে দাঁড়িয়ে? খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

ছেলে বললে—রান্নাই হয়নি তা খাব কি?

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? কি হয়েছে?

ছেলে বললে, আজ বিকেলে ছোটবাবুর ডিউটি ছিল এবং সন্ধ্যার পর কুকারও যথারীতি উনুনে বসানো হয়েছিল। এক ঘণ্টা পরে যখন নাবানোর

কথা তখন গিয়ে দেখা গেল উনুন নিবে গেছে। কুকারের ভেতর ডাল-চাল যেমন ছিল তেমনি আছে, কিছু সেদ্ধ হয়নি। তারপর ছোটবাবু নতুন করে কয়লা ভেঙ্গে ঘুঁটে দিয়ে উনুন সাজিয়ে কাগজ দিয়ে ৫।৭ বার ধরাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু উনুন ধরেনি। বার বারই ঘুঁটে কাগজ সব পুড়ে গেছে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে ছোটবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়বাবুর একা থাকতে ভয় করে তাই রাস্তায় নেমে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। শুনে ইচ্ছে হল ঠাস্ করে ওর গালে এক চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু ওর ঐ শুকনো মুখ আর অসহায় ভাব দেখে শুধু বললাম—তা ছোটবাবু যখন পারল না তুই নিজে ধরালেই তো পারতিস্।

বড়বাবু বললে, উনুন ধরানোর ব্যাপারে ছোটবাবুই নাকি খুব এক্সপার্ট। আজ সেই যখন ফেল মেরে গেল তখন ওতে হাত দিয়ে আর কি হবে? তাছাড়া ও তখন অঙ্ক কষছিল যে!

এর পরে আর কথা চলে না। তাই পোশাক ছেড়ে লুঙ্গি পরে রান্না-ঘরে ঢুকলাম। উনুন ধরিয়ে রান্না শেষ করে গা ধুয়ে যখন বেরুলাম তখন রাত বারোটা বেজে গেছে।

ছোটবাবু ঘুমুচ্ছিল। তাকে তুলে তিনজনে খাবার টেবিলে যেই বসেছি অমনি সিঁড়িতে ধপাধপ পায়ের শব্দ শোনা গেল। দোতলায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ির পাশেই আমাদের খাবার ঘর। মনে হল একাধিক লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসছে।

এত রাত্রে এরা আবার কারা? দরজায় কড়া নাড়বার আগেই খাবার টেবিল থেকে উঠে সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়ে দেখি তিনজন অপরিচিত লোক ওপরে উঠে এসেছে। এদের মধ্যে দুজনকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হল না। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের দুই যুবকের সঙ্গে তের চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে। ছেলেটিকে ভাল করে দেখতে যেন চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু কার ছেলে কি নাম কিছুই মনে পড়ল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কাকে চাই?

প্রথম যুবকটি বললে—ডাক্তারবাবুকে। একটু তাড়াতাড়ি ডেকে দিন, বিশেষ দরকার।

গম্ভীর হয়ে বললাম—আমিই ডাক্তারবাবু। বলুন কি দরকার।

শুনে যুবকটি একটু থতমত খেয়ে গেল। একবার আমার পোশাকের দিকে, আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বুঝলাম কলকাতার মত শহরে এত রাত্রে কড়া না নাড়তেই খালি গায়ে লুঙ্গিপরা

ডাক্তারবাবুর দর্শন মিলবে এতটা বোধ হয় শ্রীমান কখনও প্রত্যাশা করেনি।

গলার স্বর আরও বেশী ভারী করে বললাম—কি দরকার?

যুবকটি বার দুই ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বলে ফেললে—এই ছেলেটির মা আপনার কাছে পাঠালেন। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?

দেখুন দেখি কি মুশকিল! এত রাত্রে আমার নিজেরই বলে খাওয়া হয়নি, তা একে এখন জল খাওয়াও। ভেবেছিলাম চট্ করে জেনে নেব কি দরকার, তা দেখলাম আর হল না। এদের বসতে দিতে হবে, জল খাওয়াতে হবে। কিন্তু কোথায় বসাব?

আমার দুখানি মাত্র ঘর। একখানা শোবার। যেটি বসার ঘর সে ঘরেই ছেলেরা খেতে বসেছে। শোবার ঘরের মেঝেতে আমাদের তিনজনের বিছানা পাতা। চেয়ারগুলো সব এক পাশে সরানো। সেই শোবার ঘরে এনেই এদের বসালাম। বাড়িতে গিন্নী না থাকার এই দেখুন কেমন সুবিধে। শোবার ঘরে যাকে-তাকে যখন ইচ্ছে তখন কেমন নিঃসঙ্কোচে নিয়ে আসা যায়।

এক গেলাস জল খেয়ে যুবকটি ঐ ছেলেটিকে দেখিয়ে বললে—এর মা আপনার কাছে পাঠালেন, এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

এতক্ষণে ছেলেটিকে ভাল করে দেখলাম। আরে এ যে আমাদের মুকুন্দর ছেলে। ওর বাবার সঙ্গে এককালে খুব বন্ধুত্ব ছিল। একই মেসে থাকতাম। বি এস-সি পাশ করে একটা ওষুধের কারখানায় কেমিস্টের কাজ করত। পরে বিয়ে করে বাসা করেছে। তিন চার বছর আগেও ওদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। আমাদের চিকিৎসায় ওর বিশ্বাস ছিল না, কাটা-ছেঁড়া, ফোঁড়াফুড়ি ও পছন্দ করত না। তাই ওদের বাড়ির চিকিৎসায় আমাদের কখনও ডাক পড়েনি। কিন্তু আজ এ কি হল? জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ছেলেটি বললে—আমার বোনটির খুব জ্বর, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কত জ্বর? কখন অজ্ঞান হল?

ছেলেটি বললে—১০৫ ডিগ্রী। সকাল থেকেই জ্ঞান নেই।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি? সকালবেলা অজ্ঞান হল আর এখন এসেছ নিয়ে যেতে?

ছেলেটি শুধু বললে—মা বলেছেন।

সঙ্গের যুবকটি ওকালতি করে বললে—মায়ের প্রাণ বুঝতেই তো

পাচ্ছেন। চলুন একবার দয়া করে।

ওকালতি শুনে পিত্তি জ্বলে গেল। বলে ফেললাম—সকাল বেলা জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে যে মা রাত বারোটায় ডাক্তার ডাকতে পাঠায় তার প্রাণ সামান্য নয়। পাথরের চেয়েও কঠিন।

যুবকটি বললে—আপনি ভুল বুঝেছেন, ডাক্তার তো দেখানে হয়েছে।

একটু শ্লেষের সঙ্গেই বললাম—কোন্ ডাক্তার? হাতুড়ে?

যুবকটি বললে, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মেয়ের হঠাৎ পেটে ব্যথা হয়, মা জোয়ানের জল খাইয়ে দেন। তারপর খুব কেঁপে জ্বর আসে। কর্তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয়। কর্তা ডাক্তার না এনে অষুধ নিয়ে আসেন। সেই ওষুধ এক দাগ খাবার'পরই মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন ছুটে সেই ওষুধের দোকানে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল না। কম্পাউণ্ডার বললে, ফিরতে দেরি হবে। তাই তাড়াতাড়ি মোড়ের মাথায় ডিস্‌পেন্‌সারিতে যে ডাক্তার বসেন তাঁকে নিয়ে আসা হল। তিনি বললেন, তড়কা। মাথায় বরফ আর নাকে স্মেলিং সল্ট দেওয়া হল। তবু জ্ঞান ফিরল না দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, রোগটা ভাল মনে হচ্ছে না, আপনারা বড় ডাক্তার ডাকুন।

তখন পাড়ার যিনি প্রবীণ এলোপ্যাথ তাঁকে ডাকা হল। তিনি দেখে বললেন, এক্ষুণি রক্ত পরীক্ষা করা দরকার, ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া দরকার। জানেন তো ইন্‌জেক্‌শন দিতে এঁদের কত ভয়, কত আপত্তি! রক্ত-পরীক্ষার ফল বিকেলে জানা গেল। তাই দেখে ডাক্তারবাবু বল্লেন, মেন্‌ইন্‌জাইটিস্ হয়েছে, এক্ষুণি পেনিসিলিন দিতে হবে। অনেক সলাপরামর্শের পর রাত আটটায় ডাক্তারবাবু পেনিসিলিন চার লাখ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন কাল সকালে খবর দিতে।

বললাম—তাহলে তো চিকিৎসা ঠিকই হয়েছে। এত রাত্রে গিয়ে আমি আর নতুন কি করব?

যুবকটি বললে—তবু আপনি একবার চলুন। মেয়ের মা বড্ড বেশী ঘাবড়ে গেছেন। রাত দশটার পর গলা দিয়ে কি রকম একটা ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ হচ্ছে দেখে আবার ডাক্তারবাবুকে আনতে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তিনি এলেন না। বাড়ির লোকে বললে, রাত দশটার পর তিনি এক ঘণ্টা প্রাণায়াম করেন, পুজোতে বসেন, বাড়ি থেকে বেরোন না। আপনারা হয় অন্য ডাক্তার ডাকুন, নয় হাসপাতালে নিয়ে যান। এত রাত্রে অচেনা কোনো ডাক্তারই আসতে চায় না। তাই আপনার কাছে পাঠালেন।

এইবারে বুঝলাম কেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য এত ঝুলোঝুলি! পয়সা খরচা করেও যখন ডাক্তার পাওয়া গেল না তখনই আমার কথা মনে পড়ল! নইলে বিনা পয়সায় এমন বেগাড় আর কে খাটবে? ভাবলাম এ বেশ হয়েছে। যেমন আমাদের দেশের রুগী তেমনি তাদের চিকিৎসক! বিজ্ঞানী কোনো গৃহচিকিৎসক এদের থাকলে এ রকমটি কি কখনও হয়? সকালে রুগী অজ্ঞান হয়ে গেছে বিকেলে মেন্‌ইন্‌জাইটিস্‌ বলে ধরা হয়েছে, আর রাত আটটায় একটা প্রকেন পেনিসিলিন পড়েছে। এ শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব!

বললাম—তা আপনারা রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? এ রকম কঠিন রোগ, বাড়িতে সব ব্যবস্থা করা কি সোজা কথা?

যুবকটি বললে—আপনি একটু কষ্ট করে গিয়ে যদি ওদের তাই বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। এর মা আপনার পথ চেয়ে আছেন।

ছেলেটি আবার বললে—মা আপনাকে সংগে নিয়ে যেতে বলেছেন।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম—যান, তাহলে একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে আসুন। বলবেন যাব আর আসব।

যুবকটি উঠে গাড়ি আনতে গেল। আমি লুঙ্গি ছেড়ে প্যাণ্ট শার্ট পরে নিলাম। ছেলেদের ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। একজন বললে—তুমি খাবে না?

বললাম—ট্যাক্‌সি করে যাব আর আসব। এসে খাব। সিঁড়ির দরজায় খিল না দিয়ে তোরা শুয়ে পড়।

ট্যাক্‌সি নিয়ে এল। না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। মনে পড়ল ডাক্তারী পাশ করেই একজন জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম হাত দেখাতে, ভাগ্য গণনা করতে। তিনি হাত না দেখেই আমার ভাগ্য বলে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—বাবাজীর কি করা হয়?

সবিনয়ে নিবেদন করলাম—এই সবে ডাক্তারী পাশ করেছি।

শুনে জ্যোতিষী বললেন—কি সর্বনাশ! তুমি যে বাবা খেতে পাবে না!

আঁতকে উঠে বললাম—বলেন কি? কেন?

জ্যোতিষী বললেন—ডাক্তারী পাশ করেছ কিন্তু যদি প্র্যাক্‌টিস্‌ না হয় তাহলে পয়সা পাবে না তাই খেতে পাবে না। আর যদি প্র্যাক্‌টিস্‌ হয় তাহলে দিন রাত রুগীরা তোমায় জ্বালিয়ে খাবে, তুমি নাইতে খেতে সময় পাবে না।

সেদিন একথা শুনে খুব হেসেছিলাম। আজও ট্যাক্সিতে বসে একথা মনে পড়ে হাসি এল। আজকে এই রুগীর জন্য খেতে পেলাম না সত্যি, কিন্তু পয়সাও তো পাব না! আমার ভাগ্যে তাহলে রুগীও হল তবু পয়সা হল না। নিজের হাতে রাঁধা ভাতও অভুক্ত পড়ে রইল!

পনের মিনিটের মধ্যেই মুকুন্দর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। যুবকটি ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দেবার মতলবে ছিল, আমি বারণ করলাম। বললাম—ট্যাক্সি থাকুক, এক্ষুণি তো ফিরে যাচ্ছি এত রাত্রে আবার কোথায় ট্যাক্সি খুঁজতে যাবেন?

দোতলার দুখানা ঘর নিয়ে মুকুন্দর ফ্ল্যাট্। সিঁড়ির দরজা খোলাই ছিল। ঢুকতেই কে যেন রুগীর ঘরে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি একখানা তক্তাপোশের ওপর বিছানা পাতা, তার ওপর ৮।১০ বছরের একটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। নিশ্বাসের কষ্টে গলা দিয়ে ঘড়্ঘড়্ শব্দ হচ্ছে। শিয়রের কাছে রুগীর মাথায় আইসব্যাগ ধরে মুকুন্দর স্ত্রী মালতী বসে। আর একজন মহিলা মাথায় পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছেন। আর একজন রুগীর হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মনে হল প্রতিবেশিনী।

আমি যেতেই মালতী বললে—এই দেখুন মেয়ের কি অবস্থা করেছে। আমাকে বলে কিনা তড়্কা। মেয়ের যে এদিকে হুঁশ নেই, এক ফোঁটাও জল খাচ্ছে না তাও কেউ বুঝবে না। আমি সেই দুপুর থেকে বলছি আপনাকে একবার খবর দিতে; তা বলে কি, ডাক্তার তো দেখছে, অত ব্যস্ত হবার কি আছে? আচ্ছা বলুন দেখি ব্যস্ত হবার কিছু নেই? এই নাকি এর চিকিৎসা?

রুগীর চেহারা দেখেই আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। মালতীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে রুগীর চোখের পাতা টেনে দেখলাম চোখ জবা ফুলের মত লাল। টর্চের আলো ফেলে চোখের তারা দেখলাম। মাথা তুলে দেখলাম ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে, মাথা এপাশ ওপাশ ফেরানো যায় না। বুক পরীক্ষা করে ঘড়্ঘড়্ আওয়াজ শুনতে পেলাম। পেট ফাঁপা। কিসের যেন প্রলেপ লাগানো রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কি?

মালতী বললে—গঙ্গা মৃত্তিকার প্রলেপ।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে লাগালো?

মালতী বললে—আটটার সময় ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে এসে ডাক্তারবাবু বলে গেছেন গঙ্গামৃত্তিকার প্রলেপ লাগালে পেটফাঁপা কমে যাবে।

রুগী দেখা শেষ করে উঠে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে মালতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন অজ্ঞান হল?

মালতী বললে—সেই সকাল থেকেই।

তারপর আমি যা শুনেছি সব আবার বলে জিজ্ঞাসা করল—কেমন দেখলেন? বাঁচবে তো?

বললাম—মেনইন্‌জাইটিস্‌ রোগটা তো খুব কঠিন। আগে বেশীর ভাগই বাঁচতো না। আজকাল এই সালফা ড্রাগ আর পেনিসিলিন বেরুবার পরে অনেকেই তো ভালো হচ্ছে। এখনও আশা ছাড়বার মত কিছু দেখছি না। তবে অনেক কাজ বাকী। অক্সিজেন দেওয়া চাই এক্ষুণি। আর অনেক ইন্‌জেক্‌শন। এত ফোঁড়াফুড়ি কি বাড়িতে করা যাবে? তার চেয়ে হাসপাতালে দিন না? আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মালতী বললে—না না, হাসপাতালে আমি দিতে পারব না। যদি যায় আমার কোল থেকেই যাক। ফোঁড়াফুড়ির জন্য আপনি ভাববেন না, যা দরকার সব করুন।

বললাম—কিন্তু মুকুন্দ? সে এই চিকিৎসা সইতে পারবে কি?

মালতী বললে—ওর কথা আর বললেন না। কোন জিনিসটা ও বোঝে? মেয়ের যে এখন-তখন অবস্থা তাই ও বোঝে কি? আমাকে বলে কিনা জ্বর হলে এমন তড়্‌কা অনেকেরই হয়। না না, ওর কথা আপনি মোটেই গায় মাখবেন না। আমি বলছি সব ব্যবস্থা আপনি বাড়িতেই করুন।

এই বাড়িতে চিকিৎসার দায়িত্ব কে নেবে? ভেবে এসেছিলাম, যা চলছে তাই চলুক বলে কেটে পড়ব। অথবা বলে দেব, হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু মালতী দেখছি আমার ঘাড়েই এ দায়িত্ব চাপাতে চায়। খুশী হয়েই ভার নিতাম যদি এ'দের আমার ওপর আস্থা থাকত। অথবা যদি কাজের বিনিময়ে পয়সা পেতাম।

বললাম—রাত নটার মধ্যেও যদি আমাকে খবর দিতেন তাহলেও বড় ডাক্তার কাউকে দেখিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম। কিন্তু এত রাত্রে কাউকেই তো পাব না। তার চেয়ে হাসপাতালেই নিয়ে যান।

হঠাৎ মালতীর কি হল ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে মুকুন্দকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল—দেখ তোমার কীর্তি! শোন তোমার বন্ধুর কথা। সেই দুপুর থেকে বলছি এ'কে একবার খবর দাও। রাত নটার মধ্যেও যদি সে কথা শুনতে তাহলেও মেয়েটা

বাঁচত। তুমিই ওকে মারলে।

আমাকে দেখিয়ে বললে—আপনি সাক্ষী রইলেন।

দেখুন, কিসের থেকে কি হয়ে গেল। মুকুন্দ আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললে—ভাই, কিছুই কি করার নেই? আমার ঐ একটি মাত্র মেয়ে!

বললাম—থাকবে না কেন? অনেক কিছুই তো করার আছে এবং করা দরকারও। কিন্তু বাড়িতে অত সব করা যাবে কি?

মুকুন্দ ব্যাকুল হয়ে বললে—কেন যাবে না?

বললাম—ইন্‌জেক্‌শন, অক্সিজেন এসব না হয় হবে কিন্তু ধর যদি লাম্‌বার পাংচার করা দরকার হয়? তোমার আপত্তি হবে না?

মুকুন্দ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—ওটা কি? আমার আপত্তি হবে? কেন?

বললাম—রুগীর কোমরের কাছের শিরদাঁড়া ছেঁদা করে জল বার করে দেওয়া তুমি সইতে পারবে? এবং দরকার হলে তার মধ্যে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন করা?

মুকুন্দ অনায়াসে বললে—মেয়ে তো এমনিতেই মরে যাচ্ছে। বাঁচবার জন্য যা দরকার সব তুমি করবে। আমি তাতে আপত্তি কেন করব? তোমাদের চিকিৎসায় যতক্ষণ আপত্তি ছিল কখনও তোমাকে ডাকিনি। আজ যখন ডেকেছি তুমি যা ভাল বুঝবে তাই আমরা মেনে নেব। সবই সইতে হবে।

মুকুন্দর মুখ থেকে এমন কথা শুনব কখনও ভাবিনি। অবাক হয়ে গেলাম। এরপর দায়িত্ব এড়াবার আর কোনো পথ রইল না। দেখুন কেমন ফেসে গেলাম। চিকিৎসার ভার কি করে নিজের ঘাড়ে এসে পড়ল। বললাম—এক্ষুণি তাহলে আর একজন বড় ডাক্তার কাউকে এনে দেখাতে হয়, অক্সিজেন গ্লুকোজ পেনিসিলিন এই সব আনতে হয়। টাকা আছে ঘরে?

মুকুন্দ ব্যাগ খুলে দেখে বললে—এখন মাত্র পঞ্চাশটি টাকা আছে; তোমার কাছে দিচ্ছি। কাল সকালে আরও যা লাগবে যোগাড় করে দেব। কত লাগবে? বললাম—যা আছে তাই তো এখন দাও। বাকী পরে দেখা যাবে।

পঞ্চাশটি টাকা পকেটে নিয়ে মালতীকে বললাম—আপনি কিছু ভাববেন না। রুগীর এই অবস্থায় যা কিছু করা সম্ভব সব আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, আমি ট্যাক্‌সি

নিয়ে গিয়ে দেখি কোন বড় ডাক্তারকে আনতে পারি। রাস্তার দোকান থেকে অক্সিজেনও পাঠিয়ে দেব।

মালতীর চোখে মুখে আশার আলো দেখা দিল। বললে—আর আমার কোনো ভাবনা নেই। যা দরকার সব আপনি করুন।

মনে হল জলে ডোববার সময় এমনি করেই বুঝি লোকে আঁকড়ে ধরে, হাতের কাছে যা পায় তাই।

সেই যুবকটিকে সঙ্গে করে ট্যাক্সি নিয়ে বেরুলাম। এত রাত্রে অক্সিজেন যোগাড় করাও মহা হাঙ্গামা। দু-তিন দোকান ঘুরে অবশেষে এক চেনা দোকান থেকে সংগ্রহ করে যুবকটিকে দিয়ে রিক্শা করে পাঠিয়ে বড় ডাক্তারের খোঁজে বেরুলাম। রাত্রি প্রায় একটা। এখন কাউকে পাব কি?

কাছেই এক মেডিসিনের অধ্যাপকের বাসা। সোজা সেখানে গিয়ে কড়া নাড়লাম। প্রবীণ চিকিৎসক। একসঙ্গে কাজও করেছি। তাঁর চাকর বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে বললে—এত রাত্রে ডাক্তার সায়েবের ঘুম ভাঙ্গানো চলবে না, শরীর অসুস্থ। সকালবেলা আটটার সময় এলে দেখা হতে পারে। বলেই দরজা বন্ধ করে দিলে।

মহা মুশকিলে পড়লাম। এখন কার কাছে যাই? মুকুন্দ অথবা মালতী যত ভরসাই আমার ওপর দেখাক, পেনিসিলিন কি গ্লুকোজ যাই কেন না ইন্‌জেক্‌শন দেই, মেয়ের যদি মৃত্যু হয়, বলবে আমিই ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে মেরে ফেলেছি। অথচ একজন নাম করা ডাক্তার যদি কোনও রকমে একবার দেখিয়ে রাখতে পারি, যত ভুলই আমার হোক, কেউ সে কথা বলবে না। একবার শুধু ঐ বুড়ি ছুঁয়ে রাখা চাই। এই হল কলকাতার চিকিৎসা।

মনে হল বিপদ এখন মালতীর নয়, মুকুন্দর নয় এমন কি মেনইন্‌-জাইটিসে অজ্ঞান ঐ মেয়েটিরও নয়। বিপদ শুধু আমার। যেমন করেই হোক বুড়ি একটি ছুঁয়ে রাখতে হবে। কিন্তু ঐ বুড়ি পাই কোথা?

ভেবে দেখলাম প্রফেসর ক্লাসের কাউকে এখন পাওয়া যাবে না। তার নীচে নামতে হবে। তাহলে আমার যে বন্ধুটি এই দশ বৎসর ধরে আমার বাড়িতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছেন তাঁকেই এনে দেখাই না কেন? এঁর কথা মনে পড়তেই প্রাণে যেন জোর এল। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম তাঁর বাড়ি।

বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে গলির ভিতর ঢুকে তাঁর একতলার সিঁড়ির

দরজার কলিং-বেল টিপলাম। ঘুম থেকে চমকে উঠে দোতলার আলো জেবলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বন্ধু বললেন—কে? কি চাই?

নীচে থেকে বললাম—আমি। আপনাকেই চাই।

আমার গলা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে বন্ধু বললেন—কেন? ব্যাপার কি? ভাবলেন বুঝি আমার বাড়িতেই কিছু হয়েছে।

ব্যাপার সব খুলে বলে মিনতি করে বললাম—চলুন একবার।

আমার বাড়ির কিছু নয় জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বন্ধু বললেন—ওঃ এইজন্য? এজন্য আর আমাকে যেতে হবে না। আপনি একটা ১০% ড্যাগেনান সোডিয়াম কি সালফাডায়াজিন যা পান পাঁচ সি সি ইন্‌জেক্‌শন করে দিয়ে আসুন। আর পেনিসিলিন, গ্লুকোজ, অক্সিজেন যেমন দিতে চাইছেন দিন। তারপর কাল সকালে দেখা যাবে।

বললাম—সে হয় না। আজ রাতের মধ্যেই যেমন করেই হোক একটি বুড়ি অন্তত ছুঁয়ে রাখতে হবে নইলে মান থাকবে না। আপনি পোশাকটি পরে চট্‌ করে নেবে আসুন। ট্যাক্‌সি রয়েছে, যাবেন আর আসবেন। আধ ঘণ্টার বেশী লাগবে না। আপনাকে একবার দেখিয়ে না আনতে পারলে আমার বিপদ কাটবে না। বিনা পয়সার এ দায়িত্ব পয়সা দিয়ে আপনার ঘাড়ে চালান করতে চাই।

বন্ধু দেখলেন আমি নাছোড়বান্দা। কিছুতেই ছাড়বো না। তবু বললেন—কেন মিছিমিছি আর আমাকে ভোগাবেন! এইটুকুন তো কাজ, নিজেই করে আসুন।

বললাম—সে হয় না। আমার প্রাণ বাঁচাতে হলে আপনাকে যেতেই হয়। অগত্যা রাজী হয়ে বললেন—আচ্ছা যাচ্ছি। আপনার যত অসময়ে উৎপাত। কেবল ঘুমটা এসেছিল।

বললাম—আপনাকে আমি তো শুধু ঘুম থেকে উঠিয়েছি, আর এরা যে আমার খাওয়া বন্ধ করে টেনে এনেছে!

বন্ধুটিকে তুলে নিয়ে একটা দোকান থেকে অষুধ কিনে মুকুন্দর ফ্ল্যাটে উঠলাম। রুগীর ঘরে গিয়ে দেখি অক্সিজেন যেমন পাঠিয়েছিলাম তেমনি পড়ে আছে, কেউ তা রুগীর নাকে লাগাতে পারে নি। বি এস্‌-সি পাশ মুকুন্দও না।

আমার বন্ধুটি রুগী দেখতে লাগলেন, আমি অক্সিজেন চালু করে দিলাম। রুগী পরীক্ষা করে বন্ধুটি বললেন—রাত আটটায় একটা চার

লাখ প্রকেন পেনিসিলিন মাত্র পড়েছে, আপনি পাঁচলাখ আর একটা দিন। তা ছাড়া ছ ঘণ্টা অন্তর একটা করে পাঁচ সি সি সালফাডায়াজিন ইন্‌জেক্‌শন চলুক। সকাল থেকে ইউরিন হয়নি; একশ সি সি গ্লুকোজ ইণ্ট্রাভেনাস দিয়ে রাখুন। তারপর লাম্‌বার পাংচারের কথা কাল সকালে ভাবা যাবে।

বললাম—ট্যাক্‌সি আপনাকে পেণছে দিয়ে ফিরে আসুক। আমি এসব ইন্‌জেক্‌শন শেষ করে তারপর যাব।

বন্ধুটি উঠতেই মালতী উঠে বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি রকম দেখলেন বলে যান।

বন্ধুটি একটু ইতস্তত করে বললেন—এখন তো কিছু বলা যাচ্ছে না। সবই নির্ভর করে অষুধে কি রকম কাজ হয় তার ওপর। বারো ঘণ্টার আগে কিছু বলা যাবে না। মনে হচ্ছে সকালের আগে আর কোনো বিপদ হবে না।

বন্ধুটি চলে গেলে মালতী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—এই ডাক্তারটি কে?

বললাম—ইনি আমার বিশেষ বন্ধু। ডাক্তারী বিদ্যা বলতে গেলে এ'র কাজেই আমার শেখা। আমার বাড়িতে অসুখ হলে এ'কেই আমি ডাকি। আমার নিজের অসুখে এ'র চেয়ে বড় ডাক্তার কখনও দেখাই না।

মালতী তবু ভরসা পেল না। বললে—এ'র নাম তো কই আগে কখনও শুনিনি?

বললাম—আপনারা যাঁদের নাম শোনেন তাঁদের এত রাত্রে পাওয়া যায় না। যদি পারেন আনতে, দেখুন না একবার চেষ্টা করে? আমি তো একজনের বাড়িতে গিয়ে এক্ষুণি ফিরে এলাম। চাকর দেখাই করতে দিলে না।

শুনে মালতী বললে—সবই আমার অদৃষ্ট! আপনিও যখন পারলেন না, তখন আমরা আর কি করে পারব? কালকে সকালে কাউকে পাওয়া যাবে?

বললাম—তা হয়ত যাবে। আগে সকাল হোক তখন দেখা যাবে। আপাতত এই ইন্‌জেক্‌শনগুলো এক্ষুণি দিতে হবে।

মালতীর কথায় আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে উঠে সিরিঞ্জ রেডী করতে লেগে গেলাম। তিনটি সিরিঞ্জ স্টেরিলাইজ্‌ করা হল। পেনিসিলিনের জন্য দু সি সি; সালফাডায়াজিনের জন্য পাঁচ সি সি

আর গ্লুকোজের জন্য পঞ্চাশ সি সি।

ভেবেছিলাম এইসব আয়োজন দেখে মালতী বুঝি খুব ভড়কে যাবে। কিন্তু দেখলাম মালতী বেশ শক্ত। ফোঁড়াফুঁড়ি দেখে একটুও ঘাবড়ালো না। এমন কি গ্লুকোজ দেওয়ার সময় সাহায্যও বেশ করল। পঞ্চাশ সি সি গ্লুকোজ দেবার পর উপশিরার ভেতর নিড্‌ল্‌-এর মুখ যখন আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে বললাম, মালতী অনায়াসে তা চেপে ধরল। আমি সিরিঞ্জ বার করে নিয়ে আবার পঞ্চাশ সি সি গ্লুকোজ ভরে নিতে নিতে বললাম, দেখবেন আঙুলের চাপ আলগা করবেন না, তাহলে কিন্তু নিড্‌লের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুবে। মালতী ঠিক ধরে রইল। সিরিঞ্জ ভরে আবার নিড্‌লের মুখে পুরে দিলাম, এক ফোঁটা রক্তও বাইরে পড়ল না। মালতী আঙুল উঠিয়ে নিল।

কাজ শেষ করে বললাম—ইন্‌জেক্‌শন যা দেবার সব দিয়ে গেলাম। ছ ঘণ্টার মধ্যে আর কিছু আমাদের করবার নেই। অক্সিজেনটা ঠিকমত চলছে কিনা নলটা জলে ডুবিয়ে পরীক্ষা করে নেবেন আধঘণ্টা পর পর। কাল সকালেই একটা খবর দেবেন।

মালতী বললে—সে কী? আপনি কোথায় চললেন? আপনাকে ছাড়া চলবে না। এইখানেই থাকতে হবে।

বললাম—মিছেমিছি থেকে কি হবে? ছ ঘণ্টার মধ্যে আমার তো আর কিছুই করবার নেই। যতক্ষণ দরকার ছিল, আমি অমনিতেই থেকেছি। এত রাত্রে না খেয়েই চলে এসেছি। এখন তো আর কাজ নেই, এইবারে আমি আসি।

উদ্বিগ্ন হয়ে মালতী বললে—এখনও আপনার খাওয়া হয় নি? তাহলে তো আরও যাওয়া চলবে না। দাঁড়ান আমি এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললাম—আমার জন্য মিথ্যে অত উতলা হবেন না, রুগীর পাশেই বসুন। এইখানেই আপনার এখন কাজ। তা ছাড়া বাড়ি আমাকে যেতেই হবে, ছেলে দুটি একলা রয়েছে। বড়টি যদি না ঘুমিয়ে থাকে হয়ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। একা থাকতে ওর খুব ভয়।

তবু মালতী ছাড়বে না। বললে—তাহলে ট্যাক্‌সি করে ওকে এখানে আনিয়ে নিচ্ছি কিংবা আমার ছেলেকে পাঠাচ্ছি ওখানে গিয়ে শোবে।

দেখলাম আমার সুবিধে অসুবিধে কিছুই মালতী বুঝবে না। ওর নিজের প্রয়োজনের কথাই ও শুধু ভাবছে। তখন বললাম—কালকে

আপনার মেয়ের জন্য অনেক কাজ বাকী রইল। আজ যদি আমাকে আটকে রাখেন তাহলে কাল সকালে সে-সব কিছুই আমি পারব না। বড় ডাক্তার দেখানো যাবে না।

এইবার মালতী বুঝলো। বললে—তাহলে থাক। কিন্তু রাত্রে যদি দরকার হয় তাহলে কিন্তু ট্যাক্সি পাঠাব, আবার আসতে হবে।

বললাম—তা নিশ্চয় আসব। কিন্তু আমি বলছি তার আর প্রয়োজন হবে না। ভোর বেলা কাউকে পাঠিয়ে একটা খবর দেবেন।

এই বলে নেবে এসে ট্যাক্সিতে উঠলাম। রাত তখন আড়াইটা। বাড়িতে ঢোকবার গলির মুখে এসে দেখি আমার বড় ছেলে আমার অপেক্ষায় ঠিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে নেবে এসে জিজ্ঞাসা করলাম—কি রে? তুই এখানে?

ছেলে বললে—ঘরে ঘুম আসছিল না। ভয় করছিল।

বললাম—রাস্তাতেও তো লোকজন নেই, এখানে ভয় করছিল না?

ছেলে বললে—মোড়ের বড় দোকানটার রকে এক নেপালী দারওয়ান থাকে, সারা রাত দোকান পাহারা দেয়। তার কাছেই বসেছিলাম। তোমার এত দেরি? খাবে কখন?

বাড়ি এসে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া সেরে শুতে শুতে তিনটে বেজে গেল। পরদিন ভোর হতে না হতেই দরজায় আবার খটাখট্। উঠে দরজা খুলে দেখি মুকুন্দ। জিজ্ঞাসা করলাম—কি খবর? মেয়ে কেমন? কত জ্বর?

মুকুন্দ বললে—আমি তো কিছুই ভাল দেখছি না। ঐ একই রকম। জ্বর ১০৪°।

বললাম—তা এত ভোরে এসেছ, এখনও তো বড় ডাক্তার কাউকে পাওয়া যাবে না। ৭টার সময় বেরুব। তুমি ততক্ষণ বসবে না আবার ঘুরে আসবে?

মুকুন্দ বললে—এখানেই বসি। বাড়িতে থাকতে আর ভাল লাগছে না। কেমন করে এ-রোগ আমার বাড়িতে এল বল দেখি? মেয়েটা কি বাঁচবে? এখন দেখছি তোমার কাছেই প্রথমে আসা উচিত ছিল।

বললাম—বাঁচবার চেষ্টা তো করা হচ্ছে, তারপর দেখ কি হয়।

চা খেয়ে দুজনে যখন অন্য এক প্রবীণ বড় ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন সাতটা বাজতে কিছু বাকী আছে। ইনিও একজন প্রফেসর। গিয়ে শুনলাম প্রফেসর হাওয়া খেতে বেড়িয়েছেন ময়দানে।

এক্ষুণি এসে পড়বেন।' রোজ তো এর আগেই ফিরে আসেন আজ কেন যে এত দেরি হচ্ছে? ভৃত্যটি আমাদের বসিয়ে এই কথা বলে বার বার রাস্তার দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

আধ ঘণ্টা বসে থাকবার পর তিনি মর্নিং-ওয়াক সেরে ফিরে এলেন। আমাকে দেখে বললেন—কি হে? কি খবর?

সব শুনে বললেন—আমার গাড়িটা পেতে একটু দেরি হবে, তোমার গাড়ি এনেছ?

বললাম—আজ্ঞে না; গাড়ি এখনও হয়নি। চলুন, ট্যাক্সি ডেকে আনছি।

মুকুন্দ ট্যাক্সি নিয়ে এল। আমরা তিনজনে আবার মুকুন্দর বাড়ি এলাম। প্রফেসর রুগী দেখে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—এ কি হে? তোমার রুগী তো বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। বাঁচবে কি না সন্দেহ। এদের অবস্থা কেমন?

বললাম—মধ্যবিত্ত, যত্র আয় তত্র ব্যয়। বাড়তি কিছু জমা নেই।

প্রফেসর বললেন—তাহলে হাসপাতালে দাও না কেন?

বললাম—সে চেষ্টা অনেক করেছি, এরা রাজী হয় না।

প্রফেসর বললেন—তাহলে যা চলছে তাই এখন চলুক। ইউরিন যদি হয়, ইউরিনটা আর ব্লাডটা আর একবার পরীক্ষা করিয়ে নাও। লাম্বার পাংচার করা যাবে?

বললাম—যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয় করতেই হবে। বাড়িতে ওসব করা একটু অসুবিধা তো বটেই।

প্রফেসর বললেন—তাহলে ওটা থাক। শুধু সালফাডায়াজিনটা ৬ ঘণ্টা অন্তর না দিয়ে বারো ঘণ্টা অন্তর দাও আর পেনিসিলিন চার ঘণ্টা অন্তর দু লাখ। গ্লুকোজ যেমন দিচ্ছ তেমনি চলুক দু বেলা। বিকেলে একটা খবর দিও।

মুকুন্দ উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম দেখলেন?

প্রফেসর বললেন—খুব খারাপ। আজকের দিন না কাটলে কিছু বলা যাবে না। অষুধের সব ব্যবস্থা করে দিলাম। ডাক্তারবাবু রইলেন, সব করে দেবেন।

শুনে মুকুন্দ ব্যস্ত হয়ে বললে—তাহলে বিকেলে আপনি একবার দেখে যাবেন। প্রফেসর বললেন—বেশ, আগে একটা ফোন করে খবর দেবেন।

প্রফেসর চলে গেলে মালতী বললে—বড় ডাক্তারবাবু তো নতুন ওষুধ কিছু দিলেন না? আপনারা যা করেছেন তাই তো দেখি চালিয়ে যেতে বললেন।

বললাম—এ অসুখে এ ছাড়া আর তো কিছুই করবার নেই। উনি আর নতুন কিছু বলবেন কি করে? উনি দেখে যে বলে গেলেন. চিকিৎসাটা ঠিকমতই হচ্ছে আর রোগটা ঠিক ধরা গেছে সেইটেই হল আসল কথা। সেইজন্যই ওঁকে ডাকা।

আবার সব ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বললাম—রুগীর মাথা ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে গা হাত পা সব গরমজলে মুছিয়ে দিতে হবে। পেটে গঙ্গামৃত্তিকার ঐ প্রলেপ ধুয়ে মুছে তুলে দিতে হবে। তবু যদি ইউরিন না হয় তাহলে তলপেটে গরম সেঁক দিতে হবে। ইউরিন হলে ওটা ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে দিবেন। রক্তটা আবার পরীক্ষা করতে বলে গেছেন. সেটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আবার চার ঘণ্টা পরে এসে পেনিসিলিন দেব। বলতে বলতেই ইউরিন হল, বিছানার চাদর খানিকটা ভিজে গেল, পাত্রে ওটা ধরা গেল না। দেখলাম চাদরে গাঢ় হলদে দাগ। তবু এইটুকুও যে হল তা দেখে সালফাডায়াজিন আর একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে এলাম। প্রফেসরের কথা না শুনে বন্ধুর কথা রাখলাম।

বাড়ি ফিরবার পথে সেই ডাক্তার-বন্ধুটির বাড়ি হয়ে এলাম। বললাম—আজ সত্যি সত্যি বুড়ী ছুঁয়ে এসেছি। সকালবেলা প্রফেসরকে ধরে এনে দেখিয়েছি। বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করলেন—কি বললেন প্রফেসর?

বললাম—সালফাডায়াজিন বারো ঘণ্টা পর পর, আর দু লাখ পেনিসিলিন চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর দিতে বলেছেন। রাতে ঐ সালফা-ডায়াজিন আর পেনিসিলিন গ্লুকোজ দেওয়াটা খুব ভাল হয়েছে বললেন।

বন্ধুটি বললেন—আমাকে যদি সালফা আর পেনিসিলিনের মধ্যে যে কোনো একটা ওষুধ দিয়ে মেন্‌ইন্‌জাইটিসের চিকিৎসা করতে হত তাহলে আমি সালফাটাই বেছে নিতাম। রুগীকে যদি বাঁচাতে চান, যান, এক্ষুণি গিয়ে সালফাডায়াজিন ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আসুন।

বললাম—ইউরিন হল দেখে সালফা ইন্‌জেক্‌শন অলরেডি করে এসেছি।

শুনে বন্ধু খুশী হয়ে বললেন—রুগী যদি বাঁচে, জানবেন এই সালফার জন্যই বেঁচেছে। লাম্‌বার পাংচার করে পেনিসিলিন দিতে পারলে আলাদা কথা। কিন্তু বাড়িতে ওসব হয় না। রুগী দেখে কি

রকম মনে হল? কালকের চেয়ে খারাপ?

বললাম—না, ঐ একই রকম। তবে বুকটা অনেক ক্লিয়ার মনে হল। আর ইউরিনও হল একটু।

বন্ধুটি বললেন—ঠিক আছে। আপনি সালফা, পেনিসিলিন, গ্লুকোজ চালিয়ে যান।

চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর যাই, রুগী পরীক্ষা করি, ইন্‌জেক্‌শন দেই। জ্বর সেই ১০৪° থেকে ১০৫°। চক্ষু লাল, ঘাড় শক্ত, কিছু খাওয়ানো যায় না। এক চামচ জলও না। মুখে দিলে গড়িয়ে আসে। সন্ধ্যে-বেলা প্রফেসর এসে দেখে বললেন—রাতটা কাটবে কি না সন্দেহ।

শুনে মুকুন্দ যেন ভেঙে পড়ল। আমার দু-হাত ধরে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে—তাহলে কি হবে? কলকাতার সবচেয়ে যিনি বড় ডাক্তার তাঁকে এনে একবার দেখানো যায় না? যত টাকা লাগুক তুমি একবার আনো। বল কত টাকা চাই।

বললাম—আর বড় ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। রুগী যদি বাঁচে এই চিকিৎসাতেই বাঁচবে।

তবু ওর ভরসা হল না দেখে মালতীকে বললাম—আপনিও কি চান আরও বড় ডাক্তার কাউকে দেখাতে?

মালতী বললে—বড় ডাক্তার দেখিয়ে আর বেশী কি হবে? আপনিই তো বলছেন, আর ভয় নেই।

বললাম—ভয় নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কালকের চেয়ে অনেক কম।

মালতী বলল—তাহলেই হল। একদিনেই সেরে যাবে নাকি? ওর যেমন কথা।

রাত বারোটায় শেষ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বললাম—আজকের দিনটা তো কাটল। কাল দেখবেন জ্বর নিশ্চয় আরো কমে যাবে।

আশা পেয়ে খুশী হয়ে মালতী বললে—তাই বলুন, সত্যি যেন কমে যায়।

সারাদিন আমার খাটুনী দেখে রাত্তিরে থাকবার জন্য আজ আর মালতী কোনো পীড়াপীড়ি করল না। শুধু বললে—রাত্তিতে কোনো বিপদ হবে না তো?

বললাম—মনে তো হয় না। যদি বলেন, রাতে থাকবার জন্য একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করি। মালতী ব্যস্ত হয়ে বললে—না না, আর অন্য ডাক্তারের দরকার নেই। খারাপ মনে হলে আপনার কাছেই ট্যাক্‌সি

দিয়ে লোক পাঠাব।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার মুকুন্দ এল। বিরস মলিন মুখ। জিজ্ঞাসা করলাম—কত জ্বর? কেমন আছে?

মুকুন্দ বললে—জ্বর ১০৩°, জ্ঞান হয়নি। একটুও ভাল দেখছি না। পেচ্ছাব হয়েছে খানিকটা।

বললাম—তাহলে তো ভালই আছে। এত ভাবছ কেন?

মুকুন্দ বললে—মনে হচ্ছে এত করেও মেয়েটা বুঝি বাঁচবে না। তোমরা বলছিলে লাম্বার পাংচার করবে। কই করলে না তো? বলবে একবার প্রফেসরকে?

দেখুন কার মুখে কি কথা! বললাম—বেশ তো তুমিই বোলো। এখন চল, দেখে আসি কেমন আছে তোমার মেয়ে।

গিয়ে দেখলাম, সত্যি অনেকটা ভাল। পেট ফাঁপা কমে গেছে, বুকের সেই ঘড়ঘড় আওয়াজ নেই। চোখের লাল ঘোলাটে ভাবটাও অনেক কম। ইন্জেক্শন দিয়ে বললাম—আজ তো অনেক ভাল দেখছি। ওষুধ ধরেছে মনে হচ্ছে।

প্রফেসর এসে দেখে বললেন—রাতটা যে কেটেছে এইটেই খুব ভাল লক্ষণ। এইভাবে যদি লড়তে পারে তাহলে আশা আছে। এসব কেস্ একটুও বিশ্বাস নেই। যে কোনো মুহূর্তে খারাপ হয়ে যেতে পারে।

মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করলে—লাম্বার পাংচার করলে বাঁচবে?

প্রফেসর বললেন—তা কি কখনও বলা যায়? খারাপও হতে পারে। ওটা এখন থাক।

প্রফেসর চলে গেলে মালতী বললে—এই বুড়ো ডাক্তারকে মিছিমিছি কেন বার বার ডাকা? নতুন অষুধ তো দেখি একটাও দেয় না। শুধু শুধু ভয় দেখায়। কেবল টাকা নষ্ট!

সেইদিন সন্ধ্যায় জ্বর কমে ১০১° হল। বরফ দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। চামচে করে একটু একটু করে জল মুখে দেওয়া হত জিভটা ভিজিয়ে রাখবার জন্য। রাত্রে দেখা গেল ঢোক গিলে রুগী সে জল খায়। তাই দেখে গ্লুকোজের জল একটু একটু করে দিতে বলে এলাম। ইন্জেক্শন সেই আগের মতই চলতে লাগল।

পরের দিন গিয়ে দেখি চোখের লাল কেটে গেছে, ঘাড়টাও বেশ নরম হয়েছে, জ্বর কমে ১০০° হয়েছে। গ্লুকোজ, হরলিক্স্ ফিডিং-কাপে করে বেশ খাওয়ানো গেল। গ্লিসারিন দিয়ে পাইখানা করানো গেল,

সারাদিনে অনেকটা ইউরিন হল। রুগী কিন্তু সেই অজ্ঞান। অক্সিজেন বন্ধ করে দিয়ে মালতীকে বললাম—দেখবেন কাল জ্বর ঠিক ছেড়ে যাবে। মেয়ে কথা কইবে।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মালতী বললে—সত্যি?

পরদিন জ্বর ৯৯° পর্যন্ত উঠে সন্ধ্যার দিকে ছেড়ে গেল। পাঁচদিন অজ্ঞান থেকে মেয়েটি এই প্রথম চোখ মেলে চাইল।

মালতী খুশীতে বিভোর হয়ে মেয়ের চোখে মুখে চুমু খেয়ে আদর করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

জিজ্ঞাসা করলাম—এইবারে বল দেখি খুকু কি খেতে ইচ্ছে করে?

মেয়েটি একবার মালতীর আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে দ্বিধাভরে বললে—সন্দেশ।

তক্ষুণি বাজার থেকে দুটো ভাল সন্দেশ নিয়ে আসতে বললাম। মালতী ভাবলে, বুঝি ঠাট্টা! সন্দেশ নিয়ে এলে একটু ভেঙে রুগীর মুখে দিতে বললাম। চক্ষু ছানাবড়া করে ম্যাজিক দেখার মত বিস্ময়ে অবাক হয়ে সবাই এই রুগীর সন্দেশ খাওয়া দেখতে লাগল।

ফেরবার পথে সেই ডাক্তার বন্ধুটির চেম্বারে গেলাম। তিনি তখন কাজ সেরে বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হয়ে রাস্তায় রাখা পুরনো অস্টিনটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে দেখেই খুশী হয়ে বললেন—এই যে! আপনার কথাই ভাবছিলাম। নিন উঠে পড়ুন। আপনাকে তাহলে পেঁাছে দিয়েই বাড়ি যাই।

গাড়িতে উঠে বসতেই বন্ধু বললেন—এইবার বলুন সেই রুগীর কি খবর।

বললাম—জ্বর ছেড়েছে, জ্ঞান হয়েছে। এই মাত্র সন্দেশ খাইয়ে আসছি।

খুব খুশী হয়ে বন্ধু বললেন—বাঃ সন্দেশ তো আমার পাওনা। সেদিন রাত্রে না গেলে কি হত?

বললাম—রুগী তো বাঁচল, কিন্তু আমি নিজেই যে এখন মারা যাচ্ছি।

ঠাট্টা মনে করেও যেন একটু বিচলিত হয়ে বন্ধু বললেন—কেন? আপনার আবার কি হল?

বললাম—হাতে একটিও পয়সা নেই। দিন দেখি দশটি টাকা।

বিস্মিত হয়ে বন্ধু বললেন—এত বড় কঠিন কেস্ করলেন, রুগীও বেঁচে উঠল তবু আপনার পয়সা নেই? ধার চাইছেন?

বললাম—সেই প্রথম রাত্রে যে পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিল তা অক্সিজেন, ইন্‌জেক্‌শন, আপনার ফী আর ট্যাক্‌সি ভাড়াতেই সব গলে গেছে। তারপর থেকে গাড়ি-ভাড়াটাই শুধু দিয়েছে। এখন ধার না করলে খাব কি?

শুনে বন্ধু ক্ষেপে গেলেন। পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার হাতে দিয়ে ঘটাং করে গিয়ার টেনে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। বললেন—দেখুন দেখি কি অন্যায়? এরা সব ভাবে কি? ডাক্তারদের কি কোনো খরচা নেই? খেতে পড়তে হয় না? শুধু একবার ডাকলেই কাজ পাওয়া যায়? পয়সা লাগে না? কিছু না খাইয়ে ফোকটেই যদি কাজ পাওয়া যায় তাহলে গাড়িতে মোবিল আর পেট্রোল ঢালবার দরকার কি? বেশ, এবার থেকে তার বদলে দুটো ডাক্তার ডেকে এনে এঞ্জিনে বসিয়ে দেব, আপনি গাড়ি চলবে, একটি পয়সাও খরচা লাগবে না।

যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই এ বাড়িটা ভাড়া পেয়ে গেলাম। এতদিন কলকাতায় আছি, শহরের এদিকটায় আসা বড় একটা ঘটত না। এ পাড়ায় চেনা-শোনাও বিশেষ কেউ ছিল না। নতুন জায়গায় এসে দু-চার দিনের মধ্যেই সবাইয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা আমার স্বভাবে নেই। তাই পাঁচ ছ মাস অনায়াসে কেটে গেল; পাড়ার কারো সঙ্গে আমার ভাব জমলো না।

আমার মেয়ের স্বভাবটি আবার ঠিক উল্টো। কি একটা ছুটিতে হোস্টেল থেকে বাড়ি এসে তিন দিনের মধ্যেই এ-বাড়ি ও-বাড়ির সবাইর সঙ্গে আলাপ করে একেবারে আত্মীয়তা করে ফেললো। কেউ দিদি, কেউ মাসি, কেউ বা দাদা হয়ে গেল। সমবয়সী মেয়েরা এ বাড়ি যাতায়াত করতে লাগলো। আমি ওদের মেসোমশাই হয়ে গেলাম।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যে মেয়েটি আসত, তার নাম লিলি। এই মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লাগতো। সুন্দর ফর্সা চেহারা, পাতলা ছিপ্ছিপে গড়ন, ভাসাভাসা চোখ। লেখাপড়ায় খুব ভাল। ফার্স্ট সেকেণ্ডের নীচে কখনও নামে নি। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।

আমাদের সামনের বাড়িতেই থাকে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা উকিল, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের ছোট আদালতে প্র্যাক্টিস করেন।

লিলি বলত—জানেন মেসোমশাই! ম্যাট্রিক পাশ করে আমি আই এ পড়ব। তারপর বি এ। বি এ পাস করে চাকরি করব। আমার ভাই তো কেউ নেই, আমি কাজ না করলে বুড়ো বয়সে বাবা মাকে দেখবে কে?

ওর কচি মুখে এমনি ভারিক্কি কথা শুনতে ভারি মিষ্টি লাগতো। এই লিলি স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলো। ফার্স্ট ডিভিশনে আই এ পাশ করে বি এ ক্লাসে ভরতি হল। থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠে একদিন ২৫।২৬ বছরের একটি সুদর্শন যুবককে সঙ্গে নিয়ে এসে দুজনে মিলে আমাকে প্রণাম করলো। আমি অবাক হয়ে লিলির সিঁথির দিকে চেয়ে রইলাম। কই সিঁদুরের দাগ তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না?

আমার বিহ্বল ভাব দেখে লিলি নিজে থেকেই বললে—বিয়ে এখনও

হয় নি মেসোমশাই; পরীক্ষার পর হবে।

বললাম—বাঃ, খাসা মক্কেলটি পাকড়াও করেছ তো? ছেলে কী করে?

মুচকি হেসে ছেলেটির দিকে কটাক্ষ হেনে মিষ্টি করে লিলি বললে—কিচ্ছু করে না। বসে বসে বাপের টাকা ধ্বংস করে। একটি আস্ত ভ্যাগাবণ্ড।

বলেই সগর্বে নতুন ভ্যানিটি ব্যাগটি দেখিয়ে বললে—দেখুন না, মিছিমিছি পঁচিশটি টাকা নষ্ট করে মার্কেট থেকে বাবু এটি কিনে এনেছেন। তাও বুঝতাম যদি নিজের রোজগার হত। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, আই এ এস তো কত ছেলেই পরীক্ষা দেয়, সবাই কি আর চাকরি পায়?

বুঝলাম ছেলেটি শুধু সুদর্শনই নয়, গুণীও বটে। আই এ এস পরীক্ষা দিয়ে সিলেক্টেড হবার আশা রাখে। খুব ভালো লাগলো লিলির পছন্দ দেখে।

বললাম—কিন্তু লিলি, বি এ পাশ করে তোমার না চাকরি নেবার কথা ছিল? বুড়ো বাপ-মাকে এবার কে দেখবে?

ছেলেটির বাহুতে নিজের আঙুল দিয়ে ছোট্ট একটি খোঁচা দিয়ে সলজ্জ হেসে তক্ষুনি লিলি বললে—কেন, এই হাকিম সায়েব?

ক্ষুদে হাকিমটি অপ্রস্তুত হাসি হেসে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে একবার লিলির দিকে আর একবার আমার দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালো।

দেখলাম ছ-টা বাজতে পনের মিনিট বাকী। লিলি অমনি উঠে বললে—আজ উঠি মেসোমশাই, আর একদিন আসব।

বললাম— কোন বায়োস্কোপে যাচ্ছ?

লিলি হেসে বললে—রোড টু লাইফ।

ঘরময় খুশী ছড়িয়ে লিলি চলে গেল। কী একটা জারন্যাল পড়ছিলাম, আবার সেটা তুলে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হল প্রবন্ধটা আগাগোড়া পড়েছি, কিন্তু এক বর্ণও মগজে ঢোকে নি। বই-এর পাতায় চোখ রেখে লিলির কথাই এতক্ষণ ভেবেছি।

মাসখানেক পরে লিলি আবার একদিন এল। এবারে একা, মুখখানা কেমন শুকনো শুকনো; হাতে সেই ব্যাগ।

বললাম—কি খবর লিলি? একা যে?

মুখখানা একটু গম্ভীর করে লিলি বললে—কিচ্ছু ভালো লাগছে না, মেসোমশাই, অষুধ-টষুধ কিছু একটা দিন তো।

বললাম—তোমার ঐ ওষুধ তো একটি লোকই জানে। সে কোথায়?

শুনে লিলি হেসে ফেললো, মুখখানা যেন একটু রাঙা হল, ভাসা-ভাসা চোখ দুটি খুশীতে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলো। বললে—আপনার সব সময়েই ঠাট্টা! ওকে ইচ্ছে করেই আনিনি। শরীরটা সত্যি ভারি খারাপ হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। কেমন যেন হয়ে গলাম, শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তাই ওকে কিছু না বলে একলা আপনার কাছে এসেছি।

এইবার আমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। লিলি বলে কী? মনের উদ্বেগ আপনি মুখে ফুটে উঠলো। গম্ভীর হয়ে গেলাম। লিলি দেখে ভয় পেয়ে বললে—আমার কি হয়েছে মেসোমশাই?

বললাম—আগে তোমাকে পরীক্ষা করি, তারপর বলছি।

পরীক্ষা করে উদ্বেগ কেটে গেল। মনে হল পেটের গোলমাল থেকেই রক্তশূন্যতা হয়েছে, মাথা ঘুরছে। হেসে বললাম—কিচ্ছু ভয় নেই। রক্ত আর স্টুলটা পরীক্ষা করে নিই আগে, তারপর তোমার ওষুধের ব্যবস্থা করছি।

রক্ত এবং স্টুল পরীক্ষা করে যা ভেবেছিলাম, সেই এনিমিয়া এবং এমিবা পাওয়া গেল। ওষুধ-পথ্যের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বললাম—শিগ্‌গিরই সেরে যাবে। কিচ্ছু ভেবো না।

লিলি খুশী মনে চলে গেল। তারপর মাস দুই লিলি আর এল না। একদিন দুপুরে কাজ সেরে কেবল বাড়ি ফিরেছি, লিলিদের ছোকরা চাকরটা এসে বললে—দিদিমণির খুব অসুখ। এক্ষুনি একবার আসুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ছেলেটি বললে—কালো পাইখানা হচ্ছে।

গিয়ে দেখি, লিলি শুয়ে আছে। মুখখানা হাসি-হাসি, আগেকার সেই পাংশু ভাব মিলিয়ে গিয়ে যেন কিসের একটা উজ্জ্বলতা এসেছে। দেখেই মনে হল কোনো কঠিন অসুখ কিছু হয় নি। খুব আশ্বস্ত হলাম।

ওর মা বললেন—কালো পাইখানা দেখে আমরা ঘাবড়ে গেছি। ওর বাবারও এই রকম একবার হয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছেন গ্যাস্ট্রিক আলসার। মেয়েটারও বুঝি সেই রোগ হল। স্টুলটা রেখে দিয়েছি, দেখবেন একবার? সকালে উঠেই পেটে খুব ব্যথা। কিচ্ছু খেতে পারছে না।

দেখলাম, স্টুলটা আলকাতরার মতই কালো। ঠিক যেমন গ্যাস্ট্রিক আলসারের রক্ত ক্ষয় হলে হয়। বললাম—এটা ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে দিন।

আমি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যাচ্ছি।

শুনলাম মাসখানেক ওষুধ খাবার পর লিলি বেশ ভাল ছিল। কলেজে যাচ্ছিল, পড়াশুনাতেও মন বসেছিল। তবে ইদানীং খাওয়া-দাওয়াটা বাঁধা-ধরা নিয়মে না করে আগের মত ঝালটাল সব খাচ্ছিল। তাইতেই বোধ হয় পেটে ব্যথা হয়ে আজ এই কান্ড।

লিলিকে বললাম—একটু ভাল হয়ে উঠেই যেমন লাফালাফি করেছিলে এইবার তার শাস্তি নাও। সাতদিন বিছানা থেকে উঠতে পাবে না। এই সব ওষুধ ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিসেব করে খেতে হবে, ঝাল লঙ্কা আর জীবনে খেতে পাবে না।

লিলি বললে—এখন না হয় নাই খেলাম। ভাল হলে তো খেতে পাব?

ওর মা বললেন—ঝাল লঙ্কা না হলে মেয়ের রোচে না। কিছুই খেতে চায় না।

বললাম—এইরকম তো চলুক এখন, ভাল হলে তখন দেখা যাবে।

স্টুল পরীক্ষা করে রক্ত পাওয়া গেল। আগে যে অ্যামিবা পাওয়া গিয়েছিল, এবারে সে সব কিছুই পাওয়া গেল না। গ্যাস্ট্রিক আলসারের যা পথ্য সেই দুধ, গলা ভাত আর সেদ্ধ মাছ খাবার ব্যবস্থা দিয়ে বললাম—শিগ্‌গিরই সেরে যাবে।

মাসখানেকের মধ্যেই লিলি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বলল—আমি এখন তো বেশ সেরে গেছি, আর কতদিন দুধ-ভাত খাব?

বললাম—আরও দু মাস।

লিলি বললে—দু মাস পরে ঝাল খেতে পাবো তো?

বললাম—যদি ভাল থাক নিশ্চয়ই পাবে।

সেই থেকে লিলি প্রায়ই আসত। রোজ প্রায় এক সের করে দুধ খেত। চেহারাও বেশ ফিরে গেল। একদিন বললে—মেসোমশাই, এত দুধ আর খেতে পারছি না। এইবারে ঝাল-তরকারি খাই? একটু ডালমুট?

বললাম—আগে একবার এক্স-রে করে পেটটা দেখি। যদি সেরে গিয়ে থাকে তখন সব খেতে দেব।

লিলি বললে—ওরে বাব্বাঃ, এক্স-রেতে তো শুনেছি অনেক টাকা লাগে। না না. ওসব হাঙ্গামা করবেন না। আমি তো বেশ আছি। মিছি-মিছি অত খরচা করে কি হবে?

বললাম—তা হলে ঐ দুধ-ভাতই খেতে হবে। পারবে?

লিলির হাসি-হাসি মুখখানা নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। অভিমানে

ভাসা-ভাসা চোখ দুটি ছলছলে করে বললে—আপনি ভয়ানক নিষ্ঠুর। খালি সেদ্ধ ভাত আর দুধ খেয়ে কেউ বাঁচে?

তারপর অনেকদিন লিলি এল না। একদিন দেখলাম, কলেজ থেকে ফেরার পথে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খুব হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলতে বলতে চলেছে। বুঝলাম শরীর বেশ সুস্থ আছে। দেখতে দেখতে ওদের টেস্ট হয়ে গেল। ফাইনাল পরীক্ষার আর মাস-খানেক বাকী, এমনি সময় একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম লিলিদের বাড়ি থেকে ৪।৫ বার লোক এসে ডেকে গেছে, ওর শরীর নাকি খুব খারাপ।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, আবার লিলির কালো পাইখানা হয়েছে, ব্যথা হচ্ছে, গা গুলোচ্ছে। মুখখানা দেখেই মনে হল খুব কষ্ট হচ্ছে। রাত্রির মত মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন করে পরদিন সকালে গিয়ে দেখলাম লিলি অনেকটা সামলেছে। সারা রাত্রি ঘুমিয়েছে। তবু এখনও চোখে ঘুম যেন লেগে আছে। আমাকে দেখে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—মেসোমশাই, পরীক্ষা দিতে পারব তো?

বললাম—নিশ্চয় পারবে। এখন ভাল করে ঘুমোও। বলে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে কনুই-এর সামনে উপশিরার ভেতর গ্লুকোজ ইন্‌-জেক্‌শন করে চলে এলাম।

এবারও লিলি দিন সাতেকের মধ্যে সেরে উঠলো। ওর বাবাকে বললাম—বার বার কালো পাইখানা হচ্ছে, একটা এক্স-রে না করালে তো আর চলছে না।

ভদ্রলোক বললেন—মাস-খানেকের মধ্যেই তো ওর পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন করালে কি খুব ক্ষতি হবে? আমার দেখুন সেই একবারই ওরকম হয়েছিল, তারপর এই বছর দুই তো বেশ ভাল আছি।

বললাম—যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। শরীর যদি ভাল থাকে পরীক্ষার পরেই না হয় করাবেন।

দেখতে দেখতে লিলির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। শেষ দিন পরীক্ষা দিয়ে এসে শরীরটা কি রকম খারাপ লাগলো, রাতে কিছু খেতে চাইল না। ওর মা জোর করে একটু দুধ খাওয়ালেন। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পেটে ব্যথা শুরু হল। এত ব্যথা, বিছানা ছেড়ে উঠতে পর্যন্ত পারে না।

ভোরবেলা বেরুবার মুখে ওর বাবা এসে এই খবর দিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, লিলি আর সে লিলি নেই। একদিনেই কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। অমন ভাসা-ভাসা চোখ দুটি গর্তে ঢুকে গেছে, চোখে কালি পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে লিলি?

আমার দিকে একবার তাকিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ক্ষীণ কণ্ঠে লিলি বললে—বড্ড ব্যথা।

বুঝলাম ব্যথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে, এত ব্যথা। পাশে বসে ওর নাড়ী দেখলাম। গ্যাস্ট্রিক আলসার থেকে রক্তক্ষয় হলে যা হয়, দেখলাম নাড়ীর গতি ঠিক তাই। পেটে হাত দিলাম। কিন্তু একি? এ তো গ্যাস্ট্রিক আলসার নয়? এ যে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্! আগে তো কখনও এ রকম লিলির হয় নি? পেটটাও একটু ফেঁপেছে। মনে হচ্ছে যেন পেরিটোনাইটিস্ হচ্ছে। কি সর্বনাশ! এক্ষুণি যে হাসপাতালে নিয়ে অপারেশন করা দরকার।

পরীক্ষা শেষ করে অন্য ঘরে এসে লিলির বাবা-মাকে এই কথা বললাম।

শুনে ওঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না। ওর মা শুধু বললেন—বলেন কি? অপারেশন? কেন?

বুঝিয়ে বললাম, এখন যা অবস্থা তাতে অপারেশন করানোই ভালো। ওর বাবা বললেন—হাসপাতালে নেবার আগে একজন সার্জন দেখিয়ে নিলে হয় না?

বললাম—খুব ভাল হয়। কিন্তু যাঁকেই দেখানো হোক, তাড়াতাড়ি করে দেখাতে হবে। দেরি করলে চলবে না। বিকেলের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া চাই-ই।

বলে পেনিসিলিন, গ্লুকোজ, এট্রোপিন ইত্যাদি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলাম। দুপুরে বাড়ি ফিরতেই ওর বাবা এসে বললেন—আমাদের চেনা যিনি বড় সার্জন তাঁকে আজকে পাওয়া যাবে না। কাল তিনি হয়ত আসতে পারেন।

বললাম—তাহলে অন্য সার্জন দেখান হোক।

ভদ্রলোক বললেন—আপনিই তাহলে কাউকে দেখান। কাকে দেখাবেন?

ভেবে দেখলাম, এক্ষুণি এনে দেখান যায় এমন চেনাশোনা একটি সার্জনই আছেন। কাছেই তাঁর চেম্বার। নামকরা সার্জন। স্থানীয় এক মেডিক্যাল কলেজের সার্জারীর প্রফেসর। ছুটলাম তাঁর কাছে।

গিয়ে দেখি, তিনি হাসপাতালের কাজ সেরে সবে চেম্বারে ফিরে লাঞ্চ খাচ্ছেন। খেতে খেতেই কেসটা আগাগোড়া সব শুনে খাওয়া শেষ করে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। লিলিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষা করে হাত ধুয়ে পাশের ঘরে এসে বললেন—তোমার ডায়াগনোসিস

নির্ভুল। অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই থেকে খানিকটা পেরিটোনাইটিস্‌ও হয়েছে। পালস্‌টা খুব ভাল। এক্ষুণি অপারেশন না করে কিছুক্ষণ ওয়াচ্ করা চলবে।

বললাম—সেই জন্যই তো সময় থাকতে হাসপাতালে পাঠাতে চাইছি। যাতে ওরা ওয়াচ্ করে দরকার হলে সময়মত অপারেশন করতে পারে।

সার্জন বললেন—বেশ, সে হলে তো খুবই ভালো। যদি আমাদের হাসপাতালে দাও, আমাকে ফোন কোরো, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

শুনে লিলির বাবা বললেন—কাছেই যে আর একটি বড় হাসপাতাল আছে, সেখানে পাঠালে কেমন হয়? বললাম—খুব ভালো হয়। ওখানকার সার্জনও খুব নাম-করা। যিনি ভর্তি করবেন, তিনিও আমার চেনা, এক-সঙ্গে কলেজে পড়েছি। ওখানে ভর্তি করলে তাঁকেও আমি চিঠি লিখে দিতে পারি।

হাসপাতালে ভর্তি করা হবে শুনে লিলিদের আরও কয়েকজন আত্মীয় এসে পড়লেন। সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক হল, কাছের ঐ বড় হাসপাতালেই ভর্তি করা ভালো হবে। আমি কি চিকিৎসা করেছি, সব লিখে যিনি ভর্তি করবেন, তাঁর নামে একটা চিঠি লিখে দিলাম।

বিকেলবেলা অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে ওরা লিলিকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি, লিলির বাবা বসে আছেন। বললেন—হাস-পাতালে ভর্তি হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আপনার চিঠি পড়ে আর রুগী পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, এটা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ই বটে, তবে অপারেশন কখন করা হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না। আপনি যে ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছেন, তাতে ব্যথা অনেক কমে গেছে, তাই ওঁরা আরও কয়েক ঘণ্টা দেখবেন। সন্ধ্যের পর একজন বড় সার্জন এসে দেখে গেছেন, তিনিও বলেছেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্। রাত্রে হয়ত অপারেশন দরকার হতে পারে। আপনাকে খবর দিয়ে আবার হাসপাতালে যাচ্ছি।

বললাম—সময় থাকতে যে হাসপাতালে পাঠানো গেছে, এইটেই খুব ভাগ্য। নইলে বাড়িতে আপনারা এ কেস্ কি করে চিকিৎসা করাতেন ভাবুন তো?

ভদ্রলোক বললেন--এত সিরিয়স্ যে হয়ে গেছে, আমরা তো ভাবতেই পারিনি। ভাগ্যি আপনি ছিলেন।

বললাম—অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের অপারেশন আজকাল হামেশাই হচ্ছে।

এতে আর কোনো । এবারে দেখবেন ওর চেহারা ফিরে যাবে। বারে বারে আর পেতে হবে না। কি হল, কাল সকালেই খবর দেবেন।

পরদিন সকালে উঠে চা খাচ্ছি, ভদ্রলোক এলেন। বললেন—কাল আপনার কাছ থেকে উঠে বাড়িতে গিয়ে ভাত খেয়ে হাসপাতালে গিয়েই শুনি বড় সার্জন এসে লিলিকে অপারেশন-থিয়েটারে নিয়ে গেছেন। রাত একটার পরে সবাই ও টি থেকে বেরুলেন। সার্জন বললেন—কেস্টা বড়ই কম্‌প্লিকেটেড। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্। কিন্তু পেট কেটে দেখা গেল তা নয়। অ্যাপেণ্ডিক্সের কাছেই প্রকাণ্ড একটি আলসার, টিউবারকুলার বলেই মনে হচ্ছে। একটি আলসার থাকলেও কেটে বাদ দেওয়া চলত, কিন্তু সমস্ত ইনটেস্‌টাইনের গায়েই আলসার। তাই অপারেশন করে কিছু করা গেল না। এখন শক্ যদি কাটিয়ে ওঠে, তাহলে আশা করা যায় ভাল হয়ে উঠবে।

ভদ্রলোক বললেন—কাল সারা রাত আমরা পালা করে হাসপাতালে ছিলাম। ডাক্তার নার্স সব্বাই বলছেন খুব সময়মত লিলিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাড়িতে রাখলে আর বাঁচত না। রাত্রেই মৃত্যু হত। আপনার দয়াতেই ওর প্রাণ বাঁচলো। আপনি না বললে হাসপাতালে যাওয়াই হত না। কাল রাত্রে এক বোতল রক্ত দেওয়া হয়েছে, আজ আর এক বোতল দেওয়া হবে। ডাক্তাররা সবাই খুব যত্ন নিচ্ছেন। কখনও ভাবিনি হাসপাতালে এত যত্ন হয়।

শুনে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। লিলির তাহলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্‌ও হয়নি, গ্যাস্ট্রিক আলসারও না। প্রথম থেকেই যা হয়েছিল সে হল টিউবারকুলার আলসার! তাই একটু পরিশ্রম আর অনিয়ম করলেই শরীর অত খারাপ হত। কিন্তু জ্বর হয়নি কেন? হয়ত একটু একটু হত, কখনও খেয়াল করে নি। আমিও তো কই একথা কখনও ভাবিনি? মনটা ভারি দমে গেল। চা খাচ্ছিলাম, হঠাৎ যেন বিস্বাদ মনে হল। বললাম—টি বি-র তো আজকাল খুব ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। হাসপাতালে তা নিশ্চয়ই দেবে। কাজেই শিগ্‌গিরই লিলি সেরে উঠবে। টি বি-তে আর এখন ভয় কি?

ভদ্রলোক খুশী হয়ে উঠে গেলেন। কিন্তু আমি মনে একটুও শান্তি পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, এতদিন থেকে বেচারা ভুগছে আর আমি রোগটা কী, তাই ধরতে পারি নি। ধরতে পারলে এতদিনে কবে লিলি সেরে উঠত!

অপারেশনের শক্ লিলি কাটিয়ে উঠল। পেটের আলসারের যে অংশ কেটে পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরীতে পাঠানো হয়েছিল, তা টিউবারকুলার বলেই রিপোর্ট এল। টিউবারকুলোসিস-এর চিকিৎসা শুরু হল।

তখন টিউবারকুলোসিসের একটিমাত্র ওষুধ বেরিয়েছে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন। অনেক দাম। এই ওষুধই লিলিকে দেওয়া হল। কিন্তু এমন ওর ভাগ্য, এই ওষুধের খুব কম ডোজও লিলি সইতে পারল না। ওষুধ দিলেই ওর রিঅ্যাকশন হয়, সাংঘাতিক বমি হয়, যা খায় কিছুই রাখতে পারে না। বাধ্য হয়ে ওষুধ বন্ধ করে শুধু নিউট্রিশনের দিকে নজর দেওয়া হল।

হাসপাতালের সার্জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঢালা হুকুম দিয়ে রাখলেন, লিলি যখন যা খেতে চাইবে, তাই যেন হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়। নিউট্রিশন বাড়াবার জন্য নূতন নূতন দামী ওষুধ ইনডেণ্ট করিয়ে আনিয়ে রাখলেন। নিজে দু-বেলা এসে লিলিকে দেখে উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন। সারাদিন লিলি কি খেয়েছে, আর কি খেতে চায়, নিজে এসে দেখে যেতে লাগলেন। কড়া মেজাজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এই দুর্বলতা দেখে ডাক্তার নার্সরা অবাক হয়ে গেল।

প্রথম কয়েকদিন বেশ আগ্রহ করে চেয়ে খেয়ে লিলির আবার অরুচি ধরে গেল। কিছুই খেতে ভালো লাগে না। এমন কি ঝাল পর্যন্ত না। কোনা ওষুধ লিলি খেতে পারে না। দামী দামী ভালো ভালো ওষুধ দু-চামচে চার চামচে খেয়েই ফেলে রাখতে হয়, আবার নতুন ওষুধ আসে। ইন্‌জেক্‌শন দেবারও উপায় নেই, দিলেই রিঅ্যাকশন হয়, কাঁপুনি ধরে। গ্লুকোজ পর্যন্ত লিলি সহ্য করতে পারে না। ডাক্তার নার্সরা হার মেনে গেল। মাস তিনেক ধরে নানা রকমে চেষ্টা করে কিছুই করতে না পেরে অমন জবরদস্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন—আমরা তো সব রকম চেষ্টাই করে দেখলাম, কিছুই কাজে লাগলো না। এইবার ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখুন। বাড়ির আবহাওয়ায় হয়ত কিছু উপকার হতে পারে।

অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে আবার লিলি বাড়ি ফিরে এল। গিয়ে দেখি, লিলি জানালার কাছে বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু কোথায় লিলি? কোথায় সেই ভাসা-ভাসা চোখ? অমন মিষ্টি হাসি? সেই ফুটফুটে ফর্সা রং? এ যেন লিলির কঙ্কাল, পাংশু চামড়ায় মোড়া, চর্বিবিহীন। আমাকে দেখেই ক্ষীণকণ্ঠে বললে—মেসোমশাই, হাসপাতালে ওরা ইন্‌জেক্‌শন

দিতে জানে না। ফুঁড়ে ফুঁড়ে দেখুন আমার হাত কি রকম কালো করে দিয়েছে। আমি আর হাসপাতালে যাব না। আপনার ওষুধ খাব; আপনার কাছ থেকেই ইন্‌জেক্‌শন নেব।

বললাম—বেশ তো, তাই হবে।

আবার আমি ইনট্রাভেনাস গ্লুকোজ দিতে শুরু করলাম। কি আশ্চর্য, কোনো রিঅ্যাকশন হল না। একবার ফুঁড়েই রোজ গ্লুকোজ দেওয়া গেল। লিলি খুশী হয়ে বললে—এমন সুন্দর ইন্‌জেক্‌শন হাসপাতালে কেউ দিতে জানে না। ওখানে ইন্‌জেক্‌শন দিলেই আমার কাঁপুনি আসত।

লিলির আত্মীয়রা পরামর্শ করে একজন বড় চিকিৎসক এনে দেখালেন। তিনি আবার স্ট্রেপ্টোমাইসিন দিতে বলে গেলেন। হাসপাতালে যতবার স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেওয়া হয়েছে, ততবারই লিলির সাংঘাতিক রিঅ্যাকশন হয়েছে। এই শরীরে আবার ঐ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে রিঅ্যাকশন করাতে আমি রাজী হলাম না। বললাম—লিলি আর বেশিদিন বাঁচবে না। এখন ওর কষ্ট হয় এমন ইন্‌জেক্‌শন আমি দিতে পারব না। আর কেউ এসে বরং দিক।

শুনে লিলির বাবা বললেন—তাহলে মিছিমিছি ফোঁড়াফুঁড়ি করে কি হবে? আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। লিলির জন্য আপনি যা করলেন আর কেউ কি তা করত? এ ঋণ আমরা কোনোদিন শুধতে পারব না।

বাড়ি এসে প্রথম দু-চার দিন একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠে লিলি আবার নির্জীব হয়ে পড়ল। বি এ পরীক্ষার ফল বেরুল, ডিস্টিংশনে পাশ করেছে খবর পেয়েও লিলির কোনো ফুর্তি দেখা গেল না। শুধু আমাকে দেখেই একটু খুশী হয়ে উঠত। শীর্ণ হাতখানা গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শনের জন্য বাড়িয়ে দিত। চোখের ইঙ্গিতে চেয়ারে বসতে বলত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি, লিলি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নাড়ী দেখে চুপি চুপি উঠে এলাম। সেইদিন রাত্রিশেষে আবার হঠাৎ কালো পাইখানা হল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, নাড়ী নেই। পাশে বসতেই আমার দিকে একবার চোখ মেলে চাইল। সে দৃষ্টি স্থির হয়ে চোখের পাতা আর বন্ধ হলো না। নিঃশ্বাসের ক্ষীণ স্পন্দন ক্ষীণতর হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। লিলির ঐ দৃষ্টিহীন স্থির চোখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্তব্ধ বুকের ওপর স্টেথোস্‌কোপ বসিয়ে কোনো শব্দ শুনতে না পেয়ে উঠে এলাম। আমার হাতে ওর চিকিৎসা শুরু

হয়েছিল। আমার হাতেই শেষ হল।

চেনা-মহলে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। লিলির জন্য আমি যা করেছি, তার নাকি তুলনা হয় না। লিলির আত্মীয়েরা এত কৃতজ্ঞ, চারদিকে এত প্রশংসা; তবু কেন মন খুশীতে ভরে ওঠে না? কেন মনে হয়, এত আগে আমি দেখেছি তবু রোগটা ধরতে পারি নি?

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ বলে হাসপাতালে ভর্তি করবার দিন যে সার্জনকে আগে দেখিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা হল। লিলির কথা সব শুনে তিনি বললেন—তুমি জেনারেল প্র্যাকটিশনার আর আমি একজন এক্সপার্ট। সেই আমারই ভুল হল। অথচ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ ধরতে কখনও ভুল হয় না বলে আমার গর্ব ছিল। তুমি প্রথম থেকে যা করেছ আমি হলেও তাই করতাম। যে কোনো ভাল চিকিৎসকই তাই করতেন। লক্ষণ দেখে বিচার করাই আমাদের কাজ। তাতে তোমার কোনো ত্রুটি হয়নি।

বললাম—আইনের দিক থেকে, বিজ্ঞানের দিক থেকে আপনি যা বললেন তা সবই ঠিক। কিন্তু এ কথাই বা কি করে ভুলি যে, কলকাতার মত শহরে থেকে ছ মাস ধরে চিকিৎসা করেও রোগটা আমি ধরতে পারি নি। অত আগে ধরা পড়লে স্ট্রেপ্টোমাইসিনও হয়ত লিলি সইতে পারত, অমন রিঅ্যাকশন হয়ে শেষে চিকিৎসার বাইরে চলে যেত না।

॥ ৭ ॥

ডাক্তারী পাশ করে হাসপাতালের আউটডোরে ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা কাজ পেয়ে গেলাম। কাজটির কোনো বেতন নেই, কিন্তু মর্যাদা আছে। নতুন তৈরী স্যুট পরে সকাল আটটায় ডিউটিতে যাই, বেলা দেড়টা-দুটোয় ফিরে আসি।

আউটডোরের নতুন পাশকরা ডাক্তারের তখন প্রধান কাজ ছিল খাতা লেখা। টিকিটের নাম, নম্বর, ঠিকানা, বয়েস, ধর্ম, পুরুষ কি স্ত্রী—এই সব বড় খাতায় তুলতে হবে। তারপর নতুন টিকেট ভিজিটিং চিকিৎসকের জন্য আলাদা করে রেখে পুরনো কেস্ সব দেখতে হবে। ভিজিটিং চিকিৎসক আসার আগেই পুরনো টিকেট সব বিদায় করা চাই। এইটেই হল কাজ। বেশ কঠিন কাজ।

আউটডোরে পুরনো কেসই রোজ বেশী আসে। আমার কাজ এই সব রুগী দেখা। দেখা মানে শুধু চোখেই দেখা। রুগী পরীক্ষা করা নয়। পরীক্ষা করে বোঝার মত বিদ্যে কোথা? পরীক্ষা করার দায়িত্বও আমার নয়। আমার যিনি বস্ তাঁর। ভিজিটিং চিকিৎসকের। একবার তিনি দেখে দিয়েছেন, খুব বেশী গড়বড় না হলে আর তিনি দেখবেন না। আমার কাজ তাঁর-দেওয়া ওষুধ দিয়ে এই সব কেস্ বিদায় করা।

মনে করুন একশটি মাত্র পুরনো টিকেট টেবিলের ওপর জমা হয়েছে। লম্বা কিউ পড়েছে। দারোয়ান দরজার গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আটটার সময় নতুন তৈরী স্যুট পরে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে আমি আউটডোরে ঢুকলাম। দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দিল। লম্বা কিউ-এ 'ডাক্তার এসেছে', 'ডাক্তার এসেছে' বলে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।' যে ক্লার্কটি টিকেট লিখছিলেন তিনি হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমি বেশ একটু গর্ব বোধ করে হেসে প্রতি নমস্কার করে গট্‌মট্ করে এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসলাম।

বসে ঐ একশটি পুরনো টিকেট একটি একটি করে খাতায় এণ্ট্রি করব এবং নাম ডাকব। দারোয়ান কিউ থেকে রুগী ছেড়ে দেবে। ততক্ষণে টিকেটে দেখে নেব কি রোগ, কতদিন থেকে ভুগছে, কি কি পরীক্ষা

হয়েছে। রুগী কাছে এলে জিজ্ঞাসা করব—কেমন আছ?

রুগী বলবে—ভাল নেই। ব্যথা বেড়েছে। অথবা বলবে—জ্বর ছাড়ছে না।

তখন ভাবছেন টেবিলে শুইয়ে তাকে পরীক্ষা করব? মোটেই তা করব না। খস্‌খস্‌ করে টিকেটের পেছনে রিপিট লিখে ছেড়ে দেব। পরের কেস্‌ ডাকব। নইলে এত রুগী ম্যানেজ করব কি করে?

এই রিপিট লেখা মানে হল ঃ রুগী আগে যে অষুধ পাচ্ছিল আজও তাই আবার পাবে। রিপিট লিখে না দিলে অষুধ পাবে না। দশটার মধ্যে পুরনো টিকেট সব ডিস্‌পেন্সারীতে জমা হওয়া চাই। নইলে কম্পাউণ্ডার অষুধ দেবে না। তাই তাড়াতাড়ি সব সারতে হবে।

এই রকম রিপিট লিখতে লিখতে চেহারা দেখে অথবা কথা শুনে হঠাৎ কিছু সন্দেহ হলে হয়ত একবার রুগীর চোখের পাতা টেনে বলব, জিভ দেখাও। কিম্বা পেটটা একটু টিপে পিলে লিভার দেখে নেব। খুব বেশী হলে 'জামা ওঠাও' বলে স্টেথোস্‌কোপ দিয়ে বুক পিঠটা একবার দেখব। ব্যস! তারপর টিকেটে রিপিট লিখে বিদায় করব। কঠিন কিছু সন্দেহ হলে ভিজিটিং-এর জন্য আলাদা করে টিকেটখানা রেখে দেব। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে অষুধ বদলে বিপত্তি ঘটাব না।

একদিন একটি রুগী দেখে ভিজিটিং বললেন—পিঠে ডানদিকের কাঁধের নীচে একটা প্যাচ্‌ পাচ্ছি। বেশ সাস্‌পিসাচ্‌। একটা ছবি তুলিয়ে নাও।

প্যাচ্‌টার ওপর স্টেথোস্‌কোপ বসিয়ে নিঃশ্বাসের উনিশ-বিশ তফাত কিছুই বুঝলাম না। কোথায় প্যাচ্‌ তা মালুম হল না। তবু রুগীকে বললাম—একটা ফটো তুলতে হবে। কাল আসবেন। ছ টাকা লাগবে।

রুগী জিজ্ঞাসা করলে—বাইরে থেকে করলে হবে না?

বললাম—কেন হবে না? ভাল জায়গা থেকে করালে নিশ্চয়ই হবে। দেখবেন, ছবি কিন্তু ভাল হওয়া চাই।

বলে একে বিদায় করে অন্য কেস্‌ ডাকলাম।

দিন দুই পরে রুগীটি পাস্‌পোর্ট সাইজের আটখানা আবক্ষ ফটোগ্রাফ নিয়ে হাজির হল। গর্বভরে হেসে ছবিগুলি আমার হাতে দিয়ে বললে—আপনাদের এখানে ছ টাকা লাগবে বলেছিলেন। এই দেখুন এক টাকায় আটখানা তুলে এনেছি। আট রকমের পোজ্‌। কেমন হয়েছে বলুন দেখি?

এই দেখে কার মেজাজ ঠিক থাকে? গম্ভীর হয়ে বললাম—বেশ

হয়েছে। ভিজিটিং এলে দেখাবেন।

ভিজিটিং এসে দেখে কিন্তু আমার ওপরই চটে গেলেন। বললেন—তোমারই অন্যায় হয়েছে। ভাল করে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল।

চুপ করে ঢোঁক গিলে গেলাম।

দেখতাম, দুটি একটি রুগী কতদিন থেকে যে আউটডোরের অষুধ খাচ্ছে তার যেন আর হিসেব-নিকেশ কিছু নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর ধরে অষুধ খেয়ে চলেছে। রিপিট লিখে লিখে টিকেট ভরে গেছে, আবার নতুন টিকেট গাঁথা হয়েছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য হাসপাতালের সব ডিপার্টমেণ্টে ঘুরে এসেছে। সব রকম পরীক্ষা হয়েছে। মলমূত্র রক্ত থুথু এক্‌স্‌-রে সব করা হয়েছে। কিন্তু রোগ নির্ণয় হয়নি। মাসের পর মাস হয়ত ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হচ্ছে। টিকেটে ডায়োগ্‌নোসিস্‌ লেখা হয়েছে—পি· ও· ইউ·। পাইরেক্‌সিয়া অফ্‌ আন্‌নোন্‌ অরিজিন্‌। কি জন্য জ্বর হচ্ছে তা জানি না। যখন ছাত্র ছিলাম তখন এসব কেস্‌কে আমরা বলতাম—জি· ও· কে·। গড্‌ ওন্‌লি নোজ্‌। কি রোগ তা ঈশ্বর জানেন।

আবার দুটি একটি রুগী দেখতাম যেন অষুধ খাবার জন্যই হাসপাতালে আসে। রোগ কিছুই বিশেষ নেই। ঘিয়ে ভাজা পুরনো নোংরা টিকেট। হাসপাতালের সব ডিপার্টমেণ্টের ছাপ মারা। শরীরে কোথাও কোনো দোষ নেই। চেহারাও খুব রুগ্ন নয়। কষ্টও বিশেষ কিছু নেই। জ্বর নেই, জ্বালা নেই, পেট খারাপ নয়, কাসি নেই। কি হয়েছে? না, পেটে ব্যথা। কি রাতে ঘুম ভাল হয় না। কিম্বা অম্বল। নয়ত গায়ে ব্যথা।

এমনি একটি রুগীকে একদিন বলেছিলাম—অনেকদিন তো অষুধ খেয়ে দেখলেন রোগ সারল না। এইবার কয়েকদিন অষুধ বন্ধ করেই দেখুন না?

শুনে রুগীটি ফস্‌ করে বললে—আমি তো আর আপনাকে দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছি না। করাচ্ছি এখানকার ভিজিটিংকে দিয়ে। দু বছর ধরে তিনিই দেখছেন। অষুধ দিচ্ছেন। অষুধ বন্ধ করতে হলে তিনিই করবেন। আপনি তো শুধু রিপিট লিখে দেন। ডাক্তারবাবু আসুন, তিনি যা বলবেন তাই হবে।

দেখুন দেখি আস্পর্ধা! আমাকে বলে কিনা আমি শুধু রিপিট লিখে দি, চিকিৎসা করি না। চিকিৎসা করেন ভিজিটিং। কাজেই তিনি ডাক্তারবাবু। আমি তাহলে কি? রিপিটবাবু?

শুনে রাগে গা জ্বলতে লাগল। কান বেগুনী হয়ে উঠল। লোকটা ভিজিটিং-এর নাম করেছে তাই আর দারোয়ান দিয়ে ওকে বার করে দিতে সাহস হল না। নিষ্ফল আক্রোশে ভেতরে ভেতরে গজরাতে লাগলাম।

ওর দিকে একবার কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বললাম—বেশ, তাই হবে।

বলে অন্য টিকেট ডাকলাম। ভাবলাম, ভিজিটিং এলে এর একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার করতে হবে। তাক্‌ বুঝে এমন করে লাগাতে হবে যাতে উনি ক্ষেপে গিয়ে দূর করে ওকে তাড়িয়ে দেন। শুধু তাড়িয়ে দিলেও বুঝি এ জ্বালা যায় না। দেখুন, সত্যি কথার কি সাংঘাতিক তেজ! কান দিয়ে ঢুকে সোজা গিয়ে মর্মমূলে ঘা দেয়। সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। ইলেক্‌ট্রিক্‌ শক্‌ ছাড়া কঁড়া কোনো ইন্‌জেক্‌শনেও বুঝি এত দ্রুত ফল হয় না। চট্‌পট্‌ টিকেটের পর টিকেট ডাকতে লাগলাম আর খস্‌খস্‌ করে রিপিট লিখে ছেড়ে দিলাম।

পুরনো টিকেট শেষ হতে না হতেই ভিজিটিং এলেন। আমি নমস্কার করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এইবার উনি এই চেয়ারে বসবেন আর আমি বসব পাশের টুলে। আমি নতুন রুগীর নাম ডাকব, ইনি পরীক্ষা করবেন, অষুধ বলে দেবেন। আমি তা টিকেটে লিখব, বড় খাতায় তুলে নেব।

আজকে কিন্তু ভিজিটিং আসতেই ঐ লোকটি এসে হাত জোড় করে নমস্কার করে দাঁড়াল। ভিজিটি হেসে ওকে জিজ্ঞেস করলেন—কিহে? কি খবর?

লোকটি বললে—আজ্ঞে রাতে ঘুম হচ্ছে না তাই অষুধ নিতে এসেছিলাম। ইনি রিপিট লিখে দিলেন না। বললেন—দরকার নেই।

কোথায় আমিই ওর নামে লাগাব, না ওই এসে আগেভাগে আমার নামে নালিশ ঠুকে দিল! দেখুন কেমন উল্টো প্যাঁচে পড়ে গেলাম।

ভিজিটিং যেন একটু বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কি ব্যাপার? অষুধ দাও নি কেন?

ততক্ষণে আমার কান আবার বেগুনী হয়ে উঠেছে। একটু আমতা আমতা করে বললাম—অনেকদিন ধরে অষুধ খাচ্ছে, কিছুই তো হচ্ছে না। তাই বলছিলাম, কয়েকদিন অষুধ বন্ধ করে দেখতে।

ভিজিটিং বললেন—না না, অষুধ না খেলে ওর ঘুম হয় না। রিপিট লিখে ছেড়ে দাও।

দেখুন আমার প্রেস্‌টিজ্‌ কি রকম ঢিলে হয়ে গেল। আবার সেই

রিপিট লিখতে হল। শুনে লোকটা আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল। আমি ঘেমে উঠলাম।

লোকটি চলে গেলে ভিজিটিং বললেন—অষুধ খাওয়াই ওর বাতিক। সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্টের চেনা লোক। যতদিন আসবে অষুধ লিখে দেবে। আমার কাছে আর ওকে আনবে না। ওকে দেখলেই মেজাজ বিগড়ে যায়।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম—আচ্ছা স্যার।

আমার মেজাজও খারাপ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে রইলাম। ভিজিটিং-এর সঙ্গেও ভাল করে কথা কইলাম না। হ্যাঁ স্যার, না স্যার বলে কাজ সেরে দিলাম। সেদিন নতুন রুগী বেশী ছিল না। শিগ্‌গিরই কাজ শেষ হয়ে গেল।

আউটডোর থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে কাগজখানা টেনে নিয়ে বসলাম। এমারজেন্সিতে যে নতুন ডাক্তারটির ডিউটি সে এসে পাশে বসে বললে—তোর দেখছি অনেক আগেই কাজ শেষ হল, আমার ডিউটিটা একটু করে দিবি ভাই?

কাগজ থেকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম—কেন রে? কোথায় যাবি? বাণিজ্যে?

ডাক্তার বললে—দূর! কোথায় বাণিজ্য? এখন শুধু লসের বাজার। যাব শেয়ালদা স্টেশনে। আসাম মেল অ্যাটেন্ড্‌ করতে হবে।

বললাম—ও বুঝেছি। বউ আসছে। বেশ, ডিউটি করে দেব যদি চায়ের সঙ্গে কাট্‌লেট আর রসগোল্লা খাওয়াস।

ডাক্তার বললে—আচ্ছা, তাই খা। আমি আর এস-কে বলে আসি। বলে দোকানে অর্ডার দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সকালের এমারজেন্সী ডিউটি বেলা আটটা থেকে দুটো। তারপর যে ডাক্তার আসবে সে থাকবে রাত দশটা পর্যন্ত। তখন বেলা বারোটা। বিনা পয়সায় কাট্‌লেট এবং রসগোল্লা সহযোগে চা খেয়ে মনে আবার ফুর্তি এল।

ডাক্তারটি ফিরে এসে বললে—সব ঠিক করে এলাম। তুই ভাই এবার বসগে যা।

বললাম—কি রকম কেস্‌ আসছে রে?

ডাক্তার বললে—আজ কোনো কেস্‌ নেই। গোটা দুই ছড়ে যাওয়া আর একটা পা মচ্‌কানো। সব ক্লিয়ার করে দিয়েছি।

বললাম—এখন তো বারোটা বাজল। দু ঘণ্টায় আর কটা কেস্‌ আসবে? ডাক্তারের তখন পালাবার তাড়া। বললে—না না এখন আবার

কেস্ আসে নাকি? আসবে সেই সন্ধ্যেবেলা। তুই ভাই তাহলে চার্জ নিলি। আমি চললাম। আরও দেরি হলে ট্রেন ঠিক মিস্ করব।

বললাম—ঠিক আছে। তুই যা।

ডাক্তার টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখনকার দিনে আমরা স্যুট, বুট আর টাই পরতাম। ডাক্তার আর ছাত্রদের মধ্যে এইটেই ছিল আসল তফাত। পাশ করলে স্যুট পরা যাবে। স্যুট করাতে গিয়ে বুঝলাম, পাশ করে খরচাই শুধু বাড়ল। আজও দেখছি, খরচাই শুধু বেড়েছে, রোজগার তেমন হয়নি।

এমারজেন্সীতে গিয়ে দেখি, সত্যি কোনো কেস্ নেই। বিনা পয়সার চা কাট্‌লেট খেয়ে মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল, রুগী নেই দেখে গলা দিয়ে গুনগুন করে গান বেরিয়ে এল।

নার্স বললে—ডাক্তারের আজ দেখছি খুব ফুর্তি! ব্যাপার কি?

বললাম—একে তো অপরের ঘাড় ভেঙে খেয়ে এলাম, তারপর দেখছি কেস্ নেই। ফুর্তি হবে না?

নার্স বললে—কেস্ আসার কিছু ঠিক আছে নাকি? ঐ দেখুন, বলতে না বলতেই অ্যাম্‌বুল্যান্স এসে গেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, সত্যি অ্যাম্‌বুল্যান্স এসেছে। স্ট্রেচারে করে রুগী নাবাচ্ছে। সঙ্গে পুলিস।

পুলিস দেখে অবশ্য ভয় হল না। এমারজেন্সী রুমে পুলিস হামেশাই আসে। জুতোয় খট্ করে অ্যাটেন্‌শনে দাঁড়িয়ে সেলাম করে। পুলিস-রিপোর্ট জমা থাকলে নিয়ে যায়। অসুখ ছাড়া, কাটা, ছেঁড়া, হাড়ভাঙ্গা, মার খাওয়া, বিষ খাওয়া যে কেস্ই আসুক, হাসপাতালের নিয়ম, সব টিকেটে 'পুলিস' ছাপ মেরে দিতে হয়। আলাদা খাতায় কি চিকিৎসা হল, রুগী কি বলল, কেমন করে আঘাত পেল, অবস্থা কেমন সব লিখে রাখতে হয়। রোজ থানায় রিপোর্ট পাঠাতে হয়। থানা থেকে পুলিস এসে এই রিপোর্ট নিয়ে যায়।

কিন্তু অ্যাম্‌বুল্যান্সের সঙ্গে যখন পুলিস আসে তখন বুঝতে হয়, মারপিট, খুন জখম কিছু একটা হয়েছে, পুলিসে ধরেছে। স্ট্রেচারে করে যাকে নাবানো হল একবার তাকিয়েই বোঝা গেল, তার কি হয়েছে। কপালটা একটা বড় নৈনিতাল আলুর মত ফুলে উঠেছে। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে গাল বেয়ে জামা কাপড়ে পড়ে শুকিয়ে রয়েছে। সর্বাঙ্গ জল কাদায় মাখা। কাছে যেতেই ভক্ করে দিশি মদের পচা গন্ধ নাকে এল।

টেবিলে উঠিয়ে মাথার ক্ষত দেখে মনে হল, হাড়টাড় কিছু ভাঙে নি। চামড়াটা ইঞ্চিখানেক ফেটে গিয়েছে মাত্র। কিন্তু যেরকম হাঁ করে আছে তাতে মনে হল, গোটা দুই সেলাই দেওয়া দরকার।

বেয়ারাটাকে মাথার চুল ক্ষতের চারদিকে গোল করে কামাতে বললাম। নার্সকে বললাম—সেলাই-এর সরঞ্জাম সব রেডি করুন।

নাড়ী দেখলাম বেশ ভাল। হাঁটু, কনুই আর হাতের তেলোয় এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। মাথার ক্ষতের রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু চামড়াটা ফাঁক হয়ে আছে। নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ঠেলেঠুলেও জাগান গেল না। দেখা গেল, অজ্ঞান হয়নি। দেহ অসাড় হয়নি। চোখের পাতা টেনে দেখলাম, দুটি রক্ত-চক্ষু।

পুলিসের কাছ থেকে জানা গেল, লোকটা মদ খেয়ে মাতলামো করছিল বলে পাড়ার ছেলেরা আচ্ছা করে ঠেঙিয়েছে। মার খেয়েই হোক কি হোঁচট খেয়েই হোক ফুটপাথের পাশে নর্দমায় পড়ে ছিল। মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে দেখে রাস্তার একজন লোক থানায় খবর দেয়। কি হয়েছে জানবার জন্য এসে দেখা গেল, লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা ফুটপাথের কোণে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে দেখে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

সত্যি কেউ মেরেছে কিনা, দোষীই বা কে, সে সব খোঁজে আমার দরকার কি? আমার কাজ রুগী যা বলবে তাই রিপোর্টে লিখে দেওয়া। রুগীর যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে লিখব, রুগী অজ্ঞান। কি করে আঘাত পেল, জানা নেই। সঙ্গে লোক থাকলে সে যা বলবে তাই লিখে দেব। তারপর লিখব, আঘাতের বর্ণনা এবং চিকিৎসা।

রুগী অজ্ঞান; পুলিস সঙ্গে নিয়ে এসেছে, রিপোর্টে লিখে দিলাম। পুলিস যা বলেছে তা লিখে দেখি, সেলাই করার জিনিস সব রেডি। নার্স আর বেয়ারা দুজনে মিলে লোকটার মাথা কামিয়ে পরিষ্কার করেছে। যন্ত্রপাতি রেডি করেছে।

আমি উঠে এপ্রন পরে হাত ধুয়ে স্পিরিট দিয়ে দু হাত স্টেরিলাইজ্ করে নিলাম। রবারের দস্তানা পরলাম। ফরসেপস্ দিয়ে গজ নিয়ে তাতে আয়োডিন মাখিয়ে মাথার ক্ষতে লাগালাম। এইবার মাতালের ঘুম ছুটে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে টেবিলের ওপর উঠে বসল। ঘোলাটে রক্ত চক্ষু দুটি মেলে চারদিক তাকিয়ে দেখে বললে—এসব কি? আমাকে এখানে আনলে কে? বলে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে জিজ্ঞাসু

দৃষ্টি মেলে তাকাল।

আমার তখন দুটি হাতই আটকা। স্টেরিলাইজড্। এক হাতে ফরসেপ্‌স্ আর এক হাতে সূঁচ সুতো। তবু ডান হাতে তর্জনী দিয়ে পুলিসটিকে দেখিয়ে বললাম—মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে খানায় পড়ে ছিলে। পুলিস ধরে এনেছে।

এইবার মাতালটি দু হাতে ভর করে অপারেশন টেবিল থেকে নেবে টলতে টলতে কনস্টেবলটির দিকে এগিয়ে তার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—আমি নিজের পয়সায় মদ খেয়েছি তাতে তোর কি রে শালা? তোর পয়সায় খেয়েছি? আমাকে ধরে আনবার তুই কে? কার কাছে ঘুষ খেয়ে আমায় ধরেছিস বল?

পুলিসটি মাতালের এই কাণ্ড দেখে হকচকিয়ে গেল। আমি ফরসেপ্‌স্ নিড্‌ল্ সব ফেলে দস্তানা খুলে পর্দার বাইরে এসে মাতালটিকে পেছন থেকে ধরলাম। বললাম—অনেক মাতলামো হয়েছে; আর নয়। আমার সঙ্গে এসো। মাথাটি ফেটে গেছে; সেলাই দিতে হবে।

লোকটি পুলিসকে ছেড়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে ক্ষতের চারদিকে বার-কয়েক আঙুল চালিয়ে কামানো হয়েছে বুঝে আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বললে—আমার মাথা কামালে কে?

ওর ঐ ঘোলাটে চোখে চোখ রেখে গম্ভীর হয়ে বললাম—আমি।

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার মাথায় হাত বুলিয়ে এইবার মাতালটি ভ্যা করে কেঁদে ফেলল। বলল—এইরকম আধ-কামানো মাথা নিয়ে আমি বেরুব কি করে?

বুঝলাম, বলে কয়ে ধমক্-ধামকে একে দিয়ে কাজ হবে না। পেটে যে বস্তু আছে তা বার করতে হবে। স্টমাক্ পাম্প লাগাতে হবে। নইলে নেশা কাটবে না।

বেয়ারাকে বললাম—দারওয়ানকে ডেকে দে। সবাই মিলে একে টেবিলে তোল।

নার্সকে বললাম—স্টমাক-টিউব আর বাই-কারবনেট লোশন রেডি করুন।

দারওয়ান এলে, দুটি বেয়ারা আর পুলিস এই চারজনে মিলে ওকে চ্যাঙ-দোলা করে টেবিলে শুইয়ে চেপে ধরে রাখল। অনেক ধস্তাধস্তি করে নাক দিয়ে স্টমাক-টিউব ঢোকান হল। টিউবের মুখের ফানেলের ওপর বাই-কারবনেট লোশন ঢেলে বালতির ওপর ফানেলটা উপুড় করে

নাবাতেই পেট থেকে পচা দুর্গন্ধ ভরা ঘোলাটে তরল জিনিস সব বেরুতে লাগল। দু পাইন্ট লোশন দিয়ে পেটটা ধুইয়ে সেই জল ফানেল দিয়ে বার করে স্টমাক-টিউব উঠিয়ে নিলাম। প্রথমে খানিকটা চেঁচামেচি, গালাগালি, ধস্তাধস্তি করে লোকটা শেষে চুপ করেই ছিল। টিউব বার করবার পর বললে—পাম্প দিয়ে পয়সার মাল সব বার করে নেশাটা নষ্ট করে দিলেন স্যার?

বললাম—এইবার একটু চুপ করে সহ্য করে থাক। মাথায় দুটো সেলাই দিয়ে দি।

এই বলে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে স্পিরিট মেখে কাটা জায়গাটায় আবার আইডিন লাগিয়ে চট্‌পট্ সেলাই করে দিলাম। লোকটি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চুপ করে সহ্য করল। একটুও ছট্‌ফট্ করল না।

কাজ শেষ হতে না হতেই 'জ্বলে গেল', 'জ্বলে গেল' বলতে বলতে দুপাশে দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাকিয়ে দেখি, ভদ্রলোক বেশ মোটাসোটা। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়স। সাড়ে পাঁচ ফুট মত লম্বা। ঠোঁট দুটি ফোলা। মুখের দুপাশ বেয়ে কি যেন গড়িয়ে থুত্‌নির দু-দিক পুড়ে সাদা হয়ে গেছে। থক্‌থকে দেখাচ্ছে। বুকের ওপর শার্টে বড় বড় গর্ত। হাঁটুর নীচে কাপড়ে ও কোঁচায় বড় বড় ছেঁদা। কি পড়ে যেন খেয়ে গেছে। কাছে যেতে এঁর মুখ থেকেও মদের দুর্গন্ধ পাওয়া গেল।

ভদ্রলোককে ধরাধরি করে টেবিলে শোয়ান হল। ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলেন—গলা বুক পেট সব জ্বলে গেল। শিগ্‌গির কিছু একটা দিন।

জিজ্ঞাসা করলাম—ঠোঁট মুখ সব পুড়ে গেছে দেখছি। কি খেয়েছেন?

খস্‌খসে গলায় ভদ্রলোক বললেন—নাইট্রিক এসিড। কন্‌সেন্‌ট্রেটেড।

বললাম—সে কি? কেন?

ভদ্রলোক বললেন—ভুল করে মশাই; স্রেফ ভুল করে। দশ বছর ধরে মদ খাচ্ছি, এরকম মারাত্মক ভুল হয়নি কখনও। ফটোগ্রাফারের কাজ করি। স্টুডিওর আলমারীতে হাইপো, এসিড সব থাকে। তারই এক কোণে এক বোতল রাম্ রাখি চিরদিন। এই রেখে আসছি আজ দশ বছর। আজ সকাল থেকেই গা-টা কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করছিল। এমনি সময় এক বন্ধুলোক এল। হাতে এক বোতল রাম্। দুজনে বসে বসে দিলুম ঐ বোতল ফাঁক করে। বারোটা বাজতেই বন্ধু উঠে গেল। আমিও

টুকিটাকি দুটি একটি কাজ সেরে স্টুডিয়ো বন্ধ করে যাবার আগে ভাবলুম—নিই আর এক মাত্রা চাড়িয়ে। জল কি সোডা মিশিয়ে রাম্ আমি খেতে পারি না। বোতল তুলে মুখে খানিকটা ঢেলে নি; ঢক্ করে গিলে ফেলি। আজও আলমারী খুলে বোতলটি বার করে ছিপি খুলে মুখে ঢেলে যেই ঢক্ করে গিলেছি অমনি সব যেন জ্বলে গেল। থু থু করে খানিকটা বাইরে ফেললাম। কিছু গাল বেয়ে মুখের দু-পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি, হাতে রামের বোতলের বদলে স্ট্রং নাইট্রিক্ এসিড খুলে ধরে আছি।

বলেই ভদ্রলোক দুই হাতে পেটটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন—উঃ ছিঁড়ে গেল সব, জ্বলে-পুড়ে গেল।

দেখলাম হাত পা ঠাণ্ডা। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। তাড়াতাড়ি একটা মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন করে আর এস-কে খবর পাঠালাম।

এ অবস্থায় আমাদের করবার আর আছেই বা কী? স্টমাক টিউব দেওয়া যাবে না একে। নাইট্রিক এসিড পাকস্থলীর দেয়াল খেয়ে পাতলা করে দিয়েছে। টিউব ঢোকাতে গেলে ছিঁড়ে যাবে। বাই-কারবনেট অফ সোডা কি অন্য কোনো অ্যালকালিও খাওয়ান চলবে না। এসিডের সঙ্গে মিশে পেটে গ্যাস হবে। এসিডে খাওয়া পাকস্থলীর পাতলা দেয়াল ফেটে যাবে।

নাড়ীর অবস্থা দেখে মনে হল, এসিড বোধ হয় স্টমাক ফুটো করে সমস্ত পেটে ছড়িয়ে গেল। ভদ্রলোক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন।

মরফিয়া দেবার কিছুক্ষণ পরে একটু সামলে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—যন্ত্রণাটা একটু যেন কমেছে মনে হচ্ছে। এসিড খাবার পরই যখন চেঁচিয়ে উঠলুম, চিৎকার শুনে পাশের দোকান থেকে ২।৩ জন ছুটে এলেন। একজন বললেন,—এসিড খেয়েছেন, শিগ্‌গির খানিকটা সোডা খেয়ে ফেলুন। দুটোয় মিশে জল হয়ে যাবে। আলমারীতে বাই-কারবনেট অফ সোডা ছিল তাই খানিকটা জল দিয়ে খেয়ে ফেললুম। তাতে যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। পেটটা ফুলে উঠল। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করবার চেষ্টা করলাম। বমি হল না। গলা চিড়ে রক্ত বেরুলো। হাঁস-ফাঁস করছি দেখে শেষটায় এরা এখানে নিয়ে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, সমস্ত পেট বুঝি জ্বলে গেল।

হঠাৎ আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে বললেন—ডাক্তারবাবু, আমার

বাঁচান। এ যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারছি না।

আমি আর কি করব? কতটুকুই বা আমাদের ক্ষমতা? তবু ভরসা দিয়ে বললাম—ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি, যন্ত্রণা তো অনেকটা কমেছে। এইবার দেখবেন আরও কমে যাবে। আর এস-কে খবর দিয়েছি। এক্ষুণি এসে পড়বেন।

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে ভদ্রলোক এক সময় চুপ করে গেলেন। দেখলাম, গা বরফের মত ঠাণ্ডা। নাড়ী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম লাগছে?

ফিস্‌ফিস্‌ করে ভদ্রলোক বললেন—ভাল।

আর এস এলেন। আমার চেয়ে বছর দশেকের সিনিয়র। দেখে বললেন—মরফিয়া দিয়ে খুব ভাল করেছ। আর কিছু আমাদের করবার নেই। নাউ হি ক্যান ডাই পিস্‌ফুলি ইন্‌ দিস্‌ বেড।

বলতে বলতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। একখানা হাত মাথার নীচে রেখে ভদ্রলোক দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আর এস বললেন—পুলিসকে বল, বডি মর্গে নিয়ে যাক। বলে আর এস চলে গেলেন। আমি ঐ পলকহীন খোলা চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বর্ষাকাল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম দিগন্তে খুব ঘনঘটা। দেখতে দেখতে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। এমন গর্জন শুরু হল, মনে হল, আকাশ ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়বে বুঝি। কোনো এক হোমরাচোমরা মহাকবি যেন বলেছিলেন—মর্নিং শোজ্ দি ডে। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে ঐ ইংরেজ কবির খুব তারিফ করে আমার রুম-মেট্ বিনু বললে—আজ আর দেখতে হয় না। অ্যায়সা জল হবে যে, শহর ভেসে যাবে। রাস্তায় জল দাঁড়াবে। কলেজে যেতে হবে না।

তখন আমি মেডিক্যাল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। মেসে থাকি। একঘরে তিনজন। বিনু, হাজারী এবং আমি। তিনজনেরই এক ক্লাস। সকাল বেলা মেঘের এই আড়ম্বর দেখে কলেজে যেতে হবে না ভেবে মনে খুব ফুর্তি হল।

আমরা যে মেসটায় থাকতাম, ঘণ্টাখানেক জোরে বৃষ্টি হলেই তার সামনের রাস্তাটা জলে ডুবে যেত। ২।৩ ঘণ্টা না কাটলে সে জল সরত না। এই তিরিশ বছরে কলকাতার কত পরিবর্তন হল, কত পুরোনো বাড়ি ভেঙে কত বড় বড় রাস্তা হল; তার পাশে কত বিরাট বিরাট নতুন বাড়ি উঠল, শহর কত বড় হল, কিন্তু একটু বেশি বৃষ্টি হলে আগেও যা হত, এখনও দেখি ঠিক তাই। এখনও সেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাম বন্ধ, এখনও এখানে-ওখানে সেই হাঁটু জল। একবার জল জমলে দেখি শিগ্‌গির আর নাবে না।

সেদিন কিন্তু সকালের ঐ ঘনঘটার গর্জনই শুধু সার হল। বর্ষণ আর হল না। বেশ কিছুক্ষণ ফাঁকা আওয়াজ করে মেঘ কেটে গেল। ঝকঝকে রোদ উঠল। মাঝখান থেকে আমাদের ফুর্তিটাই শুধু মাঠে মারা গেল। এনাটমি না খুলে তাস নিয়ে বসব ভেবেছিলাম, তা আর হল না। যে ইংরেজ মহাকবির তারিফ মুহূর্তকাল আগেও তিন মুখে করেছি, এখন তাঁরই মুণ্ডপাত করে আবার সেই এনাটমি আর মড়ার হাড় বার করে মুখস্ত করতে বসে গেলাম। তিনজনে তিন তক্তাপোশে।

হাজারী বললে—দেখলেন তো ইংরেজদের কিম্বদন্তী? সব বোগাস্। ওসব ভাঁওতা কি এদেশে চলে? আমাদের মুনি-ঋষিরা যা বলে গেছেন, তা ওল্টানো বাবা ইংরেজ-ফিংরেজের কর্ম নয়। সেই কবে বলে গেছেন—প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে দাম্পত্য কলহে চৈব, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। দেখলেন, কেমন হাতে হাতে ফলে গেল? অক্ষরে অক্ষরে? মর্নিং শোজ্ দি ডে! ফুঃ!!

গ্রে সাহেবের লেখা এগারশ পাতার মোটা এনাটমি খুলে তিনজনে তিনটি মাথার খুলি হাতে নিয়ে বই দেখে মিলিয়ে পড়তে শুরু করলাম। মানুষের মাথার খুলি কি করে ঘাড়ের শিরদাঁড়ার ওপরে বসে আর ডাইনে-বাঁয়ে ইচ্ছেমত ঘোরে, তার কায়দাটা যেই কোনো প্রকারে কণ্ঠস্থ করেছি, অমনি নীচে কি যেন একটা গোলমাল শোনা গেল। চেঁচামেচি কিছু নয়। দোতলা থেকে ছেলেরা সব হুড়মুড় করে নীচে নাবছে বলে মনে হল। একতলার আজ হঠাৎ কি হল? পড়া ফেলে দৌড়ে ভেতরের বারান্দায় এসে নীচে তাকিয়ে দেখি একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে ঘিরে আমাদের মেসের ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে। সবাই খুব গম্ভীর। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। আমাদের পাশের ঘরের একটি ছেলে নীচে নেমে গিয়েছিল, তাকে ওপর থেকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে মশাই?

ছেলেটি আমাদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় চুপ করতে বলে নীচে নেবে আসতে বললে। এ আবার কি? এত চুপচাপ, ফিসফাসের কি হল?

চটপট নীচে নেবে গেলাম। শুনলাম, কি হয়েছে। একতলার চার নম্বর ঘরে ফার্স্ট ইয়ারের যে নতুন ছেলেটি মাসখানেক হল এসেছে, তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে কর্পোরেশনের এক পার্কে। আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই ভদ্রলোক খবর এনেছেন।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ফার্স্ট ইয়ারের এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়নি। কী নাম, কোথায় বাড়ি, কিছুই জানতাম না। দেখেছি ছেলেটির চেহারা খুব সুন্দর। ধবধবে ফর্সা রং, লম্বা-চওড়া জোয়ান। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া লম্বা চুল। ফুল বাবুটি সেজে থাকত। শুনেছি নতুন বিয়ে করেছে। কলকাতাতেই শ্বশুর বাড়ি। গিলেকরা চুড়িদার আদ্দির পাঞ্জাবি, আর তাঁতের মিহি ধুতি পরত। জামা-কাপড়ে বিলিতী দামী সেন্ট ব্যবহার করত।

মেসে ওকে বড়-একটা দেখতে পাওয়া যেত না। সারাদিন বাইরে

বাইরেই কাটাত। গভীর রাত্রে মেসে ফিরে প্রায়ই নাকি খেত না। শনি, রবি, এ দুদিন তো মোটেই মেসে ফিরত না। শ্বশুর বাড়ি থাকত। মেসের কারুর সঙ্গেও বিশেষ মিশত না। তাই ওর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল না। এবারে শনিবার মেস থেকে গিয়েছে। আজ মঙ্গলবার, এখনও মেসে ফেরে নি। এরই মধ্যে হঠাৎ আফিং খেতে গেল কেন?

যে ভদ্রলোক খবর এনেছিলেন, তিনি বললেন—রোজ ভোরে উঠে আমি ঘণ্টা দুই পায়ে হেঁটে বেড়াই। কোনোদিন হয়ত ময়দানে যাই, কোনো-দিন যাই অন্য কোনো পার্কে। ময়দান অথবা পার্কে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরে ট্রামে করে বাড়ি ফিরি। আজ মাইল দুই হেঁটে ঐ পার্কে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ দিকের কোণের ঝোপটার কাছে যেতেই শুনলাম বাগানের মালী চেঁচাচ্ছে—এদিকে শিগ্‌গির আসুন বাবু, খুন হয়েছে। গিয়ে দেখি, ঝোপের ভেতর ঘাসের ওপর এক ভদ্রলোক শুয়ে। চোখ বন্ধ, মুখে ফেনা। এক হাতে একখানা খাতা আর এক হাতে কলম। খাতায় নিজের নাম-ঠিকানা সব লেখা। নিজে হাতে লিখে গেছেন কোথা থেকে আফিং কিনে কখন খেয়ে কিভাবে আত্মহত্যা করলেন। ঐ ঠিকানা দেখেই বাড়ি ফেরবার পথে আপনাদের এই খবরটা দিতে পারলাম। বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে এই খবর দিতে গেলাম। আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একজন নতুন পাশ-করা ডাক্তার। সব শুনে বললেন—যে খবর নিয়ে এসেছে, সে কোথায়?

বললাম—সে তো খবর দিয়েই চলে গেছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—ওকে ছেড়ে দেওয়া আপনাদের ঠিক হয়নি। সঙ্গে নিয়ে থানায় যাওয়া উচিত ছিল।

বললাম—কর্পোরেশনের পার্কে সুইসাইড হয়েছে, ওরাই তো থানায় খবর দেবে। আমাদের উচিত ছেলেটার বাড়িতে খবর দেওয়া। ওর লোকাল গার্জেন কে?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের খাতা খুলে ওর শ্বশুর বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল। ২।৩ জন চলল সেখানে খবর দিতে, আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিয়ে আমরা রওনা হলাম ঐ পার্কে।

মেসের গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে ট্রামে উঠলাম। তখন কলকাতায় এত লোক ছিল না। ট্রামে এত ভিড় হত না। ট্রাম থেকে আমরা পার্কের কাছে এসে নামলাম। এই পার্কটা ছিল খুবই নির্জন। আজ দেখলাম বেশ লোক।

বড় রাস্তার গেট দিয়ে ঢুকে পার্কটা পার হয়ে দক্ষিণপূর্ব কোণে ছ ফুট উঁচু ক্রোটন দিয়ে ঘেরা বেশ বড় একটি কুঞ্জ। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা। কোণে একটি গ্যাসপোস্ট। গ্যাসের আলো কুঞ্জের ভেতরে পড়ে, কিন্তু ঘন ক্রোটনের বেড়া ভেদ করে বাইরে থেকে দেখা যায় না। ভেতরটা পুরু সবুজ ঘাসে ঢাকা। চার কোণায় চারটি ছোট রঙিন পাতা-বাহারের গাছ।

এই কুঞ্জের ভিতরে ছেলেটি ঘাসের ওপরে চিত হয়ে শুয়ে আছে। গায়ে সেই গিলে-করা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি। পরনে মিহি তাঁতের ধুতি। পায়ে ঝকঝকে কালো পাম্প-শু। মাথার নীচে নতুন কেনা গ্রে-র মোটা এনাটমি। বুকের উপর এক হাতে একখানা একসারসাইজ বুক, আর এক-হাতে একটি ফাউণ্টেন পেন। পাশে লেমনেডের একটা খালি বোতল আর একটি কাঁচের গ্লাস।

দেখলাম অমন সুন্দর ফর্সা রং এক দিনেই কেমন কালো হয়ে গেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। মাথার কোঁকড়া চুল উসকো-খুসকো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরিয়েছে। সে কি গাঁজলা! মুখ থেকে প্রায় ইঞ্চি ছয়েক বেরিয়ে ঘন হয়ে যেন মৌচাকের মত জমে আছে।

রাতে বৃষ্টি হয়নি, তাই এখনও তেমনি অক্ষত আছে। পিঁপড়ে সব সার বেঁধে চোখেমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখেই মনে হল অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছ।

তবু আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাছে গিয়ে ওর বুকে একবার স্টেথোসকোপ বসালনে। চোখের পাতা টেনে চোখের তারা দেখলেন। আঙুলের ডগা দিয়ে চোখের মণি ছুঁয়ে প্রাণের লক্ষণ খুঁজে দেখলেন। হাত পা টেনে দেখলেন শক্ত হয়ে গেছে। বললেন—চার পাঁচ ঘণ্টা আগেই মৃত্যু হয়েছে।

ছেলেটির বাঁ হাতের খাতায় লেখা আছে—

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly Importunate
Gone to his Death.

তারপর বাংলায় ওর নাম ঠিকানা তারিখ দিয়ে লিখেছে—আমার মৃত্যুর জন্য আমি নিজেই শুধু দায়ী। অন্য কেউ নয়। আমি নিজের ইচ্ছায় সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করলাম। কেউ হয়ত বলবে আমি ভীরু, কাপুরুষ, কেউ বলবে পাগল। তাদের সকলকে কলা দেখিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।

এ পৃথিবীতে আসা না আসার উপর আমার কোনো হাত ছিল না। কিন্তু এখানে থাকা না থাকা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। যতদিন ইচ্ছে থাকব, যখন খুশি চলে যাব, কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। ইচ্ছে থাকলেও এ পৃথিবীতে থাকা যায় না। মৃত্যু এসে বাগড়া দেয়। কিন্তু যাবার পথ সব সময় খোলা। যখন ইচ্ছে চলে যাব।

এতদিন বেশ ছিলাম, আজ হঠাৎ কেন চলে যাবার ইচ্ছে হল, তার নিশ্চয়ই একটা খুব জোর কারণ আছে। সেটা কি তা আমি বলব না। যার বোঝবার সে ঠিক বুঝবে।

অনেক দিন তো বেঁচে থাকলাম। আর বেঁচে কি হবে? শুনেছি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেলে খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়। আমি তা চাই না। তাই আফিং খেয়েছি। আফিংএ বেশ নেশা হয়। এখনই বেশ হচ্ছে। মনটা ভারি হালকা লাগছে।

কালীঘাট, ভবানীপুর, ধরমতলা, চিৎপুর, শ্যামবাজার সব জায়গার দোকান থেকে একটু একটু করে কিনে যে পরিমাণ আফিং আমি খেয়েছি, তাতে এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্টমাক পাম্প দিলে হয়ত বাঁচতে পারি। কিন্তু সে সুযোগ আমি কাউকে দেব না। তাই বেছে বেছে শহরের প্রান্তে জনহীন এই বিরাট পার্কের এমন নিরালা কুঞ্জটি খুঁজে খুঁজে বার করেছি। এনাটমিখানা মাথায় দিয়ে এই ঘাসের ওপর এমন আরাম করে শুয়ে গ্যাসের এই স্বল্প আলোয় কেমন চমৎকার নিজের কথা লিখতে পাচ্ছি। এখান থেকে গোঁ-গোঁ করলে অথবা চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না।

আফিং খেলে এত ভাল লাগে, মনে কোনো ক্ষোভ থাকে না, আগে জানলে কবে এটা খেয়ে দেখতাম। আজ আমার এই পৃথিবীতে কারো ওপর কোনো অভিমান নেই। কোনো নালিশ নেই। যারা আম'কে দুঃখ দিয়েছে, তাদের সবাইকে আজ এই মুহূর্তে আমি অনায়াসে ক্ষমা করতে পারছি।

এই পর্যন্ত বেশ লিখেছিলাম। আর লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। মিছিমিছি লিখে আর কি হবে? এইবার আমি ঘুমুবো। খুব ঘুম পাচ্ছে। হাই উঠছে। লিখতে ভাল লাগছে না। ইচ্ছেও হচ্ছে না। হাতেও কোনো জোর পাচ্ছি না।

এরপর আর লেখা নেই। হিজিবিজি কতকগুলো কালির আঁচড়। কোনো অক্ষর বোঝা যায় না। মানেও হয় না। কোনো স্বাক্ষরও নেই। শেষ

কথাগুলো বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে ফাঁক ফাঁক করে লেখা। আঁকাবাঁকা লিখতে লিখতে হাত অবশ হয়ে এক কোণে ঢলে পড়েছে। কলমের মুখে খাতার ওপর আঁকাবাঁকা দাগ পড়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ছেলেটা নিজের মনের কথা লিখে যেতে চেষ্টা করেছে।

আত্মহত্যার মৃত্যু এই প্রথম আমার নিজের চোখে দেখা। পরে কত মৃতদেহই না দেখেছি। গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া, জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া। পোস্টমর্টেম করে কত দেহের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে হয়েছে। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়েছে। ডাক্তার হতে হলে সব ছাত্রকেই এসব করতে হয়। কিন্তু তখন আমি মেডিক্যাল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে মাত্র উঠেছি। রোগ অথবা অপঘাত কোনো মৃত্যুই হাসপাতালে দেখিনি। তাই ঐ ছেলেটির এই মৃত্যু এবং ওর লেখা এই কথাগুলো এখনও আমার চোখে এত স্পষ্ট ভাসে।

আত্মহত্যা যারা করে, তাদের চেষ্টা থাকে কেউ যেন না বোঝে। টের না পায়। ধরে না ফেলে। তাই গোপনে নিজেকে তৈরী হতে হয়। প্রাণনাশের উপায় ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হয়। সংগ্রহ করতে হয়। সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়।

বি এস-সি যখন পড়তাম, তখন কলকাতার একটি ছেলে মফস্বলে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ভরতি হল। প্র্যাকটিকালে পাশ করা কলকাতায় তখন সহজ ছিল না। তাই ও কলকাতা ছেড়ে আমাদের হস্টেলে গিয়ে উঠল। চমৎকার স্বাস্থ্য। খুব ভাল বাঁশী বাজাত। ওর বাঁশী যারাই একবার শুনেছে জীবনে কখনও তা ভুলতে পারবে না। খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

আমাদের কলেজে কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরিতে তখন পটাশিয়াম সায়ানাইড একটা মুখ-ভাঙ্গা কাঁচের পেট মোটা বোতলে শেলফের নীচের তাকে খোলা পড়ে থাকত অন্য সব কেমিক্যালের সঙ্গে। সল্ট রিডিউস করবার জন্য যার যতটা খুশি ঐ সায়ানাইড ভাঙ্গা বোতল থেকে হাতের তেলোয় ঢেলে নিজের টেবিলে নিয়ে এসে আমরা রেখে দিতাম। যতটুকু দরকার ব্যবহার করে বাকিটা ফেলে দিতাম। জিনিসটা যে কি সাংঘাতিক বিষ, মানুষের দেহে ঢুকলে যে কত দ্রুত মৃত্যু ঘটাতে পারে, আমরা যেভাবে ওটা নাড়াচাড়া করতাম, তা দেখে কেউ কখনও তা ভাবতে পারত না।

হোস্টেলে সেই সময় কোত্থেকে একটা হুলো বেরাল এল। রাত্রে তো ডাকাডাকি চেঁচামেচি করতই, দিনেও ওর উৎপাতের সীমা ছিল না। ঘরদোর নোংরা করত। চায়ের দুধ খেয়ে যেত। দুধের পাত্র ভাল করে ঢেকে

ভারী কোনো বই দিয়ে চেপে না রাখলে ওর মুখ থেকে রক্ষা করা যেত না। তাই দেখে আমাদের বন্ধুটি ভীষণ রেগে গেল। বললে—ব্যাটাকে পটাশিয়াম সায়ানাইড খাইয়ে একদিন মারব। শুনে আমরা তামাসা ভেবে হেসেই উড়িয়ে দিলাম।

একদিন দুধের সঙ্গে সত্যি সত্যি ও সায়ানাইড মিশিয়ে রাখল। বেরালটা ঐ দুধ খেয়ে মরে গেল। ল্যাজ ধরে তুলে বেরালটাকে হাসতে হাসতে বাইরে নর্দমায় ফেলে দিয়ে এল। ওর এই নৃশংস কাণ্ড দেখে আমরা মর্মাহত হলাম। প্রতিবাদ করলাম।

শুনে ও শুধু হাসল। বলল—তোরা সব ল্যাবাকান্ত। স্রেফ মেয়ে-মানুষ! তোদের ভাল করলেও তোরা রাগ করিস।

সেদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথের 'এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা' গানখানা বাঁশীতে তুলে এমন দরদ দিয়ে ও বাজালো যে, আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওর উপর আর রাগ করে থাকা গেল না। আবার ভাব করে ফেললাম।

বি এস-সি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে মাসখানেক পরে একদিন কাগজে দেখি ও পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সায়ানাইডের শিশির গায় আমাদের কলেজের লেবেল মারা।

পরে শুনলাম, যে মেয়েটিকে ও ভালবাসত, তার সঙ্গে মেলামেশা ওর মা পছন্দ করতেন না। তাই নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে সেইদিন রাত্রে ছাদে গিয়ে চুপিচুপি এই কাণ্ড করেছে।

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় যদি এটা করে থাকে, তাহলে অত আগে এই বিষ কলেজ থেকে সংগ্রহ করে ও নিজের কাছে রেখেছিল কেন? এর উত্তর আজও আমি পাইনি।

আজ এই ছেলেটির লেখা পড়ে মনে হল ওর মনেও একটা ক্ষত ছিল। চিঠির কথার ফাঁকে ফাঁকে একটা লুকানো অভিমান ফুটি ফুটি করছে। যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু সে কে? শ্বশুর-বাড়ির কেউ কি?

এমনি সময় ছেলেটির শ্বশুরবাড়ির কয়েকজন ভদ্রলোক এসে পড়লেন। প্রথমটায় ওঁরা তো বিশ্বাসই করেননি যে, ছেলেটি এমন কাজ কখনও করতে পারে। আমাদের মেসের যে ছেলেরা খবর দিতে গিয়েছিল, তাদের অনেক রকম জেরা করে শেষে বললেন—এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই এ নামের অন্য কোনো লোক। আপনারা নিজের চোখে দেখে এসেছেন কি?

আমাদের ছেলেরা স্বীকার করলে যে, নিজের চোখে ওরা দেখে আসেনি সত্যি। একদল গেছে দেখতে। ওরা এসেছে এখানে। খবর দিতে।

শুনে ওঁরা বাড়িতে কিছু না ভেঙে নিজের চোখে দেখতে এসেছেন। এ দৃশ্য দেখে প্রৌঢ় মতন এক ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। শুনলাম ইনিই ছেলেটির শ্বশুর। ভদ্রলোক দুঃখ করে বলতে লাগলেন—দেখুন, কি সর্বনাশ আমার ও করে গেল। কত খোঁজখবর করে, কত রকম করে বেছে এত টাকা খরচ করে ভাল পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেখুন আমার কি হল। মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করলাম, মেসে রেখে মাস মাস কত টাকা খরচ হল, মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে কিছুই তা গ্রাহ্য করিনি। পরশু রাতে মেয়েটার সঙ্গে কি নিয়ে কথা-কাটাকাটি করে ঝগড়া বাঁধিয়ে চলে এসে যে এমন কাণ্ড করে বসবে কি করে তা বুঝব বলুন দেখি?

ভদ্রলোককে আমরা আর কি বোঝাব? সামান্য দাম্পত্য কলহে যে সত্যি সত্যি এমন সাংঘাতিক পরিণতি হতে পারে, কজনই বা তা আগে দেখেছে? এ দেখলে কি আর অত সহজে কেউ বলতে পারত বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া?

হঠাৎ এক ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে এসে বললেন—এখানে নাকি আফিং খেয়ে কে পড়ে আছে? কোথায় সে?

ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অচেনা। আমরাও চিনি না, ছেলেটির শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও না। কথার ধরন যেমনি উদ্ধত, তেমনি রূঢ়। এই পরিবেশে নিতান্ত অশোভন বলে মনে হল। বেশ একটু বিরক্ত হয়েই ছেলেটিকে দেখিয়ে বললাম—ঐ দেখুন, ৪।৫ ঘণ্টা আগেই মৃত্যু হয়েছে।

শুনে ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি হল। চটে উঠলেন। যেন চ্যালেঞ্জ করে বললেন—কে বলেছে মৃত্যু হয়েছে?

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—কেন? ডাক্তার দেখে বলে গেছে।

ভদ্রলোকের মুখে এবার বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল। ঠেস দিয়ে বললেন—ওঃ, আপনাদের ডাক্তার? মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা? আফিং খাওয়ার ওরা কি জানে? কতটুকু বোঝে? সব গো-মুখ্যু। গো-বদ্যি। আফিং খেয়ে অমন মড়ার মত কতদিন লোকে পড়ে থাকতে পারে, তা জানেন? এর চিকিচ্ছে জানে শুধু চীনেরা। দাঁড়ান, আমি এক্ষুণি বউবাজার থেকে একজন চীনে ডাক্তার নিয়ে আসছি। তখন দেখবেন আফিং খাওয়ার চিকিচ্ছে কাকে বলে। বলেই ভদ্রলোক যেমন হড়বড় করে এসে-

ছিলেন, আবার তেমনি ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন। বলে গেলেন—আমি ট্যাক্‌সি করে যাব আর আসব।

দেখে আমরা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ছেলেটির শ্বশুর-মশাই বিলাপ বন্ধ করলেন। এর ওর মুখ চেয়ে দেখতে লাগলেন। মনে হল হঠাৎ যেন ক্ষীণ আশার ক্ষীণতর একটু আলো কোথাও দেখতে পেলেন।

শহরের এক প্রান্তে এই পার্ক। ট্যাক্‌সি করে বৌবাজার যাতায়াতেও তখনকার দিনে কম নয়। অনেক খরচ। অথচ ভদ্রলোক কেন গায়ে পড়ে নিজের মাথায় এ ভার নিলেন, কেউ বলতে পারল না।

দেখতে দেখতে কথাটা চারদিকে রটে গেল যে, চীনে ডাক্তার এসে আফিং খাওয়া মরা মানুষ বাঁচাবে। কোথা থেকে দলে দলে লোক এসে এই নির্জন পার্কে ভিড় জমিয়ে তুলল।

এতক্ষণে থানা থেকে দারোগাবাবু একজন কনস্টেবল নিয়ে হাজির হলেন। মালির জবানবন্দী নিয়ে ছেলেটিকে দেখে ওর শ্বশুরমশাইকে বললেন—আপনি আমার সঙ্গে চলুন। একে তো এখন পুলিস মর্গে পাঠাতে হবে। পোস্ট মর্টেম না হলে আপনারা বডি পাবেন না।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন—দয়া করে একটু সময় দিতেই হবে। এক ভদ্রলোক চীনে ডাক্তার ডাকতে গেছেন। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। ডাক্তার এসে দেখে যান, তারপর যা করবার সব করবেন।

দারোগাবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—ডাক্তার এসে এখন আর কি করবে? স্পষ্টই তো দেখা যাচ্ছে এটা একটা সুইসাইড। বেঁচে থাকলে আমরাই আগে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতাম।

ভদ্রলোক বললেন—তবু উনি একবার এসে দেখে যান। আপনি এই সময়টুকু দয়া করে আমায় দিন।

দারোগাবাবু বললেন—বেশ, আপনি তাহলে এখান থেকে সোজা থানায় যাবেন। আমি না ফেরা পর্যন্ত একটু বসবেন। একটা এনকোয়ারী সেরেই আমি যাচ্ছি।

বলে কনস্টেবল নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

দারোগাবাবু যাবার পর আরও আধ ঘণ্টা প্রায় কেটে গেল। সেই ভদ্রলোক অথবা চীনে ডাক্তার কেউ আর আসে না। বসে বসে লোকে রেগে

গেল। বিরক্ত হয়ে উঠল। কেউ বলতে শুরু করলে—বোগাস। কেউ বললে—পাগল। একটি দুটি করে লোক আবার ফিরে যেতে লাগল। ভিড় কমে গেল।

আমাদেরও করবার আর কিছুই ছিল না। ওদিকে কলেজে যেতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরাও উঠে পড়লাম। পার্কটা পার হয়ে বড় রাস্তার গেট্‌টার কাছে আসতেই দেখি একটা ট্যাক্‌সি এসে থামল। ট্যাক্‌সি থেকে সেই ভদ্রলোক নাবলেন। সঙ্গে চীনে ডাক্তার।

চীনে ডাক্তারটির চেহারা দেখে ডাক্তার বলে চেনা যায় না। চীনে সায়েব বলে মনে হয়। তখনকার দিনে চীনে সায়েব রাস্তায় ঘাটে সর্বদা যেমন দেখা যেত সে রকম। মাথায় শোলার টুপি। পরনে সস্তা ময়লা কোট প্যাণ্ট।

ভদ্রলোক ট্যাক্‌সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে 'কুলী, কুলী' বলে ডাকতেই দুটো মুটে এগিয়ে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে আফিং-এর চিকিৎসার সব সরঞ্জাম বার করা হল। দুটি কালো স্টিলের ট্রাঙ্ক, একটি প্রকাণ্ড হুঁকোর নল। পেঁচিয়ে গোল করে রাখা। একটা দু-হাত লম্বা স্টেথোস্‌কোপ। আর গাড়ির পেছনে কেরিয়ারে দড়ি দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড দুটি তামার হাঁড়ি। হাঁড়ি দুটোর মুখ খুব বড়। বিয়ে-বাড়িতে পোলাও যে-রকম হাঁড়িতে রাঁধে অনেকটা সে-রকম। কিন্তু পেতলের নয়। তামার।

এই সব সরঞ্জাম দুটো মুটের মাথায় চাপিয়ে ভদ্রলোক সাহেবকে নিয়ে পার্কের মধ্যে ঢুকলেন। হন্‌হন্‌ করে চলতে লাগলেন। ভদ্রলোক আগে, তার পিছনে চীনে সায়েব এবং তার পেছনে ঐ দুটি মুটে। সবার পেছনে আমরা।

আবার পার্ক পেরিয়ে আমরা ঐ কুঞ্জটির কাছে এলাম। ভদ্রলোককে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ছেলেটির শ্বশুরমশাই হাত তুলে নমস্কার করলেন। তাড়াতাড়ি সায়েবকে কুঞ্জের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

সায়েব ছেলেটিকে একবার দেখে ওর একখানা হাত তোলবার চেষ্টা করে ছেড়ে দিল। মুখ ফিরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ভদ্রলোককে বললে—উও তো মর্‌ গ্যয়া।

বলেই পার্কের মধ্য দিয়ে হন্‌হন্‌ করে গেটের দিকে রওনা হল। এইবার ভদ্রলোক কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। একবার চীনে সায়েবের দিকে, একবার ছেলেটির দিকে আর একবার ঐ মুটে দুটির দিকে তাকাতে লাগলেন। সায়েবকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে দেখে অবশেষে

নিজের বিহ্বল ভাব কাটিয়ে মুটে দুটিকে নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে চীনে সাহেবের পিছন পিছন ধীরে ধীরে রওনা হলেন।

আমরা আবার হতভম্ব হয়ে ঐদিকে তাকিয়ে রইলাম। আফিং খাওয়ার চীনে চিকিচ্ছে আর দেখা হল না।

॥ ৯ ॥

কলকাতায় তখন ব্ল্যাক-আউট। আমি এ আর পি-র ডাক্তার। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকেল ৪টে থেকে রাত ৮টা ডিউটি। নামেই ডিউটি। আসলে কোনো কাজ নেই। ৪২ সালের শেষে এবং ৪৩ সালের প্রথমে গোটাকয়েক বোমা ফেলে জাপান আর হামলা করেনি। সে হিম্মতও বুঝি আর নেই। তাই আমাদের মহড়া দেওয়ার কাজও ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে। মনে হচ্ছে হিটলারের দিনও সত্যি ঘনিয়ে এসেছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার ফার্স্ট এইড পোস্ট থেকে বেরিয়ে হিন্দুস্থান বিল্ডিংএর উল্টোদিকে কফি হাউসে ঢুকে এক কাপ হট্ কফি আর এক প্লেট ডো-নাট-এর অর্ডার দিয়ে বসতেই দেখি পাশের টেবিলে খাকী পোশাক-পরা অ্যামেরিকানদের মাঝ থেকে সিভিল স্যুট পরা এক ভদ্রলোক উঠে এসে আমার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে বললেন—এই যে ডাক্তার! চিনতে পাচ্ছেন?

দেখলাম চেনা সত্যি খুব কঠিন। গায়ে ঝক্‌ঝকে গ্যাবারডিনের স্যুট. পায়ে কার্সবার্সন এণ্ড হারপারের বিলিতি জুতো। গলায় সিল্কের ঝলমলে টাই। হাতে ফাইভ-ফিফ্‌টি ফাইভ সিগারেটের টিন। এ হেন পোশাকের আলট্রা স্মার্ট লোককে আমি চিনব কি করে?

বললাম—সত্যি চিনতে কষ্ট হচ্ছে। এই দুর্মূল্যের বাজারে এমন পোশাক? রাতারাতি আলাদীনের বাতি পেলেন নাকি?

ভদ্রলোক বললেন—যুদ্ধ বেধে তাই সত্যি পেয়েছি। নইলে শহরে বোমা পড়ল আর আমার ব্যাঙ্কে টাকা জমে উঠল কি করে? দেশে দুর্ভিক্ষ হল, আমার একাউণ্ট আরও বেশী ভারী হল। যেই একটা করে গোলমাল হচ্ছে, অমনি বাড়তি কিছু কিছু জমছে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—বলেন কি? প্রফেসরী করে এত টাকা?

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে বললেন—আপনি দেখছি সব ভুলে গেছেন। মাস্টারী তো ছেড়েছি সেই যুদ্ধের আগে। চার-পাঁচ বচ্ছর

হয়ে গেল। দেখুন কি আশ্চর্য, আমিও একদিন ছেলে পড়িয়েছি।

এই প্রভঞ্জন সত্যি একদিন বলেছিল, প্রফেসরী ওর লাইন নয়। হোক না ও ফিজিক্সের ফার্স্ট ক্লাস এম এসসি; কি রিসার্চ স্কলার। ওর লাইন হাইকোর্ট-বার। তাই দিনেরবেলা একটা কলেজে ফিজিক্স পড়াত আর রাতে ল-কলেজে আইন শিখত।

বললাম—হাইকোর্টে তাহলে খুব জমিয়েছেন বলুন।

শুনে প্রভঞ্জন যেন খুব কৌতুকবোধ করল। ঠাট্টার হাসি হেসে বলল—আরে ছোঃ! হাইকোর্টে এখন আর রস নেই। এই ডামাডোলের বাজারে কে যাবে মামলা করতে? তাই বার ছেড়ে এখন গভর্নমেণ্টের ওয়ার এফার্টে হেল্‌প করছি।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—প্রফেসরী ছেড়ে শেষে যুদ্ধের কন্‌ট্রাক্টর? গর্বের হাসি হেসে প্রভঞ্জন বললে—ঠিক ধরেছেন! এইটেই আমার ঠিক লাইন।

বললাম—আপিস কোথায়?

প্রভঞ্জন বললে—এইখানে। এই কফি হাউসে। এখানে বসেই অর্ডার ধরি। এখান থেকেই সাপ্লাই করি। এইটেই আমার আপিস।

বললাম—কি রকম?

প্রভঞ্জন বললে—সে অনেক কথা। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল হল। কিছুদিন থেকেই আমার স্ত্রীর শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। কাজ নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত থাকি। ডাক্তার বদ্যি করবার সময় পাই না। চলুন আপনাকে একবার দেখিয়ে আনি। যেতে যেতে সব বলছি।

হাতে কোনো কাজ ছিল না, প্রভঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে শ্যামবাজারের দিকে চললাম।

প্রভঞ্জন বললে—আমাদের বাড়িতে তো আপনি গেছেন, সেই বাড়িতেই আছি এখনও। তিনখানা মাত্র ঘর। আগে তাতেই বেশ চলে যেত। এখন বাবা-মা আছেন। ছোট ভাই আছে। মোটে কুলুচ্ছে না। শিগ্‌গিরই এটা ছাড়তে হবে। ভাবছি দমদমের দিকে আমার ফ্যাক্টরীর কাছে চলে যাব।

বললাম—ওদিকটা এখনও এত ঘিঞ্জি হয় নি। বেশ খোলামেলা। বাচ্চাদের খেলবার খুব সুবিধে হবে।

প্রভঞ্জন বললে—বাচ্চা কোথায় যে খেলবে?

বললাম—সে কি? হাসপাতালে অপারেশনের মাস কয়েক পরেই না একদিন বললেন বাচ্চা হবে?

প্রভঞ্জন বললে—হল আর কই? পাঁচ-ছ মাসেই আবার সব ঠিক হয়ে গেল। ভাবলাম ভালই হয়েছে। ঝঞ্ঝাট মিটেছে। কিন্তু সেই থেকেই দেখছি ওর শরীরটা কেমন যেন আর সারল না।

বল্‌লাম—কেন? চিকিৎসা করান নি?

প্রভঞ্জন বললে—যতদিন প্রফেসরী করেছি চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করি নি। নিজেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম। ওষুধ এনে দিতাম। ব্যবসায় নেবে আর সে সময় পাই না। বাবা মাঝে মাঝে শুনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ওষুধ আনেন। কিন্তু চিকিৎসা কিছু যে হয়, তা মনে হয় না। তাই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

শ্যামবাজারের কাছে গলির ভেতর প্রভঞ্জনের বাসা। পুরনো বাড়ি। এই ৫।৬ বছরে যেন আরও পুরনো দেখাচ্ছে। দেয়ালে চুনবালি জায়গায় জায়গায় খসে পড়েছে। ভিতরে এখানে ওখানে উই ধরেছে।

প্রভঞ্জন ভেতরে ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। বললে—একটু বসুন। আমি ওকে ডেকে আনছি।

দেখলাম, ঘরে আসবাবপত্র আগে যা ছিল, তাই প্রায় আছে। শুধু ফিজিক্স-এর বইগুলি এক কোণে একটা তাকে আবর্জনার মত পড়ে আছে। টেবিলের ওপর নতুন কেনা বালজাকের ড্রোল স্টোরীস্, আর ইংরেজি কামসূত্র।

পাশের ঘর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে প্রভঞ্জন ফিরে এল। দেখলাম এই ক-বছরেই ওর স্ত্রীর চেহারা অনেক ভাল হয়েছে। সুশ্রী হয়েছে। নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম।

প্রভঞ্জন বললে—ইনিই আমার স্ত্রী—মালা। আপনার সঙ্গে তো পরিচয় আছেই। যা জানবার সব জিজ্ঞাসা করুন। পরীক্ষা করুন। আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে নি।

প্রভঞ্জন চলে গেলে মালাকে জিজ্ঞাসা করলাম—বলুন আপনার কি কষ্ট?

মালা হেসে বললে—কষ্ট আবার কোথায়? বেশ তো আছি। চেহারা দেখে কি আমাকে রুগী রুগী লাগছে?

বললাম—তা লাগছে না সত্যি। কিন্তু আপনার কর্তা যে বললেন, অনেকদিন থেকেই আপনার শরীর ভাল যাচ্ছে না?

মালা বললে—সেটাও ওঁর একটা খেয়াল। মাঝে মাঝে হঠাৎ খেয়াল হয় আমার চিকিৎসার দরকার। দু-চার দিন হৈ-চৈ করেন। তারপর আবার ভুলে যান। ও কিছু না। এইবারে বলুন আপনার ছেলেমেয়েরা সব কোথায়? কত বড় হল?

বুঝলাম, মালা নিজের অসুখের কথা এড়িয়ে যেতে চায়। আমার কথা তুলে নিজের কথা চাপা দিতে চায়। ওর কথার জবাব দিয়ে বললাম—এখন তো আর টাকার অভাব নেই; তবু এই নোংরা গলির এই ঝরঝরে বাড়িটায় যে পড়ে আছেন? বালীগঞ্জের দিকে একটা বাড়ি নিন না?

মালা বললে—সে আর হল না। দমদমের দিকে ওঁরা একটা বাগানবাড়ি নিয়েছেন। ফ্যাক্টরী করেছেন। সেইখানেই বোধ হয় যাওয়া হবে। এই যে আমার শ্বশুরমশাই এসেছেন।

৬০।৬৫ বৎসরের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে এলেন। মালা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—ইনিই সেই ডাক্তারবাবু। ওঁদের হাসপাতালেই সেবার আমার অপারেশন হয়েছিল।

ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে খাটে বসে বললেন—আপনি সেবার বৌমার জন্য অনেক করেছেন। তারপর আপনার কত খোঁজ করেছি। কিন্তু ঠিকানা পাই নি। যাক্, আপনি যখন এসেছেন, তখন আমার আর ভাবনা নেই। কি কি চিকিৎসা হয়েছে, সব আমার কাছে লেখা আছে। একটু বসুন, আমি নিয়ে আসছি।

ভদ্রলোক উঠে যেতেই মালা বললে—এইবার আপনি রোগের ফিরিস্তি শুনুন। আমি আপনার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি।

বাধা দিয়ে বললাম—আজকে থাক্। আর একদিন হবে। এক্ষুনি কফি খেয়ে আসছি কফি-হাউস থেকে। সেইখানেই আপনার কর্তার সঙ্গে দেখা হল।

মালা বললে—ঐ কফি-হাউসই ওঁর এখন সব। ঐখানেই শুনি ওঁকে পাওয়া যায়।

ওর শ্বশুরমশাই একটা ফাইল নিয়ে ফিরে এলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন—এই দেখুন সেবার আপনাদের হাসপাতালের চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যা কিছু পরীক্ষা হয়েছে, প্রেস্ক্রিপশন হয়েছে, সব এতে গাঁথা আছে।

দেখলাম, হাসপাতালে কিউরেট করে ছেড়ে দেবার সময় যে টনিক দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে কোথায় কবে সর্দির জন্য ভিক্স কেনা হয়েছিল

সব ক্যাশ-মেমো এবং প্রেস্ক্রিপশন রয়েছে। একটা একটা করে উল্টে দেখে মনে হল মালার কথাই ঠিক। মাঝে মাঝে হঠাৎ কয়েকদিন খুব ডাক্তার ওষুধ করা হয়েছে—আবার অনেকদিন কিছুই করা হয় নি। বিশেষ কোনো রোগের চিকিৎসাও যে হয়েছে, তা মনে হল না।

ভদ্রলোক বললেন—এইবার আপনি বৌমার একটা থরো ট্রিটমেণ্ট করুন। আজকাল শুনেছি হরমোন ট্রিটমেণ্টে নাকি খুব কাজ হয়?

বললাম—তা হয়। কিন্তু তার আগে একজন বিশেষজ্ঞকে দেখান দরকার। অনেকদিন আগে কিউরেট হয়েছে। আর একবার ভাল করে দেখা প্রয়োজন।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ। আপনার হাতেই রুগী তুলে দিলুম। যা করা ভাল তাই করুন। কাকে দেখাবেন?

এক বন্ধুর নাম করে বললাম—কাল বিকেলে ৫টায় ওঁর চেম্বারে নিয়ে যাবেন। ওঁকে দেখিয়ে কি করা দরকার, সব ঠিক করা যাবে।

এমনি সময় প্রভঞ্জন স্নান করে পোশাক বদলে ফিরে এল। এইবার কালো প্যাণ্ট, সাদা কোট। বললে—বেশ তাই কথা রইল। চলুন আমিও একটু বেরুব।

মালা বললে—সে কি? রাতে খাবে না?

প্রভঞ্জন বললে—না। বোধ হয় খেয়েই ফিরব। আমার খাবারটা ঢেকে রেখ। হয়ত অনেক রাত হবে। তুমি খেয়ে নিও। আমার জন্য বসে থেক না যেন।

দেখলাম মালার মুখখানা হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নমস্কার করে প্রভঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে প্রভঞ্জন ট্যাক্সিতে উঠে আমার পকেটে একটা আঠা দিয়ে আঁটা খাম গুঁজে দিল। বললে—এটা একটু প্রাইভেট। বাড়ি গিয়ে খুলে দেখবেন। তারপর রুগী কেমন দেখলেন?

বললাম—বেশ ভাল। চেহারা অনেক সুন্দর হয়েছে।

প্রভঞ্জন হেসে উঠল। বললে—না না, তা বলি নি। রোগ কি রকম তাই বলুন।

বললাম—ওঁর রোগ জানবার আগে আপনার কি রোগ, তাই যে জানতে হয়।

প্রভঞ্জন বললে—আমার তো কোনো রোগ নেই। অনেকবার রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি। কখনও কোনো দোষ পাওয়া যায় নি।

বললাম—কাল আপনার স্ত্রীকে বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করুন আগে; তারপর যদি প্রয়োজন হয় আপনাকেও একবার পরীক্ষা করতে হবে। রাজী তো?

প্রভঞ্জন বললে—নিশ্চয়। যা বলবেন তাই হবে।

ট্যাক্সি আমার বাসার কাছে এসে গেল। আমি নেবে গেলাম। বাড়ি এসে পকেট থেকে জিনিসপত্র সব বার করে টেবিলের ওপর রাখতেই প্রভঞ্জনের দেওয়া খামটা বেরুল। খুলে দেখি একখানা দশ টাকার নোট।

পরদিন বিকেলে সেই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বন্ধুটির চেম্বারে গেলাম। মালা আর তার শ্বশুর বসে আছেন দেখলাম। মালাকে ভাল করে পরীক্ষা করে আমাকে আড়ালে ডেকে বন্ধুটি বললেন—এ'র কোনো দোষ আছে বলে তো মন হচ্ছে না। ওঁর স্বামীকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন। ওঁদের দুজনের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। সে রকম মিল বোধ হয় নেই। স্বামীকে পরীক্ষা করলেই কেন সন্তান হচ্ছে না, বোঝা যাবে মনে হয়।

চেম্বার থেকে বেরিয়েই মালার শ্বশুর বললেন—কি বললেন ডাক্তার?

বললাম—আপনার বৌমার শরীর বেশ ভাল আছে। কোনো দোষ নেই।

ভদ্রলোক যেন একটু হতাশ হলেন। বললেন—তবে?

একটু হেসে মালা বললে—দেখলেন তো আমি আগেই বলেছি আমার কোনো অসুখ নেই।

বললাম—কর্তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন কাল। বলবেন, বিশেষ দরকার। মালা বললে—বলব। কিন্তু উনি আসবেন কি? বললাম—ঠিক আসবে। কথা দিয়েছে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে এ'দের তুলে দিয়ে আমার পোস্টে ফিরে এলাম। তারপর রোজ ভাবি প্রভঞ্জন আসবে, কিন্তু ওর আর কোনো পাত্তা নেই। কফি-হাউসেও ওকে দেখতে পেতাম না। একদিন দুপুরবেলা কফি-হাউসে গিয়ে দেখি খুব স্মার্ট একটি মেয়ের সঙ্গে কোণের টেবিলটি দখল করে খুব কাছাকাছি বসে হেসে হেসে গল্প করছে। মেয়েটি দেখতে বেশ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কোঁকড়া চুল। ঠোঁটে নখে রং। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। প্রভঞ্জন দেখেও যেন আমাকে চিনল না। মেয়েটির পাশে বসে আমার দিকে চেয়ে এইবার যেন একটু হাসল। উঠেও এল না। ওর টেবিলে যেতেও ডাকল না। খুব রাগ হল। অপমান বোধ হল। বেরিয়ে এলাম।

তারপর কয়েক মাস চলে গেল। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হল। হিটলারের পতন হল। ভয় হল জাপানও বোধ হয় এবার খতম হবে। আমাদের চাকরি যাবে।

এমনি সময় একদিন বিকেলে আমার ফার্স্ট এইড পোস্টে বসে আছি, সেলাম করে একটি লোক একখানা চিঠি দিল। খুলে দেখি প্রভঞ্জনের চিঠি। লিখেছে ওর স্ত্রীর খুব অসুখ। ড্রাইভারকে পাঠাচ্ছে যেন এক্ষুনি ওর সঙ্গে চলে আসি।

ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গাড়ি শ্যামবাজার পার হয়ে টালার দিকে চলল। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাচ্ছ?

হিন্দুস্থানী ড্রাইভার বললে—সাহেবের কুঠি।

বললাম—সেটা কোথায়?

ড্রাইভার বললে—টালা।

টালা পার্কের কাছে নতুন একখানা একতলা বাড়ির গেটে গাড়ি ঢুকলো। গাড়ির শব্দ পেয়ে প্রভঞ্জন বেরিয়ে এল। ড্রয়িং-রুমে নিয়ে বসাল। নতুন বাড়ি, নতুন সোফা-সেটি দিয়ে সাজান। ঝকঝকে তকতকে। খুব ভাল লাগল। বললাম—বাঃ সুন্দর সাজিয়েছেন তো? মালা দেখছি টালাকেও বালিগঞ্জ করে তুললেন।

প্রভঞ্জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি আবার বিয়ে করেছি। এঁর নাম ছন্দা। মাস তিনেক হল এ বাড়িটায় এসেছি। চলুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। অবাক হয়ে প্রভঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। ড্রইং-রুমের পাশেই শোবার ঘর। প্রভঞ্জনের পিছু পিছু ঢুকে দেখি কফি-হাউসে-দেখা সেই মেয়েটি খাটে শুয়ে আছে। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। হাত তুলে নমস্কার করল।

প্রভঞ্জন বললে—ইনিই আমার স্ত্রী। সিভিল ডিফেন্সের একজন বড় অফিসার।

ছন্দা একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললে—বসুন।

বললাম—আপনার কষ্ট কি?

ছন্দা বললে—কয়েকদিন থেকেই পেটে কি রকম একটা ব্যথা হচ্ছে। গা গুলোচ্ছে। আজ তো সারাদিন কিছুই খেতে পারিনি। যা খাচ্ছি তাই উঠে আসছে। বমি হচ্ছে।

পরীক্ষা করে মনে হল অসুখ কিছু নয়। সন্তান সম্ভাবনার প্রথম লক্ষণ।

বললাম—এই সময়ে অনেকেরই এরকম হয়। ভয়ের কিছু নেই। একটা পাউডার লিখে দিচ্ছি ঘণ্টায় ঘণ্টায় একটা করে খাবেন। কাল থেকে গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দেব। সাত দিনেই সেরে উঠবেন।

ঘর থেকে বেরুতেই প্রভঞ্জন বললে—ভয়ের কিছু নেই তো? বড় কাউকে দেখাবেন?

বললাম—আমি তো ভয়ের কিছু দেখছি না। তবু বড় ডাক্তার দেখিয়ে রাখা সব সময়েই ভাল। বলুন কাকে দেখাতে চান।

প্রভঞ্জন বললে—আমি কাউকেই চাই না। আপনি যদি দরকার মনে করেন যাকে ইচ্ছে দেখাবেন। টাকার জন্য ভাববেন না।

বললাম—বেশ তাই হবে। কয়েকদিন গ্লুকোজ দিয়ে দেখি। যদি না কমে তখন না হয় দেখানো যাবে। কি বলেন?

প্রভঞ্জন হেসে বললে—সেই ভাল। এইবার বুঝলেন তো আমার কোনো অসুখ নেই? কাল কখন আসবেন?

বললাম—ধরুন, বেলা এগারটা নাগাদ যদি আসি?

প্রভঞ্জন বললে—খুব ভাল। আমাকে আপিসে ছেড়ে গাড়ি আপনাকে তুলে নিয়ে আসবে। আমি বাড়ি থাকব না, কিন্তু তাতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার ভাই নিরঞ্জন থাকবে। যা দরকার সব ব্যবস্থা করে দেবে।

'তাই হবে' বলে গাড়ি করে ফিরে এলাম। ফেরার পথে শ্যাম-বাজারের কাছে প্রভঞ্জনের সেই পুরনো বাড়ির গলিটা পড়ল। মালার কথা জানবার জন্য মনটা অস্থির ছিল; ড্রাইভারকে বললাম—এই গলির ভেতর তোমার সায়েব আগে থাকত। জান সে কথা?

ড্রাইভার বললে—জী, হাঁ। এখনও সে কুঠিতে সায়েবের বাবা, মা, বড়ামাইজী আর ছোটা সাব থাকেন।

যাক মালা তাহলে এখনও বেঁচে আছে। মনটা অনেক হালকা হয়ে গেল।

পরদিন বেলা এগারটায় আবার প্রভঞ্জনের বাড়ি গেলাম। আজ দেখলাম ছন্দা অনেকটা ভাল। কালকের মত আজও খাটে শুয়ে। পাশে নিরঞ্জন রুগীর হাত ধরে বসে। আমি যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন?

ছন্দা বললে—আপনার অষুধ খেয়ে বমি আর হয়নি। কিন্তু সকাল থেকেই মাথাটা খুব ঘুরছে।

বললাম—গ্লুকোজ নিন। অনেক ভাল লাগবে।

ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে উঠে এলাম। রোজ এগারটায় গাড়ি আসে। গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আসি। ৪।৫ দিনেই ছন্দা সেরে উঠল। একদিন বললে—এইবারে আপিসে যাব?

বললাম—আরও দিন তিনেক রেস্ট নিন। ইন্‌জেক্‌শন দিই। তারপর যাবেন।

পরদিন গিয়ে দেখি ওদের শোবার ঘর বন্ধ। দরজায় টোকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে নিরঞ্জন দরজা খুলে বলল—ওঃ আপনি? আসুন আজ সকাল থেকেই ও'র শরীরটা ভাল নেই।

দেখলাম ঘরের চেহারা বদলে গেছে। খাট বার করে মেঝেতে গদি পেতে বিছানা হয়েছে। তাকিয়া বালিশ সব এদিক ওদিক ছড়ানো। ছন্দা এলোমেলো পোশাকে শুয়ে আছে। বললাম—কি ব্যাপার? আবার শরীর খারাপ হল কেন?

মুচকি হেসে ছন্দা বললে—কি জানি? দেখুন কি হল। বলে হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

নাড়ী দেখলাম খুব দ্রুত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাতের আঙুল ঠাণ্ডা নয়। গা গরম। চোখের মণি দুটি বড় হয়ে বেশ জ্বলজ্বল করছে। বললাম—ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছি। ঠিক হয়ে যাবে। এখন খেতে পাচ্ছেন একটু একটু?

ছন্দা বললে—হ্যাঁ, আজ চা টোস্ট ডিম দেখেছি।

বললাম—আর দিন দুই পরেই আপিস করতে পারবেন।

ছন্দা বললে—একটা সার্টিফিকেট দিন তো লিখে। নিরুর হাতে পাঠিয়ে দিই।

নিরঞ্জন কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে—আমাদের একই আপিস। সিভিল ডিফেন্স। বড় সাহেবকে বলা আছে. লিভার খারাপ হয়ে অসুখ হয়েছে। ঐ রকম যদি কিছু একটা লিখে দেন তাহলে ভাল হয়।

গ্যাস্ট্রাইটিস্ বলে সার্টিফিকেট লিখে দিলাম। তারপর আরও দিন দুই ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে ছন্দাকে বললাম—এখন ক্ষিদে হবে খুব। একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করবেন।

মাসখানেক পরে একদিন দুপুর বেলা বাড়ি ফিরে যেই খেয়ে উঠেছি,

অমনি প্রভঞ্জনের ড্রাইভার এল। বললে—বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে। এক্ষুনি যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ড্রাইভার বললে—সাব মেমসাব দুজনেই বিষ খেয়েছে।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললাম—কি খেয়েছে?

ড্রাইভার বললে—আফিং। সাহেব বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। মেমসাবও বোধহয় এতক্ষণে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আপনি শিগগির চলুন।

বিষ খাওয়ার কেস্। ডাক্তারের অনেক ঝামেলা। আত্মহত্যা হতে পারে, আবার খুন হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই এই সব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল।

বললাম—এখানে না এসে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে না কেন?

ড্রাইভার বললে—মেমসাব বললেন, জলদি আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনি চলুন। গিয়ে যা ভাল হয় করুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—সাহেবের বাবা-মাকে খবর দিয়েছ?

ড্রাইভার বললে—না। আপনার কাছেই মেমসাব আগে পাঠালেন।

বুঝলাম আত্মহত্যার চেয়ে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই প্রবল হয়েছে। তাই ডাক্তারের খোঁজ পড়েছে সকলের আগে। কিন্তু বাড়িতে আফিং খাওয়ার চিকিৎসাও কি সহজ? স্টমাক্-পাম্প দিতে হবে। রুগীকে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে। কৃত্রিম উপায়ে বুকে পিঠে চাপ দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালাতে হবে। দু দুজন রুগী। আমি একা সামলাব কি করে? হাসপাতালে এই রকম জোড়া কেস এলে আমরা চারজন ডিউটির ছাত্র হিমসিম খেয়ে যেতাম। এখন একা কি করব?

কাছেই আমার এক বন্ধুর বাসা। ভাবলাম এঁকেও সংগে নিয়ে যাই। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে ব্যাগ নিয়ে গাড়ি করে বন্ধুর বাড়ি গেলাম। বন্ধু বললেন—এসব কেস্ হাতে নেওয়ার অনেক রিস্ক। শেষটায় বিপদে পড়বেন না তো?

বললাম—এরা আমার চেনা লোক। কোনো বিপদ হবে বলে মনে হয় না। আর সে রকম বুঝলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব। এর বাবা-মাকে খবর দেব।

বন্ধু বললেন—তাহলে চলুন। আপনি ততক্ষণে গাড়ি করে একটা স্টমাক্-পাম্প কিনে আনুন। আমি তৈরী হয়ে নিই।

গাড়ি করে বেরিয়ে আশেপাশে বড় দোকানে কোথাও স্টমাক্-পাম্প পাওয়া গেল না। যুদ্ধের বাজার। আমদানী বন্ধ। ফিরে এলাম।

বন্ধু ততক্ষণ তৈরী হয়ে নীচে নেবেছেন। বললেন—এক বাড়িতে কিছুকাল আগে টাইফয়েডের সময় নাক দিয়ে খাবার দেওয়ার জন্য একটা স্টমাক্-টিউব কিনিয়েছিলাম। ওরা যত্ন করে তুলে রেখেছে। চলুন দেখি সেটা পাই কি না।

কাছেই বাড়ি। যাবার পথে সেখানে গিয়ে ওটা পাওয়া গেল। এইবার ওষুধের দোকান। দোকান থেকে গ্লুকোজ, এট্রোপিন, স্ট্রিকনিন, কোরামিন, লোবেলিন, পোটাসিয়াম পারম্যানগানেট সব নিয়ে আমরা প্রভঞ্জনের বাড়ির দিকে ছুটলাম। তখন বেলা আড়াইটে।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখি জানালা সব বন্ধ। তার ওপর পর্দা টানা। ঘর বেশ অন্ধকার। ভাল করে তাকাতে দেখা গেল মেঝেতে সেদিনকার মত গদির ওপর বিছানা। পাশাপাশি দুজন শুয়ে আছে। ছন্দা আর প্রভঞ্জন। ছন্দার হাতের কাছে সাদা একটা চীনে মাটির প্লেট। তার ওপর কয়েকটা সন্দেশ। কিছু কিসমিস বাদাম পেস্তা। কিছু লবঙ্গ এলাচ। পাশে কাঁচের গেলাসে জল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ছন্দা জেগে আছে, কিন্তু প্রভঞ্জনের মুখ দিয়ে ফেনা উঠেছে। মিনিটে পাঁচ ছ-বারের বেশী নিঃশ্বাস নিচ্ছে না। হাত-পা ঠাণ্ডা, নখের রঙ নীল। মুখ তামাটে। চোখের তারা আলপিনের মত বিন্দুপ্রায়।

দেখেই এট্রোপিন, স্ট্রিকনিন, কোরামিন, লোবেলিন সব ইন্‌জেক্‌শন একটা একটা করে দিয়ে সময়টা নোট করে রাখলাম। ছন্দাকেও গোটা দুই ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হল। এইবার স্টমাক্-টিউব দিতে হয়। মেঝেতে রুগী থাকলে টিউব ঢুকিয়ে কোনো লাভ নেই। স্টমাক ধুয়ে জল বার করা যাবে না। ড্রাইভারকে বললাম—সায়েবকে খাটে তুলতে হবে।

ছন্দা বললে—এ-ঘরে তো আর খাট ঢুকবে না। পাশের ঘরে খাট পাতা আছে। সেখানে বিছানা করে দিক। ঠাকুর-চাকর আর ড্রাইভার মিলে উঠিয়ে নিয়ে যাক।

তাই করা হল। প্রভঞ্জনকে পাশের ঘরে খাটে এনে শোয়ান হল। একটা বালতিতে পারম্যানগানেট অফ পটাশ জলে গোলা হল। টিউব ঢুকিয়ে মগে করে সেই জল টিউবের মাথায় ফানেলে ঢালা হল। এক মগ জল ঢুকিয়ে ফানেল যখন আবার কাত করে গামলায় নাবানো হল দেখা

গেল লাল জল কালো হয়ে গেছে। আফিং-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। যতক্ষণ না লাল জল বেরোয় ততক্ষণ এমনি করে ধোয়া হল। আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল জলের রং আর বদলাচ্ছে না লালই রয়েছে। তখন খানিকটা জল পেটে রেখে টিউব বার করে নেওয়া হল।

এ-ঘরে প্রভঞ্জন ও-ঘরে ছন্দা। প্রভঞ্জনের জ্ঞান নেই। বেহ‍ুঁশ। ইন্‌জেক্‌শন দিলেও বোঝে না। ছন্দার জ্ঞান আছে। কথা বলছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কখন আফিং খেলেন?

ছন্দা বললে—দ‍ুপ‍ুর বেলা। বারটার সময়।

—কতট‍ুকু?

ছন্দা হাতের আঙ‍ুল দিয়ে আন্দাজে যা দেখাল তার পরিমাণ ৩।৪ ভরির কম নয়।

বললাম—দ‍ুজনেই এক মাপ? সমান সমান?

ছন্দা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে—হ‍্যাঁ।

বললাম—তা হলে আপনি এখনও জেগে আছেন কি করে?

ছন্দা বললে—ওটা খেতে ভীষণ তেতো। রাখতে পারলাম না। উঠে গেল। বললাম—কোথায় ফেললেন?

পাশেই বাথর‍ুম। আঙ‍ুল দিয়ে দেখিয়ে ছন্দা বললে—বেসিনে। বললাম—এখন গেলে দেখা যাবে?

ছন্দা বললে—না। বমি করে ম‍ুখ ধ‍ুয়ে চোখে ম‍ুখে জল দিয়ে এসে মাথাটা কি রকম করে উঠল। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। চিৎকার শ‍ুনে ড্রাইভার এসে দরজা ধাক্কাতে লাগল। কোনো রকমে উঠে ছিটকিনি খ‍ুলে দিলাম। তারপর আর জানি না।

প্রভঞ্জনের ঘরে যেতেই বন্ধ‍ু বললেন—কি বললে আপনার র‍ুগী?

যা শ‍ুনেছি সব বললাম। বন্ধ‍ু বললেন—ও'র জন্যে ভাবনা নেই। এ'কে নিয়েই ম‍ুশকিল। এখনও দেখ‍ুন নিঃশ্বাস মিনিটে সাতটা আটটার বেশী নিচ্ছে না। আরও কমে গেলে আরটিফিশিয়াল রেস্‌পিরেশন দিতেই হবে। দেখ‍ুন তো কটায় এট্রোপিন দেওয়া হয়েছে?

দেখে বললাম—তিনটেয়। তিন ঘণ্টা হল।

বন্ধ‍ু বললেন—আর একটা দিন। এখন আর একবার স্টমাক ওয়াশ করবার সময় হল।

আবার ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বললাম—এইবারে ওর মা-বাবাকে একটা খবর দিলে হত না? ও'রা তো কিছ‍ুই জানেন না এখনও।

বন্ধু বললেন—শিগ্‌গির গাড়ি পাঠিয়ে খবর দিন। অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

ড্রাইভারকে পাঠিয়ে আবার প্রভঞ্জনের স্টমাক ওয়াশ করা হল। এইবার আর কালো জল বেরুল না। একটু পরেই লাল জল বার হল।

স্টমাক ওয়াশ করবার পর বন্ধু নাড়ী দেখে বললেন—আর একটা কোরামিন দিন পাঁচ সি সি।

এতবার ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি প্রভঞ্জন টের পায়নি। এইবার দিতেই আঃ বলে পা গুটিয়ে নিল। হঠাৎ হাত তুলে মুখ থেকে টিউবটা টান মেরে ফেলে দিল। দেখলাম নিঃশ্বাসের রেট বেড়ে গেল। বিষের ক্রিয়া কমে যাচ্ছে মনে হল।

প্রভঞ্জনকে ডাকতে একবার সাড়া পাওয়া গেল। খুব আশা হল এবার ও বেঁচে উঠবে।

পাশের ঘরে ছন্দাকে গিয়ে এই খবরটা দিয়ে বললাম—আর বোধহয় ভয় নেই। মনে হচ্ছে এবারে আপনার কর্তা বেঁচে উঠলেন।

ছন্দার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কাছে গিয়ে মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা এট্রপিন ইনজেকশন করে দিলাম। ছন্দা চমকে জেগে উঠল।

এমনি সময় প্রভঞ্জনের মা মালাকে নিয়ে এলেন। সঙ্গে একজন নামকরা প্রবীণ ডাক্তার। বড় একজন বিশেষজ্ঞ। আমার বন্ধুটিকে দেখেই বললেন—আরে আপনি এখানে? আগে জানলে কি আর এতদূর আসি? মিছিমিছি?

প্রভঞ্জনকে পরীক্ষা করে এবং আমরা কি করেছি সব শুনে বললেন—সবই তো করা হয়েছে। বাকি দেখছি শুধু আয়রন লাঙ।

ছন্দাকে দেখে বললেন—এঁর দিকেও একটু নজর রাখবেন। এই-বারে দুজনকেই বেশ খানিকটা করে গরম কফি খাওয়ান।

প্রভঞ্জনের মাকে বললেন—কিছু ভাববেন না। দুজনেই সেরে উঠবেন। যা করা হয়েছে, তার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে, তা আমার জানা নেই।

আমার বন্ধুটিকে দেখিয়ে বললেন—এমন একটি মস্ত লোক থাকতে আপনাদের ভয় কিসের? আজ রাতটা এঁরা থাকবেন। যা দরকার সব করবেন। প্রয়োজন হলেই আমাকে জানাবেন। বলে এঁদের খুব ভরসা দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

বিশেষজ্ঞ চলে যেতেই বন্ধুটিকে গোপনে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার

কি? এত যে আমড়াগাছি?

মৃদু হেসে বন্ধু বললেন—একদিন এঁকে বাগে পেয়ে একটু ঠুকেছিলাম। আজ তার শোধ নিলেন। মহা-ধূর্ত লোক!

মালা বললে—আপনারা দুজনেই তাহলে আজ রাতটা এইখানে থাকুন। যা হোক দুটি এখানেই খেয়ে নেবেন।

বন্ধুটির থাকবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বিশেষজ্ঞের প্যাঁচে পড়ে আটকে গেলেন। বললাম—আমি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। ফেরবার সময় এঁর বাড়িতেও একটা খবর দিয়ে আসব। প্রভঞ্জনের বাবাকেও বলে আসি। আমার কাছে শুনে তিনিও নিশ্চয় খুব ভরসা পাবেন।

বাড়ি এসে স্নান সেরে বন্ধুর বাড়িতে খবরটা দিয়ে প্রভঞ্জনের পুরনো বাসায় গেলাম। ওর বাবা জানালার পাশে একটা মোড়ায় বসে ছিলেন। খুব গম্ভীর মুখ। এ ক-মাসেই যেন অনেক বেশী বুড়ো হয়ে গেছেন। প্রভঞ্জন এবার বেঁচে উঠল শুনে মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। বললেন—আপনি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না। কিন্তু আমি দেখছি ওর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। আজ আপনি বাঁচালেন। কিন্তু কাল? মৃত্যু ওকে ধরেছে। সেই বজ্রমুষ্টি থেকে কে ওকে ছিনিয়ে আনবে? না, ডাক্তারবাবু, কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।

শুনে ভারি দমে গেলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে এলাম। ফিরে এসে দেখি প্রভঞ্জন অনেক ভাল। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে, কিন্তু জাগছে না। ছন্দা গরম গরম কফি পর পর দু-কাপ বেশ খেয়ে নিল। প্রভঞ্জন কিছুতেই খাবে না। জোর করে খাওয়াতে গিয়ে আর এক বিপত্তি হল। হাত থেকে গেলাস টেনে নিয়ে দড়াম করে ছুঁড়ে মেরে আবার ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।

ঠিক হল প্রথম রাতটায় বন্ধু জাগবেন। শেষটায় আমি। এগারটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। রাত দুটোয় বন্ধু আমায় তুলে দিলেন। দেখলাম প্রভঞ্জনের নাড়ী বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও ভাল। মালা কিন্তু একবারও উঠল না। ঠিক জেগে বসে রইল।

ভোরবেলা প্রভঞ্জন উঠে বসল। বলল—মিছিমিছি আপনাদের ভোগালাম। আসুন কফি খাওয়া যাক।

বললাম—কাল রাত তো কিছুতেই আপনাকে খাওয়ানো গেল না।

গ্লাস ছুঁড়ে ভেঙে ফেললেন।

শুনে প্রভঞ্জন খুব হাসল। বলল—দেখলেন, কিচ্ছু মনে নেই।

কফি খাওয়া হলে আবার গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আমরা চলে এলাম। সেই দিনটা প্রভঞ্জন খুব মুমুল। তারপর আর কোনো উপসর্গ দেখা গেল না। ইন্‌জেক্‌শন দিতে আমি আরও ২।৩ দিন গেলাম; কিন্তু কেন ও বিষ খেয়েছিল, তা বলল না। শুধু বলত—জীবনে অনেক কিছু করেছি। ভিখিরী ছিলাম, রাজা হয়েছি। লেখাপড়াও কম করিনি। প্রফেসরী করেছি, এমন কি রিসার্চ পর্যন্ত করেছি। আর বেঁচে কি হবে?

তারপর মাসখানেক ওর আর খবর পাইনি। একদিন দুপুরে আবার ওর কাছ থেকে ডাক এল। গিয়ে দেখি ছন্দা প্রভঞ্জন দুইজনেই খুব গম্ভীর। ছন্দার কপালের বাঁদিকটা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। হাতেও দু-এক জাগয়ায় কালশিরে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? চেহারা এমন হল কি করে?

ছন্দা বললে—পরশু বাথরুমে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে।

প্রভঞ্জন বললে—শুধু মাথায় নয়, পেটেও লেগেছে। শুনেছি এ সময় এরকম আঘাত লাগলে শিশুর ক্ষতি হয়। বিকলাঙ্গ হয়। তাই ভাবছি এটা অপারেশন করে বার করা যাক।

বললাম—অপারেশন করবে কে? আপনি?

এইবার প্রভঞ্জন হেসে ফেললে। বলল—না। সেইজন্য তো আপনাকে ডাকা।

বললাম—একজন এক্‌স্‌পার্টকে আগে দেখান। শুনুন তিনি কি বলেন, তারপর কি করা উচিত ঠিক করা যাবে এখন।

সেইদিনই বিকেলে একজন বিশেষজ্ঞকে দেখানো হল। তিনি বললেন —বাচ্চা বেশ ভাল আছে। কোনো আঘাত লেগেছে বলে মনে হয় না। কাজেই বিকলাঙ্গ হবে ভাববার কোনোই কারণ নেই।

শুনে ছন্দা খুশী হল, কিন্তু প্রভঞ্জন হল না। বললে—বিকলাঙ্গ যে হবে না, সে গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে? হলে তো সারাজীবন আমাকেই ভুগতে হবে।

বললাম—আজগুবী ভেবে মন খারাপ করবেন না। দেখবেন সুস্থ সবল বাচ্চা হবে।

আমাকে আমার ফার্স্ট এইড পোস্টে নামিয়ে ওরা চলে গেল।

তারপর মাস তিনেক আর কোনো খবর জানি না। আমার স্ত্রী তখন

মৃত্যুশয্যায়। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। তাই কয়েকদিন আমি বাড়ির বাইরে যাই না। রুগী দেখি না। একদিন ভোরবেলা আবার প্রভঞ্জনের ড্রাইভার এল। বলল—বহুৎ জরুরী দরকার। শিগ্‌গির চলুন।

বললাম—কি হয়েছে?

ড্রাইভার বলল—সায়েব আবার বিষ খেয়েছে।

বললাম—সে কি? কখন?

ড্রাইভার বলল—বোধহয় রাত্রে। আজ ভোরে মেম্‌সাব ডেকে বললেন এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে যেতে। শুনেই ছুটে এসেছি।

বললাম—কিন্তু আমি তো যেতে পারব না। আমার স্ত্রীর খুব অসুখ। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। ওঁকে ফেলে তো এখন যেতে পারি না।

ড্রাইভার বলল—সত্যি যাবেন না?

বললাম—না। মেমসাব্‌কে বল অন্য কাউকে এনে দেখাতে।

ক্ষুণ্ণ হয়ে বেচারা চলে গেল। প্রভঞ্জনের বাবার কথা মনে পড়ল। বলেছিলেন, মৃত্যু ওকে ধরেছে কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।

আধ ঘণ্টাও তখন কাটেনি, নিরঞ্জন এল। উস্‌কোখুস্‌কো চুল। বলল—দাদা বোধহয় আর বেঁচে নেই। এবারে সায়ানাইড খেয়েছেন। গাড়ি পাঠিয়েছিলাম, আপনি তো কই গেলেন না? চলুন একবার দয়া করে।

নিরঞ্জনকে আমার শোবার ঘরে নিয়ে এলাম। বিছানায় আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে শুয়ে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো। বললাম—ইনি এখন মৃত্যুশয্যায়। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। তাই এঁকে ফেলে আজ তিনদিন আমি বাইরে কোথাও যাই নি।

নিরঞ্জন মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে বলল—কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু। বুঝতেই পারিনি আপনার বাড়িতে এই বিপদ। আচ্ছা, দেখি আর কাউকে পাই কি না।

সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল—দাদা কোনো কিছু লিখে যান নি। বালিশের নীচে শুধু এই খামটা পাওয়া গেছে। দেখুন দেখি এটা কি?

খুলে দেখলাম প্রভঞ্জনের মলমূত্ররক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার সব রিপোর্ট। একখানা দেখলাম যৌনগ্রন্থির কৃত্রিম ক্ষরণের পরীক্ষা। মাস কয়েক আগে পরীক্ষা হয়েছে। ডাক্তারী ভাষায় লেখা আছে এতে প্রজননের ক্ষমতা নেই।

রিপোর্টগুলি খামে পুরে নিরঞ্জনের হাতে দিয়ে বললাম—এসব দিয়ে আর কি হবে? ছিঁড়ে ফেলে দিন।

নিরঞ্জন হাত পেতে খামটা নিল। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কি যেন বলবে মনে হল। তারপর মাথা নীচু করে মুখ ফিরিয়ে হন্‌হন্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

আজকাল প্রায়ই শুনি, জাপান নাকি কলকাতায় বোমাই ফেলেনি। যা ফেলেছিল তা আসল বোমা নয়। জাপানী মালের মতই নকল। আসলে ওগুলো বোমাই নয়। নেহাতই পট্‌কা।

কিন্তু ঐ পট্‌কার দাপটেই তখন কলকাতা জনমানবশূন্য হয়েছিল। পট্‌কা বলে যাঁরা এখন ঠাট্টা করছেন তাঁরাই সব চোঁচা দৌড় মেরে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিলেন। জাপান সিঙাপুর পর্যন্ত এসে সত্যি সত্যিই থেমে গেল। এদিকে আর এগুলো না। কলকাতার ওপর বার কয়েক হামলা করেই চুপ করে গেল দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঐ পলাতকেরা আবার গুটি-গুটি ফিরে এসেছিলেন।

আমরা কিন্তু এক পা-ও এখান থেকে নড়িনি। কলকাতার ফুটপাথ আঁকড়ে পড়েছিলাম। আমরা যারা কাজ নিয়েছিলাম এ আর পি অথবা সিভিল ডিফেন্সে, কলকাতা ছাড়বার উপায় আমাদের ছিল না। এখান থেকে পালিয়ে জীবিকা অর্জনের অন্য কোনো পথ বাইরে কোথাও খোলা দেখিনি। তাই পেটের দায়ে অন্য সব ভয় তুচ্ছ করে জাপানকে রুখতে হবে বলে ধ্বনি তুলেছিলাম।

শহর ছেড়ে সবাই যখন বাইরে যাচ্ছে, কেউ ভাবেনি জাপানের হাত থেকে এ শহর রক্ষা পাবে। ইংরেজ এ শহর রক্ষা করবে না। পিছু হটে পালিয়ে যাবে বিহার কিংবা উত্তর প্রদেশে। যেমন করে পালিয়েছে ইয়োরোপ থেকে, ইজিপ্ট থেকে, মালয়, বর্মা, সিঙাপুর থেকে। লোকে বুঝেছে, ইংরেজ জানে, শুধু পিছু হটতে। লড়তে জানে না। চৌরঙ্গীর ওপর একদিন দেখলাম, চাবুক খেয়েও ঘোড়া সামনে না এগিয়ে পিছু হটছে দেখে ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত গাল দিচ্ছে—শালা ঘোড়াভি আংরেজ বন্‌ গয়া।

এই পরিস্থিতিতে কলকাতা রক্ষা করবার জন্য এ আর পি-র প্রয়োজন হল। ফার্স্ট এইড পোস্ট কতকগুলি খোলা হল কিন্তু তা চালাবার জন্য পয়সা দিয়ে কোনো ডাক্তার নিযুক্ত হল না। লেকচার প্রতি দশ টাকা দেওয়া হবে এই আশায় কয়েকজন ডাক্তার কিছুদিন বেগার খেটে কাজ ছেড়ে

দিলেন।

গুজবে গুজবে শহর ভরে গেল। ডাক্তারদেরও কলকাতা ছাড়বার কথা ভাবতে হল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, ডাক্তারদের নাকি শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া চলবে না। গভর্নমেণ্ট অর্ডিন্যান্স করে আটকাবে। কন্‌স্ক্রিপশন করবে। শুনে আমাদের মধ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। কোনো পরাধীন দেশের প্রতি কোনো বিদেশী রাষ্ট্র নাকি এমন জবরদস্তি কখনও করতে পারে না, এটা সম্পূর্ণ বে-আইনী, এমনি সব কথা নিয়ে আমাদের ক্লাবে, এসোসিয়েশনে খুব তর্কবিতর্ক হল। কিন্তু সকলেরই প্রাণে ভয় যদি সত্যি কন্‌স্ক্রিপশন করে তাহলে কি হবে?

আবার একদিন শোনা গেল ডাক্তারদের গভর্নমেণ্ট আটকাবে না। একজন মন্ত্রী নাকি আশ্বাস দিয়েছেন যে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিলে যত ইচ্ছে ডাক্তার নাকি তিনি এ আর পি-র জন্য যোগাড় করে দিতে পারেন। বেসরকারী বড় বড় দু-জন ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েই নাকি তিনি ও কথা বলেছেন। শুনে আমরা খুব ক্ষেপে গেলাম। অপমানিত বোধ করলাম।

এই সময়ে মেডিক্যাল কলেজে একদিন স্ট্রাইক হয়ে গেল। প্রথম জমাদাররা, তারপর ডাক্তাররা কাজ বন্ধ করে দিল। প্রিন্সিপাল সে স্ট্রাইক মেটাতে পারলেন না, সার্জন জেনারেলও না। সার জন হার্বার্ট তখন বাংলার লাট। তাঁর নির্দেশে লোকাল সেল্‌ফ্‌ গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী মশাই এলেন মিটমাট করতে। খুব ঝানু লোক। এসেই বুঝে নিলেন গলদ কোথায়। অন্য সব লোকের মত ডাক্তাররাও শহর ছেড়ে পালাবার সুযোগ খুঁজছে। ডাক্তারদের এসোসিয়েশনকে তুষ্ট না করলে এদের হাত করা যাবে না। অমনি বললেন—একটা মিটিং ডাকা যাক। ডাক্তারদের এসো-সিয়েশনের এবং ক্লাবের সব সভ্যরা আসুক, বাইরের ডাক্তাররাও আসুক। ডাক্তাররা তাদের কথা বলুক। গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে তিনি এবং সার্জন জেনারেল থাকবেন। একটা মিটমাট করা যাবে।

ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবে মিটিং ডাকা হল। হল লোকে ভরতি হয়ে গেল। এত ডাক্তার এক সঙ্গে এর আগে কখনও কোনো মিটিং-এ আসে নি। মন্ত্রী মশাই খুব জোর বক্তৃতা করলেন। আমাদের আঁতে ঘা দিয়ে বললেন— এই শহর আপনাদের লেখাপড়া শিখিয়েছে। এতদিন ধরে মার মত লালন-পালন করেছে। আহার্য দিয়েছে। আজ এই বিপদের দিনে বিদেশী দস্যুর হাতে একে ছেড়ে দিয়ে আপনারা চলে যাবেন?

উত্তরে আমাদের মুখপাত্র একজন উঠে বললেন—আমরা যে এখানে থাকব, খাব কি? বোমা? লোকে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে; আমাদেরও রোজগার পড়ে যাচ্ছে। গভর্নমেণ্ট আমাদের পরিবার সব বাইরে পাঠাতে বলেছে। সেখানে একটি সংসার, এখানে একটি। এই ডবল খরচ চালাব কি করে? গভর্নমেণ্ট ডবল মাইনে দিক, তখন ভেবে দেখব থাকব কিনা।

আর একজন বললেন—যে মন্ত্রীটি ভরসা দিয়েছিলেন পঞ্চাশ টাকা করে দিলেই অঢেল ডাক্তার পাওয়া যায়, তাঁর কাছেই যান না? এখানে আসা কেন? তিনি তো জীবনে বোধ হয় নিজের চিকিৎসার জন্য কোনো-দিন একটি পয়সাও খরচ করেন নি। তিনি কি করে বুঝবেন ডাক্তারদের কি রকম কষ্টে খেটে অর্থ উপার্জন করতে হয়।

এমনি সব গরম গরম কথা কাটাকাটির পর ঠিক হল পঞ্চাশ টাকার কথাটা নেহাতই গুজব। গভর্নমেণ্ট কখনও তা বলেন নি। ডাক্তারদের যাতে কষ্ট না হয় এমনি মাইনেই তাঁরা দেবেন। কত হলে ডাক্তাররা চালাতে পারেন তা বোঝার জন্য তিনজন ডাক্তার প্রতিনিধি ঠিক করা যাক। এঁরা আলোচনা করে যা বলবেন গভর্নমেণ্ট তাতেই রাজী হবেন।

মিটিংএ তিনজন বেসরকারী ডাক্তারের নাম ঠিক করা হল। এঁরা পরদিন সার্জন জেনারেলের আপিসে গিয়ে কথা বললেন। তারপর লাট-সাহেবের কুঠিতে। ঠিক হল এ আর পি-র ডাক্তারদের আড়াইশ টাকা করে মাইনে হবে। কিন্তু বণ্ডে সই করতে হবে, কেউ পালাবে না।

বণ্ডে সই করবার নাম শুনেই অনেকে পিছিয়ে পড়ল। তাতেই আমার সুবিধে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বণ্ড সই করে চাকরিটি নিয়ে ফেললাম। তখনও জিনিসপত্রের দাম এত চড়েনি, দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নি তাই এই টাকাটা মেলা টাকা বলে মনে হল।

চাকরি যখন নিলাম, তখন কিছুই জানি না কি কাজ। চাকরি যারা দিল তারাও জানত না কি কাজ। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ইস্কুল বাড়ির দু-তিনখানা ঘর নিয়ে এক একটা ফার্স্ট এইড পোস্ট। থানার মত এলাকা ভাগ করা। যে এলাকায় বোমা পড়বে, সেই এলাকার পোস্টে আহতদের নিয়ে যাওয়া হবে। যারা সামান্য আহত, তাদের সেখানে রেখে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হবে। যারা বেশী আহত, তাদের হাসপাতালে পাঠান হবে।

আমরা যখন কাজে ঢুকি, তখন এ আর পি কিছুই না। শুধুই একটা নামমাত্র। মাইনে দিয়ে লোক নেবার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ —

উঠল। একটা বড় গভর্নমেন্ট অর্গানিজেশনে দাঁড়িয়ে গেল।

ফার্স্ট এইড হল প্রাথমিক চিকিৎসা। এই প্রাথমিক চিকিৎসা কি এবং কি করেই বা যে কোনো লোক একজন আহত ব্যক্তিকে এ চিকিৎসা দিতে পারে, তাই শেখানো আমার কাজ। তখন নিজেই জানি না এ চিকিৎসা কি, অপরকে শেখাব কি করে? এ সমস্যা আমার একার নয়। যারা কাজ পেয়েছিল সব ডাক্তারেরই তখন এই সমস্যা। ডাক্তারী করা এক, প্রাথমিক চিকিৎসা করা অন্য। সেণ্ট জন্‌স অ্যাম্বুলেন্সের রেডক্রসে এর শিক্ষা দেওয়া হত দশ বারোটা লেকচারে। আমাদের বেশীর ভাগ ডাক্তারেরই সে ট্রেইনিং ছিল না।

সেণ্ট জন্‌স অ্যাম্বুলেন্সের ফার্স্ট 'এইড টু দি ইন্‌জিওরড বইখানা পড়ে, তার সব ছবি দেখে মিলিয়ে বাড়িতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্র্যাকটিস করে লেকচার দিতে যেতাম। কয়েকদিন পরেই ওটা রপ্ত হয়ে গেল।

আমার পোস্টে প্রথমে আটজন কর্মী ছিল। এদের বলা হত ফার্স্ট এইড ওয়ার্কার। আমার কাজ এদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে রাখা। এরা কেউ ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করে নি। ইংরেজীতে নাম সই করতে পারে, ক্লাস সিক্‌স, সেভেন পর্যন্ত বিদ্যে। ত্রিশ টাকা মাইনে। আট ঘণ্টা ডিউটি। দুজন করে এক সঙ্গে। ঘুরে-ফিরে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা। তাছাড়া সকালবেলা ক্লাস, ড্রিল, প্যারেড। স্ট্রেচার বওয়া। তার ওপর যখনি সাইরেন বাজবে, তখুনি সবাইকে হাজির হতে হবে। কি দিন কি রাত।

পরে দুজন মেয়ে নেওয়া হল। এদেরও এই কাজ, এই মাইনে। শুধু ড্রিল, প্যারেড আর স্ট্রেচার কাঁধে করা বাদ। আঠেরো থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে ভাল স্বাস্থ্য দেখে বাছাই করে ছেলে নেওয়া হত। কিছুদিন দেখে যদি বুঝতাম একে দিয়ে চলবে না, তাহলে তাকে ছাড়িয়ে নতুন লোক নেওয়া হত। অর্থাৎ চাকরি দেবার ক্ষমতাটি না দিয়ে চাকরি খাবার ষোল আনা ক্ষমতাটিই আমাকে দেওয়া হল। বণ্ডে সই করা সত্ত্বেও কেউ কাজ ছাড়তে চাইলে কখনও বাধা দেওয়া হত না। তাই লোকের মনের ভয় কেটে গেল। নতুন লোক পেতে কোনো অসুবিধা হল না।

তখন আমার পোস্টে একটি কর্মী কাজ ছেড়ে চলে গেছে। আমার লোকের দরকার। আমাদের হেড অফিস রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে ম্যাডান স্ট্রীটে উঠে এসেছে। হেড অফিসের এক সহকর্মী একদিন একটি লোক পাঠালেন। লোকটির দেখলাম অনেক বয়েস। চল্লিশের ওপর মনে হল।

চুলে পাক ধরেছে। গুটিকয়েক দাঁত পড়ে গেছে। নাম কালীপদ চক্রবর্তী। আমার পোস্টের সব কর্মীদের তুমি বলেই বলতাম। এই লোকটি দেখলাম আমার চেয়েও বয়সে বড়, তাই আপনি বলেই কথা শুরু করলাম।

বললাম—আপনার বয়েস কত?

কালীপদ বলল—আজ্ঞে, এই সবে তিরিশ পূর্ণ হয়েছে।

বুঝলাম, চাকরি পাছে ফসকে যায় সেই ভয়ে মিথ্যে কথা বলছে। বললাম—এতদিন কি কাজ করতেন?

কালীপদ বলল—দরজীর।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—সেই কাজ ছেড়ে এই সামান্য টাকায় কি চলবে? এই বয়সে আবার পড়াশুনো, ক্লাশ করা, পরীক্ষা দেওয়া, ড্রিল, প্যারেড, স্ট্রেচার কাঁধে করা—এসব কি পারবেন?

খুব জোরের সঙ্গে কালীপদ বলল—খুব পারব।

বললাম—কিন্তু দরজীর কাজ ছাড়লেন কেন? ও-সবেই তো আজকাল পয়সা।

কালীপদ বলল—দরজীর দোকান কখনও করতে পারি নি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ যোগাড় করতাম। ঘরে বসে সেলাই করতাম। যারা কাজ দিত সব কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে আজ তিন মাস। এই চাকরিটি না হলে স্ত্রী পুত্র নিয়ে মারা পড়ব স্যার।

জিজ্ঞাসা করলাম—থাকেন কোথায়?

কালীপদ বলল—শোভাবাজার।

বললাম—অতদূর থেকে এখানে কাজ করবেন কি করে? সাইরেন বাজলেই বা হাজির হবেন কেমন করে?

কালীপদ বলল—চাকরি হলে এই পাড়াতেই ঘর নেব। কোনো অসুবিধে হবে না।

বললাম—ত্রিশ টাকাতে বাড়ি ভাড়াই বা কত দেবেন, আর খাবেনই বা কি?

কালীপদ বলল—শোভাবাজারে দশ টাকা দিতাম ঘরভাড়া। এখানেও তার বেশী লাগবে না। নিজের একটা সিঙার মেশিন আছে। অফ্ টাইমে কাজ করে বাকীটা পুষিয়ে নেব। এতদিন ঐ করেই তো চালিয়েছি।

আমার পোস্টে যারা কাজ করত তারা সব ছেলে-ছোকরা। নিজের খরচ ছাড়া আর কোনো ভাবনা ছিল না। এর দেখলাম দায়িত্ব আছে। স্ত্রী পুত্র আছে। আমি বাগড়া দিলে বেচারা বিপদে পড়বে। তাই

যোগ্যতার মাপকাঠি কিছুটা আলগা করে একে কাজে বহাল করে নিলাম।

হেড অফিসে গিয়ে একদিন সেই সহকর্মীটির সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলেন—একটি লোককে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, দরজীর কাজ জানে। কি রকম কাজ-টাজ করছে?

বললাম—বয়েস হয়েছে, ছেলে-ছোকরার মত দৌড় ঝাঁপ পারবে কেন? চালিয়ে নিচ্ছি কোনও রকমে।

সহকর্মী বললেন—ওকে রাখবেন। অনেক কাজে লাগবে। বাড়ির সেলাই-এর কাজ সব করে দেবে। এইটুকু যদি না পাই তাহলে এসব লোককে চাকরি দিয়ে কি লাভ?

বয়েস বেশী হলেও দেখলাম কালীপদর চেষ্টা আছে। মাসখানেকের মধ্যেই সব কাজ শিখে নিল। ছেলেদের সঙ্গে বেশ ভাব করে ফেলল। সবাই ওকে দাদা বলে ডাকতে শুরু করল। একদিন দেখলাম, ৬।৭ বৎসরের একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ছেলেটি ভারি মিষ্টি দেখতে। ফরসা রং, পাতলা চেহারা, দুষ্টুমিভরা জ্বল-জ্বলে দুটি চোখ।

জিজ্ঞাসা করলাম—এটি কে?

সলজ্জ হাসি হেসে কালীপদ বলল—আমার ছেলে।

ছেলেটিকে পেয়ে পোস্টের ছেলেরা মহা খুশী। আদর করে মাথায় তুলে নিল। বল কিনে দিল। লজেঞ্চ খাওয়াল। খুব ভাব করে ফেলল। সেই থেকে প্রায়ই ওকে দেখতাম। কখনও ওর বাবার সঙ্গে, কখনও পোস্টের অন্য ছেলেদের সঙ্গে। পোস্টের মেয়ে দুটির সঙ্গেও দেখলাম ওর খুব ভাব হয়ে গেল। একটি মেয়ে ওর জন্য উলের মোজা বুনে দিল।

কালীপদ আমার বাড়ির সেলাই-এর কাজও বাগিয়ে নিল। আমার ছেলেদের শার্ট পাঞ্জাবি সব করে দিল। আমার স্ত্রী প্রায়ই ওকে ডাকিয়ে এটা ওটা করিয়ে নিতে লাগলেন। সব কাজই যে পছন্দমত হত তা নয়। অনেক কাজ বার বার খুলে করালে তবে আমার স্ত্রীর পছন্দ হত, কোনো কাজ মোটেই হয়ত পছন্দ হত না। তবু ওকে ছাড়া আমাদের চলত না। হাসি মুখে এক কাজ বার বার খুলে করে দিত। প্রথম প্রথম মজুরী কিছু নিতে চাইত না কিন্তু আমি জোর করে গছিয়ে দিতাম। পুরো মজুরী কখনও অবিশ্যি দিই নি। বাজারের যা দর তার চেয়ে কিছু কমই দিতাম। কখনও অর্ধেক, কখনও হয়ত বা কিছু বেশী। তাইতেই কিন্তু ও খুশী থাকত। অনেক বেশী পাচ্ছে বলে মনে করত। আমার

যে সহকর্মী ওকে কাজে ঢুকিয়েছিলেন ছ মাস বাড়ির সব কাজ করিয়ে নিয়ে একটি পয়সাও নাকি ওকে দেন নি। একদিন নাকি সুতোর দাম বলে কিছু দিতে চেয়েছিলেন তা ও নেয় নি।

ওর ছেলেটিও ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসত। আমার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত। ভারি ভাল লাগত দেখতে।

তখন জাপান আর বোমা ফেলছে না। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। যারা কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিল আবার সব ফিরে এসেছে। লোক ক্রমশ বাড়ছে। চালের দর চড়েছে। গভর্নমেণ্ট আমাদের সস্তা দরে চাল, ডাল দিতে শুরু করলেন। শোনা গেল, শিগ্‌গিরই রেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

সেই সময় ডিসেম্বর মাসের শেষে একদিন কালীপদ পোস্টে এসে বলল—স্যার একবার যদি দয়া করে আমার বাড়িতে একটু আসেন। আমার ছেলেটার খুব জ্বর। কেবল ছট্‌ফট্‌ করছে।

কাছেই গলির ভেতর একতলার একখানা ঘর নিয়ে কালীপদর বাসা। গিয়ে দেখলাম ছেলেটি জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছে, ছট্‌ফট্‌ করছে। জ্বর দেখলাম ১০৪°। ঘাড় শক্ত হয়নি। বুক পরীক্ষা করে কোনো দোষ পেলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কখন জ্বর হল? খুব শীত করে এসেছে কি?

ছেলের মা বলল—পরশু থেকেই কেমন যেন ঘ্যানঘ্যান করছিল। কাল গায়ে হাত দিয়ে দেখি যেন পুড়ে যাচ্ছে। কাঁপুনি-টাপুনি কিছু হয় নি। শীত-টীতের কথাও কিছু বলে নি। আজ দেখছি সারা গা যেন লাল হয়ে গেছে। মাথায়, পিঠে, কোমরে খুব যন্ত্রণা বলছে। খালি কাঁদছে।

দেখলাম, সর্দি কাশি কিছু নেই। চোখও ছলছলে নয়। মুখে, বুকে, পেটে, হাতে, পায়ে, এখানে ওখানে লাল লাল চাকা চাকা হয়ে রয়েছে। মনে হল, কিছু বোধ হয় বেরুবে।

তখন শহরে দুটি চারটি বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে। টিকে নেবার জন্য সিনেমায় স্লাইড দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কিছু হৈ-চৈ শুরু হয় নি।

জিজ্ঞাসা করলাম—টিকে নেওয়া হয়েছে কবে?

বোকা বোকা হাসি হেসে কালীপদ বলল—টিকে তো আমরা নিই না।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। লোকটা বলে কি?

জিজ্ঞাসা করলাম—এই ছেলের কখনও টিকা হয় নি?

কালীপদ বলল—আজ্ঞে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

কালীপদ বলল—টিকার বীজ শরীরে ঢুকে শরীর খারাপ হয় তাই আমরা টিকা কখনও নিই না। ওতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমরা বসন্তের সময় নিমপাতা আর কাঁচা হলুদ খাই। নিমপাতা সেদ্ধ করে তার জলে স্নান করি। নিমের তেল গায়ে মাখি। নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করি।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঐ সুন্দর ছেলেটার কি ভয়ঙ্কর দশা হতে পারে ভেবে আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল। ভয় হল ঐ সাংঘাতিক রোগই বুঝি ছেলেটাকে শেষে ধরল।

শুধু বললাম—মাথাটা এখন ভাল করে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে বরফ দিন। গা-টা গরম জলে ভাল করে মুছিয়ে দেয়া হোক। জল খেতে দিন খুব। তরাপর কাল দেখা যাবে।

সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে উঠে এলাম।

পরদিন কালীপদ ডিউটিতে এল। বেশ খুশী-খুশী মুখ। হেসে নমস্কার করে বলল—আজ জ্বর ছেড়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—গায়ে কিছু বেরিয়েছে?

কালীপদ বলল—আজ্ঞে না। এখানে বড্ড মশা। কয়েকটা বোধ হয় কাল কামড়েছে। কিছু বেরোয় নি।

মুখ খুব গম্ভীর করে বললাম—চলুন একবার দেখে আসি।

কালীপদ একটু ইতস্তত করে বলল—কেন স্যার আর মিছিমিছি কষ্ট করবেন? ভালই তো আছে। খাচ্ছেও বেশ। জ্বরটাও ছেড়ে গেল।

উঠে বললাম—তা হোক। তবু চলুন একবার দেখে আসি।

গিয়ে দেখি জ্বর কমেছে ঠিক। কিন্তু মুখে, পেটে, বুকে, হাতে, পায়ে, সারা গায়ে গুটি বেরিয়েছে। জ্বর নেই দেখে ছেলের মারও উদ্বেগ কেটে গেছে।

বেরিয়ে এসে কালীপদকে বললাম—আজ থেকে আপনি আর পোস্টে যাবেন না। আপনাকে ছুটি দিলাম।

এইবার কালীপদ ঘাবড়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল—কেন স্যার? আমি কি দোষ করলাম?

বললাম—আপনার ছেলের আসল বসন্তই হয়েছে। জল বসন্ত নয়। তার জন্য আপনি নিশ্চয়ই দায়ী। কারণ এই ৬।৭ বছরেও আপনি

ওকে টিকা দেন নি। দিলে কখনও এ রোগ হত না। প্রাথমিক টিকা না দেওয়া যে একটা অপরাধ তা জানেন?

কালীপদ বলল—কই, কখনও তো শুনি নি। আমি নিজেও কখনও টিকা নিই না; বাড়িতে কাউকে কখনও নিতে দেখি নি।

বললাম—শার্টের হাতাটা তুলুন তো দেখি।

শার্টের হাতা তুলে দেখা গেল দুটি বাহুতেই বড় বড় দুটি করে বাংলা টিকার দাগ। বললাম—এগুলি কি?

কালীপদ বলল—ও তো বাংলা টিকে। কবে দেওয়া হয়েছে আমি জানিই না। আমার জ্ঞানে কখনও টিকে নেই নি।

বললাম—ঐটি ছেলেবেলায় দেওয়া হয়েছ বলেই এখনও টিঁকে আছেন। কিন্তু আমি ছুটি দিচ্ছি যাতে এখন আপনি বাইরে না যান, রোগটা না ছড়ান। এখন তিন সপ্তাহের জন্য কোয়ারেনটাইন লিভ্ আপনাকে দেওয়া হবে। মাইনে কাটা হবে না।

চাকরি যাবে না শুনে কালীপদ আশ্বস্ত হল। বলল—এখন তো জ্বর ছেড়ে গেল; ভয় তো আবার যখন পাকবে?

ওর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। রাগে বিরক্তিতে গা যেন জ্বলে গেল। ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে পোস্টে ফিরে এলাম।

আমার ঐ মুখ দেখে পোস্টের ছেলেরা ঘাবড়ে গেল। সবার চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। বলল—ছেলেটার কি হয়েছে স্যার?

ছেলেটা সবারই এত আদরের, এত বেশী ভাল ওকে সবাই বাসত যে, আমার কাছ থেকে শুনে সবাইর মুখ শুকিয়ে গেল। গভীর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন শুধু বলল—তাহলে কি হবে স্যার? বাঁচবে তো? এদের ঐ উদ্বেগে কোনো ভরসা দিতে পারলাম না। শুধু বললাম—এ রোগের তো কোনো অষুধ নেই। এখন দেখ কি হয়।

আমার কর্মীরা রোজই গিয়ে ছেলেটাকে দেখে আসত। খবর আনত। বলত—কী চেহারা যে হয়েছে স্যার, চোখে দেখা যায় না। ভয় করে। আর সে কি কষ্ট! সারাদিন শুধু গোঙাচ্ছে। বসন্তের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অবিশ্যি বলছে, এরকম হয়। ভয়ের কিছু নেই।, সেরে যাবে। কালীপদদা এখন শুধু কাঁদছেন আর আপসোস করছেন।

কালীপদর নাম শুনেই আমার মেজাজ আবার বিগড়ে গেল। কি আশ্চর্য, এই লোকটার নাম পর্যন্ত যেন সহ্য করতে পারতাম না।

দিন সাতেক পরে একদিন দুপুর রাতে আমার দরজার কড়া খট্‌খট্‌ করে নড়ছে শুনতে পেলাম। উঠে দেখি, কালীপদ দাঁড়িয়ে। মলিন বিমর্ষ মুখ। বলল—এক্ষুনি ছেলেটা মারা গেল। দশটা টাকা যদি দেন দয়া করে।

ঘরে ফিরে এসে দশটি টাকা বার করে কালীপদকে দিয়ে বললাম—আজ আপনার এই শোকের মুখে কিছু না বললেই বোধ হয় সংগত হত। একটু সহানুভূতি কি সান্ত্বনা দেওয়াও বোধ হয় আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা পারব না। কারণ আমি জানি, কার দোষে আজ ওর মৃত্যু হল।

কিছু না বলে কালীপদ চলে গেল।

সেবার জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় বসন্তের এপিডেমিক লেগে গেল। করপোরেশনের টিকা নেওয়া বিপজ্জনক বলে দুজন এক্সপার্ট এবং ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাইরেক্টর এক সঙ্গে ঘোষণা করলেন, কলকাতা শহরে টিকে দেওয়ার দায়িত্ব করপোরেশনের হাত থেকে গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে তুলে নিলেন। গভর্নমেণ্টের হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেণ্ট এ আর পির শরণাপন্ন হল। আমাদের রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ডাক পড়ল।

এ আর পি তখন মস্ত বড় প্রতিষ্ঠান। সারা কলকাতাকে ভাগ ভাগ করে ৪০টি ফার্স্ট এইড পোস্ট। প্রতিটি পোস্টে একজন ডাক্তার এবং ১০ থেকে ১৫টি কর্মী। তাছাড়া, দশ বারোটি এ আর পি ডিপো। আমাদের বলা হল, আমাদের কর্মীদের শিখিয়ে ওদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে টিকে যদি দেওয়াতে পারি তাহলেই শুধু এই মহামারী বন্ধ করা সম্ভব। টিকে দেওয়ার সব সরঞ্জাম যখন যা দরকার সব স্বাস্থ্য বিভাগ সরবরাহ করবেন।

আমরা বললাম—কিন্তু লোকে আমাদের কাছ থেকে টিকে নেবে কেন?

স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টর বললেন—গভর্নমেণ্ট এক্ষুনি একটা অর্ডিন্যান্স অবিশ্যি জারি করতে পারেন কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। সংক্রামক রোগের একটা আইন আছেই। তারই জোরে ঘরে ঘরে টিকে দেওয়া চলবে। তাছাড়া, গভর্নমেণ্ট প্রেসনোট বার করবেন। বলবেন—প্রাথমিক টিকে নেওয়া বাধ্যতামূলক। না নিলে শাস্তি দেওয়া হবে। গভর্নমেণ্ট এ আর পির সাহায্যে ঘরে ঘরে টিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

আমরা রাজী হয়ে গেলাম। প্রেসনোট বেরিয়ে গেল। শহরে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। রটে গেল, টিকে এবার নিতেই হবে নইলে গভর্নমেণ্ট ছাড়বে না। শাস্তি দেবে।

আমার পোস্টে আটজন ছেলে, দুটি নার্স। সবাইকে টিকে দেওয়া শিখিয়ে দিলাম। প্রত্যেককে একটি থলি দেওয়া হল। তার মধ্যে টিকে দেওয়ার একটি যন্ত্র, রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট, টিকের বীজ, তুলো, স্পিরিটল্যাম্প আর একখানা খাতা। কে কত বেশী লোককে টিকে দিতে পারে তাই দেখা হবে। কর্মীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হল।

মহা উৎসাহে সবাই কাজে লেগে গেল। কিন্তু দু-চারদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরেই সবাই যেন একটু একটু করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। উৎসাহ কমে গেল। কাজে ফাঁকি দিতে শুরু করল।

এমনি সময় কোয়ারেনটাইন লিভ শেষ করে কালীপদ এল। ওকে দেখেই আমার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। নীল রং-এর ইউনিফরম পরে ফোক্‌লা দাঁত বার করে হেসে নমস্কার করে দাঁড়াল। দেখে গা আবার জ্বালা করে উঠল।

রুক্ষ গলায় বললাম—এখন নতুন ডিউটি পড়েছে। আগে নিজে টিকে নিতে হবে। তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে টিকে দিয়ে আসতে হবে। পারবেন?

বিনা দ্বিধায় কালীপদ বলল—কেন পারব না?

বললাম—তাহলে নিজে আগে নিন।

মৃদু হেসে হাত বাড়িয়ে কালীপদ বলল—দিন।

ডিউটির একটি ছেলেকে বললাম কালীপদকে টিকে দিতে। টিকে দেওয়া হলে বললাম—ওকে শিখিয়ে দাও কি করে দিতে হয়।

বড় রাস্তার ওপর টেবিল পেতে টিকে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রাস্তার লোক ডেকে ডেকে ছেলেরা টিকে দিত। সেদিন ঐখানেই কালীপদর ডিউটি দিলাম। দুপুর থেকে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার পর পোস্টে গিয়ে কে কত টিকে দিয়েছে মেলাতে গিয়ে দেখি, কালীপদর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। রাস্তা থেকে ধরে এত বেশী লোককে টিকে এর আগে আর কোনো কর্মী আমার পোস্টে দিতে পারেনি।

দেখে ওর প্রতি আজ সত্যি মায়া হল। রুক্ষ ভাব কেটে গিয়ে দুঃখ হল। সমবেদনায় এই প্রথম মনটা ভরে উঠল।

বছর কুড়ি আগে কলকাতা শহরে লোকের অনুপাতে বাড়ি অনেক বেশী ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে লোকে যে বাড়তি টাকা কামিয়েছিল তা দিয়ে নতুন বড় রাস্তার ওপরে ততদিনে অনেক চারতলা পাঁচতলা বাড়ি তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু তা ভাড়া নেবার মত যথেষ্ট লোক তখনও শহরে আসেনি।

মাসে গোটা কুড়ি টাকা দিতে পারলেই ভাল পাড়ায় দুখানি ঘর নিয়ে একটা ফ্ল্যাট পাওয়া মোটেই কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ঐ টাকাই মাস মাস পকেট থেকে বার করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই বিনা ভাড়ায় কি করে শহরে থাকা যায় তার একটা বুদ্ধি আমাকে বার করতে হল।

ভাবলাম কম ভাড়ায় বড় একটা বাড়ি যদি ভাড়া নিই, আর নিজের জন্য খান দুই ঘর রেখে বাকীগুলি যদি ভাড়া দিই তাহলে নিশ্চয়ই ভাড়াটা উঠে আসবে। আমার নিজের ঘর-ভাড়া লাগবে না। এই ভেবে অফিস এবং কলেজ পাড়ায় দু-চারদিন ঘুরে অনেক বড় বড় বাড়ির গায় 'টু লেট' লেখা দেখে একখানা চারতলা নূতন বাড়ি পছন্দ করে ফেললাম। এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে এক মাসের বাড়িভাড়া জমা দিয়ে বাইশখানা ঘরওয়ালা চারতলা একখানা বাড়ি একদিন দখল করে বসলাম। চারতলার ওপর নিজের জন্য দু-খানা ঘর রেখে দোতলা তিনতলার কুড়িখানা ঘরে ভাড়াটে বসিয়ে দিলাম। অত বড় নূতন বাড়ি, ভাড়া মাত্র ১৬০৲। ভাড়াটে পেতে বিশেষ কষ্ট হল না।

কিন্তু কিছুদিন যেতেই বুঝলাম ভাড়াটে পাওয়া যত সহজ, ভাড়া আদায় করা তত সহজ ব্যাপার নয়। বিপাকে পড়ে অনেকেই বাকী ফেলে, কেউ কেউ ফেলে ইচ্ছে করে। একবার বাকী পড়লে সহজে আর তা আদায় হয় না। তবু মার্জিনটা বেশী থাকায় এবং ব্যবসাবুদ্ধি ক্রমশ ক্রমশ মাথায় ঢোকায় অনেকদিন ঐ বাড়িতে বিনে ভাড়ায় কাটিয়ে দিলাম।

তখন সবে গত মহাযুদ্ধ বেধেছে। নামকরা জার্মান অষুধ সব কালো বাজারে চলে গেছে। গভর্নমেন্টের ড্রাগ কন্ট্রোলকে কলা দেখিয়ে ড্রাগু

ব্যবসায়ীরা দিশী কুইনিন পর্যন্ত বাজার থেকে সরিয়ে ফেলেছে। বাজার থেকে কুইনিন এমপ্যুল কিনে ইন্‌জেক্‌শন দিলে তখন আর ম্যালেরিয়া সারে না। মরফিন দিলে ব্যথা কমে না। এমিটিন দিলে আমাশা বন্ধ হয় না। অথচ বেশী দাম দিলে সব অষুধই পাওয়া যায় এবং কাজও বেশ হয়। অচেনা কোনো দোকান থেকে হঠাৎ কখনও অষুধ কিনতে তাই আমাদের সাহস হত না।

সেই সময় পূর্ব বঙ্গ থেকে আমার এক চেনা ভদ্রলোক একটি রুগী পাঠালেন। আমার নামে একখানা চিঠি হাতে করে সুটকেশ বিছানা সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক একদিন সকালে এসে হাজির হলেন।

শুনলাম, ও'র স্ত্রীর অসুখ, চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একখানা ঘর খালি ছিল, ভদ্রলোক আগাম ভাড়া দিয়ে সস্ত্রীক সেখানে ঢুকে পড়লেন।

দেখলাম ভদ্রলোকের বয়েস বেশী নয়, আমাদেরই সমবয়েসী। নাম সমীর রায়। কলকাতা থেকে ৫।৬ বছর আগে ল পাশ করে দেশে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন কিন্তু পসার তেমন জমেনি। তাই আদালত ছেড়ে অন্য কিছু ব্যবসা করার মতলবে আছেন। কিন্তু বাপ ভারি কড়া লোক। নিজে ব্যবসা করেন, জায়গা-জমি আছে, নগদও বেশ কিছু জমিয়েছেন ; কিন্তু ছেলেকে ব্যবসায় নাবিয়ে সে সব নষ্ট হতে দিতে তিনি রাজী নন।

সমীর বলল—চিকিৎসার নাম করে এসেছি কিন্তু শিগগির আর ফিরে যাচ্ছি না। দেখি এখানেই যদি কিছু করতে পারি।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার স্ত্রীর কি অসুখ?

সমীর বলল—কি নয় তাই জিজ্ঞাসা করুন। আজ চার বছর বিয়ে হয়েছে, বছর দুই বেশ ভাল ছিল। কোনো অসুখ-বিসুখের কথা শুনিনি। তারপর থেকেই কী যে শুরু হয়েছে, আজ মাথা ব্যথা, কাল জ্বর, পরশু পেট ব্যথা। নিত্যি একটা না একটা কিছু লেগে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—বাচ্চা-টাচ্চা কিছু হয়নি?

সমীর বলল—বছর দুই আগে একটি হয়েছিল। সেই থেকেই যত গোলমালের শুরু। এই যে ছিপছিপে পাতলা চেহারাটি এখন দেখছেন আগে এমনটি ছিল না। তিনটি বছর ধরে মেয়ে দেখে দেখে বাবা ভাল স্বাস্থ্য আর লেখাপড়া জানা দেখে এই বৌটি ঘরে এনেছিলেন। একটি পয়সাও যৌতুক নেননি। সেই চেহারা দেখুন এখন কি হয়েছে।

বললাম—সেই বাচ্চার কি হল?

সমীর বলল—আর বলেন কেন? ডেলিভারি হওয়ার সময়েই সেটি মারা গেল। মফস্বলের ডাক্তার তো! জীবনে সেই বোধ হয় প্রথম ফরসেপস্ দিল। বলল মাথা শক্ত হয়ে গেছে অমনি বেরুবে না। ফরসেপস্ দিয়ে টানাটানি করে বার করে দেখা গেল বাচ্চা নীল হয়ে গেছে। তাকে আর বাঁচানো গেল না। সে না হয় গেল; গাছ বেঁচে থাকলে অনেক ফল হবে কিন্তু সেই থেকেই ইনি পড়লেন। জ্বর, মাথা ঘোরা, রক্ত নেই, একটার পর একটা চলছে। চোখের ওপর দেখছি লতা দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওখানে চিকিৎসায় কিছু ফল হচ্ছে না দেখে অবশেষে বাবা এখানে পাঠাতে রাজী হলেন।

বললাম—বেশ তো, বিকেলে ওঁকে দেখে কাকে দেখানো ভাল হয় ঠিক করা যাবে এখন।

বিকেলে সমীরের স্ত্রী লতাকে দেখলাম। ২৫।২৬ বছরের শ্যাম-বর্ণা মেয়েটি, ভারি সপ্রতিভ। মুখখানা ভারি মিষ্টি। অসুখে ভুগে ভুগে চেহারা একটু শুকনো, কিন্তু চোখ দুটি বুদ্ধিতে খুশীতে উজ্জ্বল।

হেসে বলল—দুবচ্ছরে অনেক চিকিৎসা হয়েছে এখন দেখি এখানে কি হয়। আমার অসুখ আপনারা সারাতে পারবেন না।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

হেসে লতা বলল—অসুখই নেই তো সারাবেন কি?

কথার রকম শুনে হেসে ফেললাম। বললাম—তা হলে এখানে এলেন কেন?

লতা দুষ্টুমিভরা চোখে একবার সমীরের দিকে তাকিয়ে বলল—বেড়াতে। কিন্তু সে কথা বললে কখনও আসা যায়? তাই অসুখের নাম করে এসেছি।

বললাম—বেশ তো, আজকেই তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে রাখা যাক। তারপর যত ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবেন।

সমীর বলল—আজকেই ওটা চুকিয়ে ফেলুন। বাবা বলে দিয়েছেন আজকেই ডাক্তার দেখিয়ে কি হল একটা খবর দিতে। কখন উনি দেখবেন? আগে থেকে ফোন করে যাওয়া ভাল হবে না কি?

দেখলাম কাকে দেখানো হবে আগে থেকেই এরা ঠিক করে এসেছে। ইনি আমাদের কলেজের প্রধান অধ্যাপক। তখন এঁর খুব নাম। আমাদের কেস্ খুব যত্ন নিয়ে দেখতেন। ফি নিয়ে কখনো কড়াকড়ি করতেন না। যেমন ভাল পড়াতেন তেমনি ছিল তাঁর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা।

আউটডোরে যেদিন ইনি যেতেন রুগীতে ঘর ভরতি হয়ে যেত। তার ওপর তিনি ছিলেন পরীক্ষক। কাজেই ছাত্ররা সুযোগ পেলেই এঁকে দিয়ে রুগী দেখাত।

বললাম—ফোন করবার কোনো দরকার হবে না। কাছেই তো ওঁর বাড়ি। হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। এখনি রওনা হতে পারলে অন্য রুগী আসবার আগেই আমরা পেঁছে যাব।

সমীর বলল—তাহলে তাই চলুন। আপনি ততক্ষণ এই রিপোর্টগুলো দেখুন। লতা তৈরী হয়ে নিক।

দেখলাম মল মূত্র রক্ত থুথু সব পরীক্ষা করানো হয়েছে। বুকের এক্‌স্‌রে ছবি তোলা হয়েছে। মফস্বলের ছবি, খুব ভাল ওঠেনি। রিপোর্টে দেখলাম বুকে একটা গ্ল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোনো দোষ পাওয়া যায় নি। আগে রক্তশূন্যতা ছিল, অষুধ খেয়ে আর ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে তা এখন ঠিক হয়ে গেছে। জ্বরটা শুধু ছাড়ে নি।

বাচ্চা হবার পরেই যে জ্বর হয় তিন মাস পরে তা ছাড়ে। তারপর গত ছ মাস থেকে সমানে জ্বর হচ্ছে। অল্প ঘুষ-ঘুষে জ্বর। কোনো দিন দুপুরে, কোনো দিন বিকেলে কখনও বা রাত্রে আসে। কোনো দিন ৯৯°, কোনো দিন বা ১০০°। মাঝে মাঝে কিছুদিন আবার মোটেই জ্বর হয় না।

লতা তৈরী হয়ে এল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে যখন পেঁছুলাম তখন তিনি সবে নীচে নেবেছেন। রুগীরা কেউ তখনও আসে ন। আমরাই প্রথম। স্লিপে নাম লিখে পাঠাতেই ডাক পড়ল।

লতার অসুখের কথা সব শুনে খুব ভাল করে ওকে পরীক্ষা করলেন। বুক পিঠ বাজিয়ে দেখলেন। নাক, কান, চোখ, দাঁত, জিভ, গলা সব পরীক্ষা করলেন। পেটে কিছু দোষ আছে কি না সব দেখে আগের রিপোর্টগুলো চাইলেন। রিপোর্ট ও জ্বরের খাতা দেখে এক্‌স্‌রে ছবিখানা আলো দেওয়া ভিউবক্সে চাপিয়ে দিলেন। বললেন—বুকে কিছু দোষ নেই। এটা বি কোলাই। ইউরিনটা একবার কালচার করিয়ে নাও।

লতাকে বললেন—কোনো ভয় নেই। অষুধ লিখে দিলাম, সেরে যাবে।

পথে বেরিয়ে লতা জিজ্ঞাসা করল—বি কোলাইটা কি অসুখ?

বললাম—ওটা ইউরিনের এক রকম ইনফেক্‌শন। মেয়েদের খুব হয়। আর অনেক দিন ভোগায়। কোমরে ব্যথা হয়। লতা বলল—আমার তো

কোমরে কোনো ব্যথা নেই। জ্বালা-যন্ত্রণাও কিছু বুঝি না। একটু গা গরম হয় তা এতদিনে সয়ে গেছে।* ইউরিনে তো কখনও কোনো দোষ পাওয়া যায় নি। এ অসুখ কি করে হল?

সত্যি বি কোলাই হলে ইউরিনে দোষ পাওয়া যাবেই। এতবার পরীক্ষা হয়েছে কখনও কোনো দোষ পাওয়া যায় নি। তবু কেন মাস্টারমশাই বি কোলাইর কথা বললেন আমি নিজেই বুঝি নি। কিন্তু সে কথা লতাকে কি করে বলি?

· বললাম—এমনি কোনো দোষ পাওয়া যায় নি বলেই কালচার করতে বলেছেন। কাল ওটা করা যাবে। তাহলেই দেখবেন ঠিক ধরা যাবে।

পরদিন ইউরিন কালচারের জন্য• পাঠান হল। কিন্তু বি কোলাই পাওয়া গেল না। তবু মাস্টারমশাই তাঁর ডায়গনোসিস বদলালেন না। বললেন, অনেক দিন ধরে চিকিৎসা হচ্ছে তাই বীজাণু গজায় নি। রক্ত এবং স্টুলটা আর একবার পরীক্ষা করাও।

আবার রক্ত এবং স্টুল পরীক্ষা করানো হল। এবারেও কোনো দোষ পাওয়া গেল না। মাস্টারমশাই বললেন—রুগী তো ভালই আছে। মুখে ৯৯° জ্বর: ও কিছুই না। সব খেতে দাও। দুবেলা একটু ঘুরে-টুরে বেড়াক। দিন সাতেক জ্বর দেখা বন্ধ করে দাও।

শুনে লতার খুব ফুর্তি। বলল—দেখলেন তো, আমার কোনো অসুখই হয়নি। এইবার রোজ থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে বেড়াব।

বললাম—অতটা বাড়াবাড়ি নাই বা করলেন। দিন সাতেক দেখুন। তার পর না হয় আর একজন কাউকে দেখানো যাবে।

লতা বলল—না না, আর কাউকে আমি আর দেখাব না। এখানে এসে আমি তো বেশ ভাল আছি। জ্বর যে হয় তা তো টেরই পাই না।

লতা শুনল না। খুব কয়েকদিন থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে রোজ এসে গল্প করত। একদিন বলল—মাথাটা বড্ড ধরেছে, কি করি বলুন তো?

নাড়ী দেখলাম খুব দ্রুত। গা বেশ গরম। জ্বরটা বেড়েছে মনে হল। বললাম—জ্বরটা একবার দেখুন তো থার্মোমিটার দিয়ে।

লতা বলল—জ্বর দেখতে না আপনার মাস্টার মশাই বারণ করেছেন? ও দেখে আর কাজ নেই। মাথাধরার একটা অষুধ কিছু দিন। তাইতেই ঠিক হয়ে যাবে।

এস্‌পিরিন দিয়ে একটা পাউডার করে দিলাম। মাথা ধরা ছেড়ে

গেল। লতা খুশী হল। কিন্তু পর দিনই বলল, কাঁধে খুব ব্যথা। আবার ঐ পাউডার দিলাম।

মাস্টার মশাই বললেন—ওটা হিস্টিরিয়া। এস্‌পিরিন দিচ্ছ দাও। কিন্তু রোজ এক সি সি করে ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার ইন্‌জেক্‌শন কর মাস্‌ল্‌-এর মধ্যে। তাতেই সেরে যাবে।

শুধু শুধু ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার কাউকে ইন্‌জেক্‌শন এর আগে আর আমি করি নি। শুনেছি রুগীর কাছ থেকে পয়সা বার করতে হলে এসব নাকি মাঝে মাঝে দিতে হয়।

লতাকে এক সি সি ইন্‌জেক্‌শন দিতেই যন্ত্রণায় ও হাত সরিয়ে নিল। বলল—আপনি বড্ড লাগিয়ে দিলেন। এত ইন্‌জেক্‌শন নিয়েছি কই এত ব্যথা তো কখনও পাই নি।

এইবার বুঝলাম কেন মাস্টার মশাই এই ইন্‌জেক্‌শন দিতে বলেছেন।

বললাম—ঐ জায়গাটায় একটু মাসাজ করুন, ব্যথা চলে যাবে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ব্যথা চলে গেল।

রোজ ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার ইন্‌জেক্‌শন দিই আর এস্‌পিরিন খাওয়াই। লতা কিন্তু সারল না। ক্রমশ কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এত যে থিয়েটার বায়োস্কোপ আর বাইরে বেরুবার শখ, তাও যেন কমে গেল। সারা দিন শুয়ে-বসেই কাটাত। বলত, ভাল লাগে না।

একদিন রাত বারোটার সময় লতার চিৎকার শুনে ওপর থেকে ছুটে নেবে ওর ঘরে গিয়ে দেখি লতা চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে দুহাত দিয়ে মাথার চুল ধরে টানছে আর বলছে—গেল গেল সব ছিঁড়ে গেল। মাথার ভেতরে কে যেন ছুঁচ ঢুকিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। মরে গেলাম।

পাশে হতভম্ব হয়ে সমীর দাঁড়িয়ে। আমি যেতেই বলল—এ কি হল ডাক্তার?

লতাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

দু চোখ পাকিয়ে কপালে তুলে দুহাত দিয়ে লতা চুল ছিঁড়তে লাগল। আমার কথা কিছু যে কানে গেল তা মনে হল না।

নাড়ী দেখলাম বেশ ভাল। একটু দ্রুত। সে তো বরাবরই ওর থাকে। গা দেখলাম গরম নয়। বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর পাচ্ছি না। কিছু একটা করুন। উঃ। বলে দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে রইল। একটা কিছু অষুধ আনবার জন্য উঠতেই হঠাৎ শক্ত করে আমার

হাতটা চেপে ধরল, মনে হল ওর নখ বুঝি আমার হাতে বসে যাবে।

কোনও রকমে জোর করে ওর হাত ছাড়িয়ে উঠে এলাম। এটা যে হিস্টিরিয়া তাতে আর কোনো সন্দেহ রইল না। বুঝলাম এক্ষুনি কড়া দেখে একটা ঘুমের অষুধ ওকে দেওয়া চাই। আর এক সি সি ডিস্‌টিলড্‌ ওয়াটার ইন্‌জেক্‌শন।

সেই সময় কিছুদিন আগে এক পাগল রুগীর চিকিৎসা আমি করেছিলাম। কোনো অষুধে তার ঘুম হত না। যতই কড়া হোক, কোনো কাজ হত না। সারা দিন রাত চেঁচিয়ে বক্তৃতা করত, কবিতা আওড়াত। বাড়ির কাউকে ঘুমুতে দিত না। একদিন জার্মানীর ই মার্কের একটি ফ্যানোডরম্‌ ট্যাবলেট দিয়ে দেখা হল। কি আশ্চর্য একটি ট্যাবলেটেই ঐ বদ্ধ পাগল বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে রইল। খুঁজে দেখলাম সেই অষুধ এক টিউব আমার বাক্সে আছে। তাই থেকে একটি বড়ি লতাকে খাইয়ে দিলাম। মাস্টার মশাইর নির্দেশ মত এক সি সি ডিসটিল্‌ড্‌ ওয়াটার ইন্‌জেক্‌শন দিলাম। আজ কিন্তু ইন্‌জেক্‌শনে অত ব্যথা লতা পেল না। উঃ আঃ কিছুই করল না। শুধু আমার দিকে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে লতা ঘুমিয়ে পড়ল। সমীরকে বললাম—ভয় নেই কিছু। কাল ঘুম থেকে উঠলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। আজকের রাত্রির কথা দেখবেন মনেও পড়বে না।

পরদিন সকালে দেখলাম লতা খুব ঘুমুচ্ছে। সমীরকে বললাম—যতক্ষণ নিজে থেকে ঘুম না ভাঙে ততক্ষণ আর ওকে জাগাবেন না। জাগলে চা-টা সব খেতে দেবেন। তারপর স্নান করে ভাত খাবে।

দুপুরে বাড়ি ফিরে শুনলাম লতা একবার চোখ মেলে এক গ্লাশ জল খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

বললাম—ভালোই হয়েছে। এই ঘুমটা খুব ভাল লক্ষণ। যত বেশী ঘুমোয় ততই ভাল।

বাইরে একটু কাজ ছিল, খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম। বিকেলে বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠতেই দেখি লতার ঘরে মহা হুলুস্থুল কাণ্ড। পাশের ঘরের লোকেরা ওর দরজায় এসে ভিড় করেছে। সবাইর চোখেমুখে একটা থমথমে ভয় বিষাদের ভাব। মনে হল যেন সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

ভেতরে গিয়ে দেখি সমীর লতার মাথায় জল দিচ্ছে হাওয়া করছে।

পাশের ঘরের কে একজন এক বালতি জল নিয়ে এসেছে। ঘরের মেঝে জলে ভেসে গেছে। মনে হল এক্ষুনি এরা লতার মাথায় জল ঢেলে ধুইয়ে দিয়েছে। বিছানা খানিকটা ভিজে গেছে। দেখলাম লতা চিত হয়ে শুয়ে আছে। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। চোখ দুটি ঘোলাটে, লাল রক্তবর্ণ। ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে। মাথা এ-পাশ ও-পাশ নাড়ানো যায় না। বুকে ঘড়-ঘড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কখন এরকম হল?

সমীর বলল—বেশ ঘুমুচ্ছিল। আধ ঘণ্টা আগে হঠাৎ জেগে বলল, জল খাব। এক গ্লাশ জল এনে দিতেই খানিকটা খেয়ে কি হল হাত থেকে গেলাস বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। লতা বিছানায় চিত হয়ে পড়ে গেল। মুখ দিয়ে কি রকম শব্দ বেরুতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে, কি কষ্ট কিছুই বলতে পারল না। চোখ দুটো বড় বড় করে শুধু তাকিয়ে রইল। আমার চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে এঁরা সব ছুটে এসে মাথাটা ধুইয়ে দিলেন। কিন্তু আর জ্ঞান ফিরল না।

তাড়াতাড়ি একটা এট্রোপিন ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে বললাম—এক্ষুনি একবার মাস্টারমশাইকে আনা দরকার।

সমীর বলল—এক্ষুনি এখানকার এক ভদ্রলোক ওঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি নেই। কলে বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে।

বললাম—তাহলে আমাদের অন্য এক প্রফেসরকে ডাকি। এমনি করে তো একে আর ফেলে রাখা যায় না।

সমীর বলল—বেশ, যা ভাল হয় তাই করুন।

কাছেই একটা দোকান থেকে ফোন করে দিলাম। প্রফেসর বললেন, এক্ষুনি আসবেন।

মিনিট পনরোর মধ্যেই প্রফেসর এসে গেলেন। খুব ধীর স্থির প্রবীণ চিকিৎসক। সব কথা শুনে লতাকে পরীক্ষা করে খুব গম্ভীর মুখে বললেন—বুকের কোনো এক্‌স্‌-রে তোলা হয়েছে?

বললাম—এখানে তোলা হয়নি। মাসদেড়েক আগে বাইরে তোলা হয়েছে।

প্লেটখানা দেখালাম। বললাম—মফস্বলে তোলা বিশেষ ভাল হয়নি।

জানালার কাছে এনে প্লেটখানা দেখে প্রফেসর বুকের সেই গ্ল্যান্ডটা দেখিয়ে বললেন—এইটে থেকেই ইনফেক্‌শন স্প্রেড করেছে। টিউবারকুলার মেন্‌ইন্‌জাইটিস্‌ হয়েছে।

তখনকার দিনে টি বি-রই কোনো অষুধ বেরোয়নি। তার ওপর মেন্‌ইন্‌জাইটিস্‌। টিউবারকুলার মেন্‌ইন্‌জাইটিস্‌ বলে রোগ নির্ণয় করা আর মৃত্যু দণ্ড দেওয়া তখন একই কথা। এ রোগ হলে তিন সপ্তাহের মধ্যেই রুগীর মৃত্যু হত। বাঁচলে মনে হত রোগ নির্ণয়েই বুঝি ভুল হয়েছে। তাই প্রফেসরের মুখে এই কথা শুনে ভয়ে আতঙ্কে আমার মুখ শুকিয়ে গেল।

বললাম—তাহলে কি হবে?

প্রফেসর বললেন—তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর লাম্‌বার পাংচার দরকার হবে। এখানে তা পারবে কি?

বললাম—এখানে ওসব অসম্ভব। তার চেয়ে হাসপাতালে আপনার আণ্ডারে ভরতি করে দিই।

প্রফেসর বললেন—সেই ভাল। এম্বুল্যান্স ডেকে তুমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ভরতি করে আমার হাউস ফিজিসিয়ানকে টেলিফোন করতে বোল। যা দরকার সব তখন বলে দেব। এট্রপিন তো দিয়েইছ, একটা কার্ডিয়াজল ইন্‌জেক্‌শন দাও এক্ষুনি। ব্লাডটা ঝরিয়ে নাও।

প্রফেসর চলে গেলেন। কার্ডিয়াজল ইন্‌জেক্‌শন করে দিলাম। লতার কোনো হুঁশ নেই। টেরও পেল না। প্যাথলজিস্ট এক বন্ধুকে টেলিফোন করে দিলাম। তিনি এসে রক্ত নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন। দেখা গেল মেন্‌ইন্‌জাইটিস্‌ই বটে এবং টিউবারকুলার।

এতক্ষণে সমীর কথা বলল। জিজ্ঞাসা করল—রোগটা কি? টি বি?

বললাম—তাই তো সন্দেহ হচ্ছে।

দেখলাম সমীরের মুখ শুকিয়ে গেছে। ভয়ে আতঙ্কে কি বলবে বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। কিন্তু ওকে ভরসাই বা দিই কি করে?

সমীর বলল—বাঁচবে কি?

যা জানতাম তা ওকে বলতে পারলাম না। শুধু বললাম—এ অতি কঠিন রোগ। এখানে রেখে কোনো চেষ্টাই করা যাবে না। তাই প্রফেসর হাসপাতালে পাঠাতে বললেন। ওঁর নির্দেশ মত সব চেষ্টাই সেখানে করা যাবে।

সমীর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। বলল—আমার এক কাকা থাকেন এখানে। তাঁকে একবার ফোন করি। দেখি তিনি কি বলেন। খবর পেলে তিনি নিশ্চয় আসবেন।

কাকার নিজের ফোন নেই। পাশের বাড়িতে ফোন করে খবরটা দেওয়া

হল। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেও তিনি এলেন না দেখে সমীর বলল—এম্বুল্যান্সই ডাকা যাক। চলুন হাসপাতালেই দিয়ে আসি।

তখনকার দিনে এম্বুল্যান্স ডাকলেই সাড়া পাওয়া যেত। দশ পনর মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে গেল। স্ট্রেচারে করে লতাকে উঠিয়ে গাড়িতে তুলে দিল। সমীরকে নিয়ে আমি সঙ্গে চললাম।

হাসপাতালে এসে সোজা ইনফেক্শন ওয়ার্ডে গিয়ে সুপারিন্-টেন্ডেন্টকে বলে লতাকে ভরতি করে দিলাম। হাউস ফিজিসিয়ানকে প্রফেসরের কথা বললাম।

তক্ষুনি লান্বার পাংচার করে শিরদাঁড়া থেকে জল বার করে তা পরীক্ষা করা হল। টি বি-র বীজাণু তাতে পাওয়া গেল না কিন্তু টি বি-র অন্য সব প্রমাণ পাওয়া গেল। ঠিক হল এই জল কাল গিনিপিগের দেহে ইন্জেক্শন দেওয়া হবে। যদি টি বি হয় তিন চার সপ্তাহ পরে গিনিপিগের পেটে টিউবারকল্ পাওয়া যাবে।

হাসপাতাল থেকে যে অষুধপত্র কিনে দিতে বলা হল তা দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। রাত তখন প্রায় ৯টা।

বাড়ি এসে নিজের ঘরে ঢুকে দু হাতে মুখ ঢেকে সমীর বসে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে বললাম—চলুন ওপরে। আজ আমার সঙ্গেই খাবেন।

প্রথমে কিছুটা আপত্তি করে সমীর উঠে এল। কি একটা ছুটিতে ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার স্ত্রী তখন দেশে। চারতলার দুখানা ঘরে আমি একা। ওপরে উঠে হাতমুখ ধুয়ে চাকরকে খাবার দিতে বললাম। সমীর কোনো কথা না বলে চুপ করে খেল। খাওয়া হলে বললাম—আজ এইখানেই শুয়ে পড়ুন। নীচে গিয়ে আর কাজ নেই।

সমীর কোনো আপত্তি করল না। শুয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল—টি বি-ই যদি হবে তাহলে প্রথমে আপনাদের যে অধ্যাপক দেখেছিলেন তিনি কেন ধরতে পারলেন না?

খুবই কঠিন প্রশ্ন। আমিও সে কথাই এতক্ষণ ভেবেছি। কী উত্তর এর দেব? বললাম—তখন তো এক জ্বর ছাড়া অন্য কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি তাই ওটা উনি বি-কোলাই ভেবেছিলেন।

সমীর বলল—অতবড় ডাক্তার; কলকাতায় এবং বাইরে এত নাম; তাঁর এরকম ভুল হয় কি করে?

বললাম—ভুল তো সবাইর হয়। সে কথা ভেবে এখন আর কি হবে।

পরদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম লাম্‌বার পাংচার করা হচ্ছে, প্রন্‌টসিল দেওয়া হচ্ছে। লতার কোনো হুঁশ নেই। একই রকম অবস্থা।

সমীর রোজ দুবেলা যায়, দেখে আসে, অষুধ কিনে দেয়।

একদিন এসে বলল—ডাক্তাররা নিজেরা বলাবলি করছিল, এই রোগ হলে নাকি কেউ বাঁচে না এবং খুব নাকি ছোঁয়াচে?

বললাম—ছোঁয়াচে তো বটেই।

সমীর জিজ্ঞাসা করল—আমার নিজের হবে না তো?

বললাম—রোগটা ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তবু একথা কেন ভাবছেন?

সমীর বলল—কিন্তু আমি তো রোজ যাই। ঘণ্টাখানেক রুগীর পাশে বসে থাকি। সেই থেকে তো আমার হতে পারে।

এই সময় ওর এই উদ্বেগের বাড়াবাড়ি দেখে খুব খারাপ লাগল। বিরক্তি বোধ হল।

বললাম—তাহলে ডাক্তার নার্সরা কেউ বাঁচতো কি? আপনার অতই যদি ভয় তাহলে ঘরে না ঢুকলেই হল। দূর থেকে দেখে অষুধ-বিষুধের যা দরকার দিয়ে চলে আসবেন।

সমীরের সঙ্গে তারপর দিন আর দেখা হল না। হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম রুগীর ঘরে ও ঢোকে না। নাকে রুমাল দিয়ে বাইরে থেকে একবার দেখেই পালিয়ে আসে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে দেখি সমীর স্যুটকেস গুছিয়ে বিছানা বাঁধছে। আমাকে দেখেই বলল—এই যে ডাক্তার, আমি আজ বাড়ি যাচ্ছি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি?

বললাম—সে কি? লতাকে ফেলে? এই সময়ে?

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে একটু হেসে সমীর বলল—কাল থেকে লতার বাবা মা এসেছেন। তাঁরাই এখন সব দেখাশুনা করছেন। তা ছাড়া বাবার টেলিগ্রাম এসেছে। মার খুব অসুখ। কাজেই আমি আর থাকি কি করে?

কি বলব কিছুই ভেবে পেলাম না। মুখ ভার করে উপরে উঠে এলাম। সেই দিন রাত্রে সমীর সত্যি চলে গেল। তিন দিন পর লতার মৃত্যু হল।

॥ ১২ ॥

হাসপাতালে ভরতি হওয়া আজকাল কত কঠিন এবং কতদিন যে সেজন্য ঘোরাঘুরি করতে হয় ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানেন। প্রসূতি হাসপাতালে পর্যন্ত দেখি নোটিশ টাঙিয়ে দেয়—বিছানা খালি নাই, ভরতি বন্ধ।

কিছুদিন আগে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাসপাতালে ভরতি হবার জন্য আমার কাছে এক মুসলমান ভদ্রলোক এলেন। আমার ছোট ভাই-এর পুরনো রুগী। চিঠি নিয়ে এসেছেন, ভরতি করে দিতেই হবে।

দেখলাম মৌলভী সাহেবের বয়েস হয়েছে। পঞ্চাশের ওপর মনে হল। চাপ-দাড়ি পাক ধরেছে। মাথায় টাক পড়েছে। লম্বা চওড়া দেহ, এখনও বেশ শক্ত সবল আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কি অসুখ?

মৌলভী সাহেব হেসে বললেন—কি অসুখ তা জানতেই তো কলকাতায় আসা। ওখানকার ডাক্তাররা যা বলে তা আমার বিশ্বাস হয় না। কিছু বোঝে না, শুধু আন্দাজে ঢিল মারে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কষ্টটা কি?

মৌলভী সাহেব বললেন—পেটে ব্যথা। কিছু খেতে পারি না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কতদিন থেকে হয়েছে?

মৌলভী সাহেব বললেন—তা ধরুন গিয়ে এক বছর। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে ব্যথা হত। আবার কমে যেত। আপনার ভাই চিকিৎসা করতেন। কয়েকদিন পর বললেন এটা গ্যাস্ট্রিক আলসার। দুধ আর গলা ভাত খেতে হবে। কিছুদিন তাই খেয়ে দেখলাম। অনেকদিন ভালও ছিলাম। তারপর ভাবলাম ঝাল মাংসই যদি না খেতে পাই তাহলে বেঁচে কি সুখ? তাই আবার গোস্ত খেতে শুরু করলাম।

বললাম—মাংস খেতে তো বারণ নেই, ঝাল লঙ্কা না খেলেই হল।

মৌলভী সাহেব বললেন—ঝাল ছাড়া কি কাবাব কোর্মা হয়? সায়েবদের মত আধা সেদ্ধ আর আধ-পোড়া মাংস আমরা খাই না, প্রবৃত্তি হয় না। মাংসই যদি খাব ঠিক মত মশলা দিয়ে তা রান্না হওয়া চাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—এই ঝাল মাংস খেয়েই আবার ব্যথা বাড়ল?

মৌলভী সাহেব বললেন—আপনার ভাই বলেছিলেন ঝাল খেলেই আবার ব্যথা হবে কিন্তু ওঁকে না জানিয়ে তিন মাস আমি ঝাল খেয়েছি কিছুই হয় নি।

বললাম—তারপর ব্যথা আবার হল কবে?

মৌলভী সাহেব বললেন—একদিন দুপুরে খেতে বসেছি দু তিন গ্রাস খাবার পরই মনে হল ওটা পেটে ঠিক যাচ্ছে না, কোথায় যেন আটকে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ব্যথা। পেটে বুকে পিঠে পাঁজরে। মনে হল কে যেন বুকটা ভীষণ জোরে চেপে ধরেছে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপর ওটা বমি হয়ে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর ব্যাথাটাও আস্তে আস্তে কমে গেল। ভয়ে পেয়ে আপনার ভাইকে ডেকে পাঠালাম। তিনি এসে অষুধ দিলেন আবার ওই দুধ আর গলা ভাত খেতে বললেন।

বললাম—ওতে ব্যথা কমল?

মৌলভী সাহেব বললেন—এবার কিন্তু আর কমল না। অষুধ খেলেও যা, না খেলেও তাই। তখন আপনার ভাই বললেন এক্‌স্‌রে করাতে হবে। এক্‌স্‌রে করে আলসার ঠিক পাওয়া গেল না। তখন সন্দেহ করলেন ক্যানসার। বললেন—এক্ষুনি কলকাতা যান।

বললাম—কতদিন আগে?

মৌলভী সাহেব বললেন—তা মাস তিনেক হবে। জানেন তো কলকাতা আসা আজকাল কত হাঙ্গামা। ভিসা-ই পাওয়া যায় না। তারপর টাকা পয়সা নিয়ে আসা মুশকিল। তাই ঢাকা গেলাম।

বললাম—ওরা কি বলল?

মৌলভী সাহেব বললেন—ওখানকার মেডিক্যাল কলেজের বড় ডাক্তারেরা দেখে বলল এটা পাকস্থলীর ক্যানসার। এক্‌স্‌রে আলো দিতে হবে। দু মাসে একুশ-টা আলো দেওয়া হল। ব্যথাও অনেক কমে গেল। বলল, ছ মাস পরে আবার যেতে। বাড়ি ফিরে আসতেই আবার ব্যথা, কিছু খেতে পারি না। যা খাই তাই উঠে আসে। আপনার ভাই এক্‌স্‌রে ছবি আর হাসপাতালের চিকিৎসার সব রিপোর্ট দেখে বললেন, এটা ক্যানসারই বটে। এখনও বোধ হয় অপারেশন করা যায়। শিগ্‌গির কলকাতা যান। এতদিনে ভিসাও পেলাম তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।

বললাম—দেখি সেই একস্‌রে্‌ ছবি আর রিপোর্ট।

মৌলভী সাহেব বললেন—ভুলে সে সব ফেলে এসেছি। প্রথম যে ছবি তোলা হয়েছিল সেটাই শুধু আছে।

দেখলাম ছবিটা বিশেষ ভাল হয় নি। কি হয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রিপোর্টে অবশ্য সন্দেহ করা হয়েছে এটা বোধ হয় পাকস্থলীর ক্যানসার।

বললাম—এটা থেকে তো ভাল বোঝা যাচ্ছে না। আবার ছবি তুলতে হবে।

মৌলভী সাহেব বললেন—আপনারও কি মনে হয় এটা ক্যানসার?

বুঝলাম ক্যানসার নয় বললেই মৌলভী সাহেব খুশী হন। কিন্তু তাই বা বলি কি করে?

বললাম—ঢাকাতে যখন ওরা আবার ছবি তুলে ডিপ এক্‌স্‌রে দিয়েছে তখন ঐটাই তো আগে ভাবতে হয়।'

মৌলভী সাহেব বললেন—ওদেরও ভুল হতে পারে।

বললাম—তাই আবার ছবি তুলতে হবে। পাকস্থলীর রস ক্যানসারের জন্য পরীক্ষা করতে হবে। তবে ঠিক বোঝা যাবে এটা কি।

মৌলভী সাহেব যেন একটু ক্ষুণ্ন হলেন, বললেন—আপনিও যখন ক্যানসারই ভাবছেন তখন দিন ক্যানসার হাসপাতালেই ভরতি করে। পরীক্ষা-টরীক্ষা যা দরকার সব ওখানেই হোক। শুনেছি এসিয়ার মধ্যে এইটেই নাকি সব চেয়ে বড় হাসপাতাল। মরি যদি এখানেই মরা ভাল। বুঝব বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় নি।

বললাম—হাসপাতালে ভরতি হতে চাইলেই কি ভরতি হওয়া যায়? ওরা আগে দেখবে, পরীক্ষা করবে। যদি বোঝে ভরতি করলে রুগীর বাঁচবার আশা আছে তাহলেই শুধু ভরতি করা সম্ভব হবে।

মৌলভী সাহেব বললেন—ওখানকার বড় কর্তাকে ফি দিয়ে যদি দেখাই?

বললাম—তাহলেও ভরতি হওয়া যাবে না, যদি ভরতি করে রুগীর কোনো উপকার হবার আশা না থাকে। তাই পরীক্ষা আগে করাতেই হবে। তাতে কয়েকদিন সময় লাগবে। সে ক-দিন হাসপাতালে যাতায়াত করতেই হবে।

মৌলভী সাহেব খুশী হলেন না। বললেন—আপনার কাছে এলেই আপনি ভরতি করে দেবেন, আপনার ভাই বলেছিলেন। তাই এখানে আসা। এখন আপনি বলছেন ঘুরতে হবে। তাহলে এসে কি লাভ হল?

বললাম—ক্যানসার হাসপাতালে আমার চেনা অনেক ডাক্তার আছেন। আজকে খোঁজ-খবর নিই, কাল সকালে আসবেন, কি করলে ভাল হয় সব

বলে দেব।

মৌলভী সাহেব উঠে যেতে যেতে বললেন—হোটেলে উঠেছি। অনেক খরচ। তার ওপর বিশ্রী খাওয়া। যত তাড়াতাড়ি হয় ভরতি করে দিন দয়া করে। আপনি একটু চেষ্টা করলেই পারবেন।

ক্যানসার হাসপাতালে গিয়ে এক বন্ধুকে কেস্‌টা সব বললাম। কাউকে ফি দিয়ে আগে দেখালে যদি সুবিধে হয় তাতেও রুগী রাজী সে কথাও জানালাম। বন্ধুটি বললেন—কাউকেই ফি দিয়ে দেখাতে হবে না। যদি অপারেশন করা চলে এবং রুগী রাজী থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ভরতি করা হবে। তবে ফ্রি বেড পেতে কিছু দেরি হতে পারে। পেয়িং বেড হলে একটুও দেরি হবে না।

বললাম—পেয়িং বেডই করে দিন তাহলে।

বন্ধুটি বললেন—কালই ৮টার মধ্যে একটা চিঠি দিয়ে রুগীকে পাঠিয়ে দেবেন। যত শিগ্‌গির সম্ভব ভরতি করে দেব।

বললাম—বেশ তাই হবে।

বন্ধুটি বললেন—এই রুগী ভরতি করা নিয়ে কত কাণ্ডই যে এখানে হয়। আউটডোরের টিকেটে রুগীর নাম ঠিকানা বয়েস ইত্যাদি লিখে মাসিক কত আয় তাও একটা কলমে লিখতে হয়। কেউ লেখে ৫০০, তবু ফ্রী বেড চায়। না দিলে চটে যায়। অনেকে আবার ঐ কলমটায় কিছুই লেখে না। আউটডোর অফিসার সেটা দেখে যদি জিজ্ঞাসা করে—আপনার রোজগার কত? তাতেই আবার অনেকে ক্ষেপে ওঠে। বলে, আমার ঘরের খবরে আপনার কি কাজ?

একবার হাসপাতালের ডিরেক্‌টর এর কাছে ২০।২৫ জন লোকের সই করা একখানা চিঠি এল। দেখা গেল লেখা আছে—

মহাশয়,

আপনি দেশের লোকের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া ক্যানসার হাসপাতাল নামে লোকের যথাসর্বস্ব লুটিয়া লইবার একটি অতি চমৎকার ফাঁদ পাতিয়াছেন। কাহার কাছে কত টাকা আছে, কে মাসিক কত টাকা রোজগার করে তাহা লিখিয়া না দিলে কাহাকেও ভরতি করেন না। ইহা জানিবার জন্য মাহিনা দিয়া একটি লোকও নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবিয়াছেন ইহার অর্থ কেহ বুঝিবে না। কিন্তু আমরা আপনার চাতুরী ধরিয়া ফেলিয়াছি। অতএব সাবধান। কাহার ঘরে কি আছে তাহা জানিবার চেষ্টা করিবেন না। এখনও যদি সাবধান না হন তাহা হইলে

এই জুয়াচুরী বন্ধ করিবার জন্য আমরা দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করিব। জয় হিন্দ্।

পরদিন সকালে বন্ধুটির নামে একটা চিঠি দিয়ে মৌলভী সাহেবকে হাসপাতালে পাঠালাম, বললাম—আমি বলে রেখেছি, পরীক্ষা করে যদি বোঝা যায় অপারেশন করলে ভাল হবে তাহলে ওরা নিশ্চয়ই ভরতি করে নেবে। পেয়িং বেড হলে এক্ষুনি হয়ে যাবে। ফ্রী বেড পেতে দেরি হবে।

মৌলভী সাহব বললেন—পেয়িং বেডে কত লাগবে?

বললাম—দিনে বোধ হয় তিন টাকা কি চার টাকা।

মৌলভী সাহেব বললেন—হোটেলে রোজ ছ টাকা করে নিচ্ছে তার ওপর খাওয়া অতি জঘন্য। এখানে থাকলে তবু যখন দরকার ডাক্তার নার্স সব পাব। ওখানে ব্যথায় মরে গেলেও দেখবার কেউ নেই। আপনি পেয়িং বেডেই ভরতি করে দিন।

বললাম—অপারেশন করা ঠিক হলে রাজী হবেন তো?

মৌলভী সাহেব বললেন—আপনার ভাইও বলেছিলেন অপারেশন করলেই সেরে যাবে। সেই জন্যই তো আসা। ঘা-টা কেটে বাদ দিলে যদি সেরে যায় তাহলে অপারেশন করাতে কেন রাজী হব না?

বললাম—অপারেশন করাতে অনেকেই তো ভয় পায়।

মৌলভী সাহেব বললেন—ক্যানসার হলে এমনিতেই তো মরব। না হয় অপারেশন করিয়েই মরলাম। হয় দুদিন আগে নয় দুদিন পরে। আমার অত ভয়-ডর নেই।

বললাম—তাহলে এই চিঠি নিয়ে যান। দেখবেন কোনো অসুবিধে হবে না।

চিঠি নিয়ে মৌলভী সাহেব চলে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে হাসপাতালে যাবার জন্য বেরুচ্ছি, মৌলভী সাহেব ফিরে এলেন। বিরক্ত অপ্রসন্ন মুখ। বললেন—কই আজ তো কিছু হল না। শুধু নাম লিখে নিল। বলল, কাল সকালে যেতে। ছবি তুলবে।

বললাম—ঠিক হয়েছে। কাল আবার যাবেন।

পরদিন বিকেলে মৌলভী সাহেব এসে বললেন—ছবি তোলা হয়েছে। এইবার পাকস্থলীর রস পরীক্ষা করবে। কিছু না খেয়ে সকালে আসতে বলেছে। আপনি আর একবার যাবেন দয়া করে। একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি পাওয়া গেল।

বললাম—পরীক্ষা সব আগে হয়ে যাক্ তারপর খোঁজ নেব।

পরদিন মৌলভী সাহেব এসে বললেন—পাকস্থলীর রস বার করবার জন্য আজ টিউব ঢুকিয়েছিল মুখ দিয়ে। রস তো কিছু বেরুল না শুধু রক্ত এল। এদিকে ব্যথায় আমার প্রাণ যায়। বলেছে কাল আবার যেতে। কাল আবার টিউব ঢোকালে ঠিক মরে যাব। আপনি আজ একবার চলুন একটু বুঝিয়ে বলবেন। আমি বললে ওরা শোনেই না।

দেখলাম মৌলভী সাহেব ভয় পেয়েছেন। বললাম—টিউব ঢোকাতে যাতে ব্যথা না লাগে তার জন্য অষুধ ওরা দেবে। কাল যাবেন ঠিক। আমি আজ গিয়ে বলে আসব এখন।

মৌলভী সাহেব বললেন—টিউব যখন দেয় তখন আপনি একবার যেতে পারেন না?

বললাম—এটা তো খুব সামান্য ব্যাপার। এজন্য আর আমি গিয়ে কি করব? অপারেশন যদি হয় তখন থাকব নিশ্চয়ই।

মৌলভী সাহেব বললেন—তাহলে ব্যথা কমবার একটা অষুধ কিছু দিন। টিউব ঢুকিয়ে ব্যথা আরও বেড়ে গেল।

একটা অষুধ লিখে দিলাম। বললাম—কাল ঠিক যাবেন। আমি আজ গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।

হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম পাকস্থলীর কোনো দোষ এক্স-রেতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু খাদ্য নালী যেখানে পাকস্থলীর সঙ্গে মেশে সেইখানটাতেই ক্যানসার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই টিউব ঢোকাতে কষ্ট হয়েছে, রক্ত বেরিয়েছে। এখনও অপারেশন করলে রুগী বেঁচে যাবে। কাল আবার টিউব ঢুকিয়ে পাকস্থলীর রস পরীক্ষা হবে, তারপর সব রিপোর্ট বোর্ড-মিটিং-এ পেশ করা হবে। বিশেষজ্ঞরা সব বসে আলোচনা করে ঠিক করবেন কি করলে রুগীর সবচেয়ে বেশী উপকার হয়। যা ঠিক হয় সেই মত ব্যবস্থা হবে। রুগীকে ভর্তি করা হবে কিনা তাও ঠিক করা হবে।

খাদ্যনালীর ক্যানসার আজকাল এখানে অপারেশন হয়। যে জায়গাটায় খাদ্য আটকায় সেখানটা কেটে বাদ দিয়ে বাকীটা আবার পাকস্থলীর মুখে সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হয়। রুগীর কষ্ট দূর হয়। আগে এ রোগ হলে কিছুই করা যেত না। এ অপারেশন তখন এখানে হত না। ডিপ্ এক্স-রে দিয়েও কোনো উপকার পাওয়া যেত না।

আঠারো কুড়ি বছর আগের কথা। আমার সেই চারতলা বাড়ির তিনতলার একখানা ঘরে আসাম থেকে এক ভদ্রলোক একদিন এলেন।

ভদ্রলোক প্রৌঢ়। গভর্নমেণ্টের বড় চাকুরে। বছরখানেকের মধ্যেই পেনসন নেবেন। ছেলেপিলে নেই। মাসখানেকের ছুটি নিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিজের চিকিৎসার জন্য এসেছেন।

বললেন—যৌবনে বেশ অত্যাচার করেছি তাই ছেলেপিলে আর কিছু হল না। তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে খেতে পারি না সেইটেই বড় কষ্ট।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? খেলে কি হয়?

ভদ্রলোক বললেন—কিছু খেলেই হঠাৎ যেন সেটা আটকে যায়। তখন দম বন্ধ হয়ে আসে। খানিকক্ষণ পরে হয় সেটা নেবে যায়, নয় উঠে আসে। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ যে কী যন্ত্রণা তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

ভদ্রলোক খেতে পারেন না বললেন, কিন্তু চেহারা দেখে তা মনে হল না। শ্যামবর্ণ লম্বা চেহারা। অনশনের চিহ্ন মাত্র নেই। শরীরেও বেশ শক্তি রাখেন দেখা গেল। নিজের বাক্স বিছানা যেভাবে ঘরে তুললেন দুর্বল বলে বোধ হল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কতদিন এরকম হচ্ছে?

ভদ্রলোক বললেন—মাস তিনেক। যৌবনে রক্তে দোষ ছিল। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। ইন্‌জেক্‌শন নিয়েছি। এখন সে সব কিছু নেই। কিন্তু এটা কি যে হল, ডাক্তাররা কিছু বুঝচে না। তাই এখানে এলাম। আপনাদের কলেজের সবচেয়ে বড় ফিজিসিয়ানকে দেখিয়ে একটা ব্যবস্থা করে দিন।

বড় ফিজিসিয়ানকে দেখান হল। তিনি সব শুনে একটা অষুধও লিখে দিলেন। বললেন, এক সপ্তাহ খেয়ে খবর দিতে। কিন্তু কি রোগ কিছু বললেন না।

এক সপ্তাহ পর আবার যখন তাঁর কাছে যাওয়া হল তিনি বললেন এই অষুধই চলবে। ভদ্রলোককে আর দেখলেনও না, ওঁর কোনো কথাও শুনলেন না। ফি দিতে গেলে ফিরিয়ে দিলেন।

দেখে এঁর ওপর ভদ্রলোকের ভক্তি চটে গেল। বললেন—এঁকে আর দেখাব না। অন্য কাউকে দেখাবার ব্যবস্থা করুন। তখন আমাদের কলেজের দ্বিতীয় ফিজিসিয়ানের কাছে গেলাম।

তিনি অনেকক্ষণ এঁকে পরীক্ষা করলেন। এঁর সব কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। পরে একটা অষুধ দিয়ে দিন তিনেক পর খবর দিতে বললেন।

দেখলাম ওটা হিস্টিরিয়ার অষুধ। মেয়েদের সাধারণত দেয়া হয়।

ভদ্রলোকের চেহারা দেখে তিনি কিছু যে খেতে পারেন না, বিশ্বাস করাই শক্ত। তার ওপর বলেন, কখনও হয়ত শশা খেলেও সেটা আটকায় না। আবার এক ঢোঁক জল খেলেও তা বুকে আটকে যায়।

দিন তিনেক অষুধ খাইয়ে বিশেষ কোনো ফল পাওয়া গেল না। আরও তিন দিন ওটা চালানো হল। শেষে একদিন মাস্টারমশাই বললেন—কেস্‌টা কি ঠিক ধরা যাচ্ছে না। হাসপাতালে ভরতি করে দাও। ইন্‌ভেস্টিগেশন করা যাক্‌।

বললাম—আপনার আণ্ডারেই তাহলে এঁকে ভরতি করে দিই?

মাস্টারমশাই বললেন—তুমি ফার্স্ট ফিজিসিয়ানের বেডেই ভরতি কর। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে যা দরকার সব ব্যবস্থা করে দেব।

ভদ্রলোক ফার্স্ট ফিজিসিয়ানের ওপর চটে আছেন। মহা মুশকিলে পড়লাম। অনেকরকম ভুজুং-ভুজুং দিয়ে ভদ্রলোককে অবশেষে রাজী করানো গেল। বললাম—দ্বিতীয় ফিজিসিয়ানের নিজের কোনো বেড নেই। ইনিই দেখবেন, নামটা শুধু থাকবে প্রথম ফিজিসিয়ানের। এই বুঝিয়ে হাসপাতালে ভরতি করে দিলাম। সাতদিনের মধ্যেই সব পরীক্ষা হয়ে গেল। কোথাও কোনো দোষ পাওয়া গেল না। তখন ঠিক হল বেরিয়াম মিল খাইয়ে এক্স-রে ছবি তোলা হবে। দেখা হবে খাদ্যটা কিভাবে কোথা দিয়ে যায়।

বেরিয়াম মিল খাইয়ে দেখা গেল ঢোঁক গিললেই খাদ্যটা পাকস্থলীতে যায় না। খাদ্যনালীর শেষে এবং পাকস্থলীর মুখে ওটা আটকে যায়। খাদ্যনালীটা ঐখানে ফুলে ওঠে। রুগী বোঝে খাবার বুকে আটকে গেল। ব্যথায় ছটফট করে। একটু পরেই খাবারটা পাকস্থলীতে নেবে যায়। তখন বোঝাই যায় না খাদ্যনালীটা কখনও ওরকম ফুলে উঠতে পারে। খানকয়েক ছবি তুলেই বোঝা গেল রোগটা কি। পাকস্থলীর কোনো দোষ নেই। হজমেরও তাই কোনো ব্যাঘাত নেই। এটা খাদ্যনালীর ক্যানসার।

ছবিটা মাস্টারমশাইরা সব দেখলেন, হাউস স্টাফরা দেখল, ছেলেদের দেখানো হল, রুগী নিজেও দেখলেন।

কিন্তু চিকিৎসা কি? আমাদের শাস্ত্রমত তখন এর কোনো চিকিৎসা নেই। বিলেতে কয়েকটা অপারেশন হয়েছে, অনেকের তাতেই মৃত্যু হয়েছে।

তখনকার দিনে ছোট কিন্তু এখনকার একজন প্রবীন বড় সার্জন

অপারেশন করতে রাজী ছিলেন কিন্তু এ অপারেশন এখানে হয় নি শুনে ভদ্রলোক রাজী হলেন না। বললেন—আপনাদের যখন এর কোনো চিকিৎসা নেই তখন আপনাদের চিকিৎসা আমি আর করাব না।

বললাম—চিকিৎসা যদিও নেই কিন্তু কষ্ট কমাবার অষুধ আমাদের আছে। যাতে আপনি একটু রিলিফ পান তার ব্যবস্থা আমরা সব সময়েই করতে পারব।

ভদ্রলোক বললেন—রিলিফ আমি চাই না। চিকিৎসায় যদি সারে সেই চেষ্টাই এখন করব।

হাসপাতাল থেকে এসে ভদ্রলোক আমার তেতলার ঘরে আবার উঠলেন। বললেন—এখানকার সবচেয়ে যিনি বড় হোমিওপ্যাথ তাঁকে দেখাব। দেখি তিনি কি বলেন।

৬৪৲ ফি দিয়ে বড় একজন হোমিওপ্যাথ দেখান হল। প্রথম দু-চার দিন ভদ্রলোক বেশ ভরসা পেয়েছেন মনে হল। বললেন—এই চিকিৎসায় বেশ কিন্তু উপকার পাচ্ছি। আগে যতবার আটকাত এখন তার চেয়ে বারে অনেক কম আটকায়।

সপ্তাহে একবার করে হামিওপ্যাথ আসেন, ব্যবস্থা দিয়ে যান। ২।৩ সপ্তাহ পরেই ভদ্রলোক ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—কিছু তো ফল হচ্ছে না। ক্রমশই যেন দুর্বল হয়ে পড়ছি। কাল সারাদিন দশবার খাবার বুকে আটকে গেছে। আজ পর্যন্ত কোনো দিন তা হয়নি।

তবুও আরও ৩।৪ সপ্তাহ হোমিওপ্যাথী চলল। ভদ্রলোকের অনেক টাকা খরচ হল কিন্তু কোনো উপকার হল না। মাস দুই পরে তিনি ঠিক করলেন কবিরাজী করে দেখবেন। হোমিওপ্যাথী আর করাবেন না।

শহরে তখন অনেক নামকরা কবিরাজ। যাঁর নাম সবচেয়ে বেশী এবং যাঁর ফি সবচেয়ে বেশী তাঁকে ডেকে দেখানো হল। ইনিও ৬৪৲ টাকা করে ফি নিলেন; সপ্তাহে দুবার করে আসতে লাগলেন। নানা রকম বড়ি আর পাচন খেতে দিলেন। যেখানে জল খেতেও ভদ্রলোকের কষ্ট হয় সেখানে রকমারি অষুধ ও বাটি বাটি পাঁচন খাওয়াতে ভদ্রলোক দুদিনেই কাহিল হয়ে পড়লেন।

কবিরাজ মশাই বললেন—প্রথমে একটু কষ্ট হবে পরে ঠিক হয়ে যাবে।

ভদ্রলোকের কষ্ট ক্রমশই বাড়তে লাগল। একদিন রাত্রে কবিরাজী গুঁড়ো খেতে গিয়ে বুকে আটকে গেল। বমিও হয় না, নামেও না। ভদ্রলোক ঘেমে গেলেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

খবর পেয়ে নীচে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করছেন। নাড়ী দেখে বললাম এক্ষুনি একটা ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া দরকার। ভদ্রলোক হাত নেড়ে বারণ করলেন। মিনিট দশেক পরে বমি হয়ে গেল। তখন বললেন —আমার যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে আপনাদের কোনো অষুধ খাব না। ইন্‌জেক্‌শনও নেব না। রিলিফ আমি চাই না।

বললাম—আপনি যে রকম কষ্ট পাচ্ছেন তাতে চিকিৎসকের কর্তব্যটাই হচ্ছে আপনাকে একটু আরাম দেওয়া। কষ্ট দূর করা। কিন্তু এই চিকিৎসাতে কি আপনি তা পাচ্ছেন?

ভদ্রলোক বললেন—আমি জানি এ রোগের কোনো অষুধ নেই। এলোপ্যাথী, কবিরাজী, হেকিমী, বায়োকেমিক কোনো কিছুতেই এ রোগ সারে না। তবু সবাইকেই আমি সুযোগ দেব। দেখুক তারা চেষ্টা করে। জানুক এ রোগ সারে না।

ভদ্রলোকের এই অদ্ভুত জেদ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এত কষ্ট তবু কোনো ইন্‌জেক্‌শন নেবেন না।

মাসখানেক কবিরাজী করবার পর বায়োকেমিক শুরু হল, তার পর হেকিমী। কিছুতেই কোনো উপকার হল না। মাস ছয়েক ভুগে ভদ্রলোক একদিন মারা গেলেন।

শেষদিন বললেন—দেখলেন ডাক্তার, এ রোগের কোনো অষুধ নেই। আপনারা রিলিফ দিলেও মরতাম, রিলিফ না নিয়েও দেখুন কেমন মারা যাচ্ছি।

এখন বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হয়েছে। রুগীকে অজ্ঞান করে রাখবার নতুন নতুন ব্যবস্থা হয়েছে। বড় বড় অপারেশন করা যাচ্ছে। শ্বাস-নালীর ক্যানসারও অপারেশন করা সম্ভব হয়েছে।

পরদিন মৌলভী সাহেব এসে বললেন—আজ পাকস্থলীর রস নিয়েছে। পরশু আবার যেতে হবে। আপনি গিয়েছিলেন?

যা শুনে এসেছি সব বললাম। শুনে মৌলভী সাহেব বললেন—পাকস্থলীর কিছু হয় নি? তাহলে গলাভাত খাবার দরকার কি? দেখুন মিছিমিছি এতদিন সবাই গলাভাত আর দুধ খাইয়েছে।

বললাম—এইবারে অপারেশন করিয়ে নিন, যা ইচ্ছে সব খেতে পাবেন।

মৌলভী সাহেব বললেন—কবে ভরতি করবে?

বললাম—৩।৪ দিনের মধ্যেই হবে মনে হয়।

মৌলভী সাহেব শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন—যাক এতদিনে

নিশ্চিন্ত হলাম। ভরতি হলেই অপারেশন করবে তো?

বললাম—অপারেশনের জন্য যে ক-দিন রুগীকে তৈরী করতে হয় সে ক-দিন রেখেই অপারেশন হবে। ভরতি তো আগে হয়ে যান, তারপর ওরা যা বলে তাই হবে।

৩।৪ দিনের মধ্যেই মৌলভী সাহেব হাসপাতালে ভরতি হয়ে গেলেন। দেখে এলাম কার কোথায় ক্যানসার, কি চিকিৎসা হচ্ছে, রুগীদের কাছ থেকে সব খবর নিচ্ছেন। এতদিনের চেষ্টায় যে ভরতি হতে পেরেছেন সেই আনন্দ সেই গর্ব চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

পরদিন যেতেই বললেন—আমার সব পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু এরকম অপারেশনের রুগী আর নেই। তাই কি হবে কিছু বুঝছি না।

বললাম—সব এরকম রুগী পাবেন কোথা?

মৌলভী সাহেব কাল যতটা উৎফুল্ল ছিলেন আজ দেখলাম তা যেন মিলিয়ে গেছে। ক্যানসারের এত কঠিন কঠিন পরিণতি দেখে ঘাবড়ে গেছেন। অনেক ভরসা দিয়ে চলে এলাম।

পরদিন গিয়ে দেখি মৌলভী সাহেবের মুখ শুকনো। চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

মৌলভী সাহেব বললেন—আমাকে ডিপ্ এক্স-রের আলো দেবারই ব্যবস্থা করে দিন। অপারেশন থাক।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—সে কি? ডিপ্ এক্স-রে-তে তো এ রোগ সারে না। অপারেশনই যে এর একমাত্র চিকিৎসা।

মৌলভী সাহেব বললেন—অপারেশন করলে অনেকেরই আর নাকি জ্ঞান ফেরে না। এই অপারেশন করে কেউ নাকি ভাল হয়ে বাড়ি যায় নি শুনলাম। অপারেশন থাক। আপনি ঐ আলো দেবারই ব্যবস্থা করে দিন।

অনেক করে বুঝিয়ে এলাম। বললাম—আজকাল অপারেশনের কোনো ভয় নেই, ব্লাড দেওয়া হবে। ভাল হয়েই বাড়ি যেতে পারবেন। যা খুশি তাই খেতে পারবেন।

খাবার কথা শুনে মৌলভী সাহেব যেন একটু আশ্বাস পেলেন, একটু উৎফুল্ল হলেন। বললেন—সত্যি কোনো ভয় নেই? আরও অনেক ভরসা দিয়ে বললাম—না সত্যি ভয় নেই। অপারেশন হলে দেখবেন খেতে আর কখনও ব্যথা হবে না। মৌলভী সাহেব বললেন—বেশ তাহলে হোক অপারেশন।

পরদিন গিয়ে দেখি মৌলভী সাহেবের বিছানা খালি। পাশের রুগীরা বলল, আজ সকালে রিস্ক বন্ড সই করে মৌলভী সাহেব বাড়ি চলে গেছেন।

॥ ১৩ ॥

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলীন সাহেব যেবার স্বস্তিকা মার্কা জার্মান প্লেনে চড়ে মিউনিকে গিয়ে হিটলারের দাবি মেনে চেকোশ্লোভাকিয়াকে দুভাগ করে ছাতা হাতে মুখটি চুন করে দেশে ফিরে এলেন, সেবার আমার চারতলা বাড়ির একখানা ঘরের জন্য একটি ছেলে এল। এম-এ পাশ করেছে। ল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। নিরিবিলি থাকতে চায়। পরীক্ষার পড়া তৈরি করবে। তারপর চাকরির চেষ্টা। বুঝলাম বেশ কিছুদিন থাকবে।

চেহারা দেখেই ছেলেটিকে যেন একটু লাজুক লাজুক মনে হল। লম্বা রোগা ছিপছিপে গড়ন। মাথায় একরাশ চুল। চোখে চশমা। নাম ক্ষিতীন হালদার।

ক্ষিতীন বলল—সিংগল সিটেড ঘর যদি থাকে তাই একটা দিন।

দোতলায় একখানা ঘর খালি ছিল তাই ক্ষিতীন পছন্দ করল। বাক্স-বিছানা নিয়ে এসে পড়াশুনায় ডুবে গেল। কারু সঙ্গে বড় একটা মিশত না। নিজের ঘরে সারাদিন দরজা বন্ধ করে লেখাপড়া নিয়েই থাকত।

মাসখানেক পর ওর পরীক্ষা হয়ে গেল। তখনও দেখতাম ও কারু সঙ্গে মেশে না। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। ঘরে ফিরলেই আগের মত দরজা বন্ধ করে দিত। হঠাৎ কখনও মুখোমুখি দেখা হলে একটু শুধু হাসত। কখনও-সখনও হয়ত দুটি একটি কথা বলত।

একদিন রাত দশটায় আমার বসবার ঘর বন্ধ করে ওপরে উঠব ভাবছি, এমনি সময় ক্ষিতীন হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকল। উসকো-খুসকো চুল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। মুখ শুকনো।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? অসুখ-বিসুখ কিছু হল নাকি?

ক্ষিতীন বলল—না অসুখ কিছু হয় নি। কিন্তু ভারি বিপদে পড়েছি। আমাকে একটু সায়নাইড যোগাড় করে দিতে পারেন?

শুনে হঠাৎ চমকে উঠলাম। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? সায়নাইড দিয়ে কি হবে?

দুহাতে আমার টেবিলের কোণটা শক্ত করে ধরে আমার দিকে ঝুঁকে ক্ষিতীন বলল—খাব। পারবেন এনে দিতে?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল ও ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নয়। কিন্তু মদ খেয়ে মাতাল হয় নি। যেভাবে ঝুঁকে কথা বলছে মদ খেলে ঠিক গন্ধ পেতাম।

বললাম—কিন্তু কেন সায়নাইড খাবেন?

ক্ষিতীন বলল—শুনেছি সায়নাইড খেলে খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয়। মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। তাই নয় কি?

বললাম—খুব দ্রুত মৃত্যু হয় তা ঠিক। কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না, তা ঠিক নয়। মরবার আগে যন্ত্রণা ঠিকই হয় এবং সে অতি-সাংঘাতিক। সাপের বিষের চেয়েও কষ্টকর।

শুনে ক্ষিতীন আরও যেন মুষড়ে পড়ল। বলল—তাহলে কি খাব?

বললাম—সে হবে পরে। আপাতত ঐ চেয়ারটায় বসে পড়ুন দেখি। তারপর শুনি কি ব্যাপার। মরবার হঠাৎ দরকার হল কেন?

চেয়ারে বসে নিজের চোয়াল দুটো দুহাতে ধরে কনুই দিয়ে টেবিলে ভর করে ক্ষিতীন বলল—পুরুষত্বই যার নষ্ট হয়ে গেছে, বেঁচে থেকে তার কী হবে? ক্লীব হয়ে অসমর্থ হয়ে আপনি আমাকে বেঁচে থাকতে বলেন?

বললাম—তা বলি না। কিন্তু এজন্য প্রাণনাশের প্রয়োজনটা কি? চিকিৎসা করালেই তো সেরে যায়।

ক্ষিতীন বলল—চিকিৎসায় কিচ্ছু হয় না। বিজ্ঞাপন দেখে দেখে অনেক টাকার অষুধ খেয়ে অনেকরকম প্রক্রিয়া করে দেখেছি কিছু হয় না। বুঝেছি এ আর সারবে না। তাই খুব তাড়াতাড়ি যাতে মৃত্যু হয় অথচ কষ্ট হয় না, এমনি একটা অষুধ চাই। দেবেন একটা কিছু দয়া করে?

বললাম—অষুধ আমি দিচ্ছি। কিন্তু তাতে মৃত্যু হবে না। ঘুম হবে। কাল সকালে আপনাকে পরীক্ষা করে যদি প্রয়োজন হয় বড় চিকিৎসক একজন দেখিয়ে কি করা উচিত সব ব্যবস্থা করে দেব।

ক্ষিতীন বলল—সত্যি এর চিকিৎসা আছে?

বললাম—নিশ্চয়ই আছে। এখন এই বড়িটা খেয়ে নিন দেখি। কাল সকালে আবার কথা হবে।

ব্যাগ থেকে একটা ঘুমের অষুধ ক্ষিতীনকে দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। পরদিন সকালে ক্ষিতীনকে পরীক্ষা করে মনে হল ওর দেহে কোনো রোগ নেই। আসলে রোগটা মনের। তখনকার দিনে মনের রোগের বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসক আজকালকার মত এত বেশী ছিল না। যৌনব্যাধির বিশেষজ্ঞরাই এইসব রোগের চিকিৎসা করতেন। তাঁদেরই একজনের কাছে ক্ষিতীনকে নিয়ে গেলাম।

তিনি ক্ষিতীনকে পরীক্ষা করে আমাকে ভিতরের ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—লেখাপড়া জানা এই বয়সের ছেলেদের এইসব রোগ বেশীর-ভাগই কল্পনা থেকে হয়। অজানা ভয় আর আতঙ্ক থেকে নিজেকে অসমর্থ মনে করে। এ রকম কেস্ আমি অনেক সারিয়েছি। কিন্তু ২।১ দিনে কিছু হবে না। মাসখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়। যতদিন আসতে বলব রুগী ঠিক আসবে তো?

ক্ষিতীনকে সে কথা বলতে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

বলল—এক মাস কেন, তিন মাস পর্যন্ত আমি দেখতে রাজী আছি।

আমার কাছ থেকে সেকথা শুনে বিশেষজ্ঞ বললেন—তাহলে ও ঠিক সেরে উঠবে। ঘুমের অষুধ ছাড়া অন্য কোনো অষুধ দেবার দরকার হবে না। ওকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে ওর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। শেষে দরকার হলে ২।১ দিন একটু মৃদু ইলেক্ট্রিক শক্ দেব। তাইতেই কন্‌ফিডেন্স ফিরে আসবে।

ক্ষিতীনকে ডেকে সেদিনকার মত একটা অষুধ দিয়ে পরদিন আবার যেতে বললেন।

সাতদিনের মধ্যেই ক্ষিতীনের বেশ পরিবর্তন দেখা গেল। চোখেমুখে খুশী ফুটে উঠল। চলায়, কথায় মনের স্ফূর্তি ছড়িয়ে পড়ল।

মাসখানেক পর একদিন বলল—ডাক্তারবাবু, আমি সত্যি একেবারে সেরে গেছি। হেসে বললাম—সায়নাইডের আর দরকার হবে না তো?

ক্ষিতীন লজ্জা পেল। হেসে বলল—সত্যি তখন পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্যি আপনি ছিলেন। নইলে কী যে হঠাৎ করে বসতাম।

তারপর অনেকদিন ক্ষিতীনের সঙ্গে দেখা হলো না। একটা টাইফয়েড রুগী নিয়ে মাসখানেক আমি আটকে গেলাম। যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন হয় ও বাইরে থাকত, নয় ওর ঘর বন্ধ দেখতাম।

মাস দেড়েক পর রুগীটি ভাল হয়ে উঠলে আবার একটু ফুরসত পেলাম। একদিন সন্ধ্যের সময় বসে কি একটা কাগজ পড়ছি, ক্ষিতীন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। দুই হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়ল।

কাগজ রেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

মুখ থেকে হাত সরিয়ে ক্ষিতীন বলল—সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর

বেঁচে কি হবে? হয় সায়নাইড নয় অন্য কিছু যা হোক একটা দিন। এ লজ্জা আর আমি সইতে পারি না।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—সে কি? এই যে সেদিন বললেন, একেবারে সেরে গেছেন?

ক্ষিতীন বলল—সেরে তো গেছিই। কিন্তু অন্য এক মুশকিলে পড়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—মুশকিলটা কি?

ক্ষিতীন বলল—কাঞ্চন আমার মামাতো বোন। বি-এ পাশ করে একটা স্কুলের টিচার। ওর সংগে যেভাবে আমি মিশেছি, তাতে দুজনেরই এখন বিষ খাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।•

বললাম—তা কেন? বিয়ে করলেই তো গোলমাল মিটে যায়। বিয়েটা কি দুজনের বিষ খাওয়ার চেয়েও খুব শক্ত?

ক্ষিতীন বলল—বিয়ে তো করবই ঠিক ছিল। ভেবেছিলাম, নিজে উপার্জন শুরু করলেই বিয়ে করব। কিন্তু সব ভেস্তে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েটির বিয়ে আর কোথাও ঠিক হয়েছে নাকি?

মাথা নেড়ে ক্ষিতীন বলল—না।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে?

ক্ষিতীন একটু ইতস্তত করে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে চোখ নিচু করে বলল—ওর সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে।

এইবার বুঝলাম। বললাম—বিয়েটা তাহলে এক্ষুনি করে ফেলুন না কেন?

ক্ষিতীন বলল—তা হয় না। আমি নিজে রোজগার করি না। দুদিকেই বাড়ির অমতে বিয়ে করতে হবে। এক্ষুনি জানাজানি হয়ে গেলে ভীষণ কাণ্ড হবে।

বললাম—বেপরোয়াভাবে তাহলে এতটা এগুলেন কেন? জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থাটা অন্তত নেওয়া উচিত ছিল না কি?

ক্ষিতীন বলল—সেইটেই দেখছি সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কি করব আপনার সেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুই তো বারণ করেছেন।

শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ওর কথা বিশ্বাস হল না।

বললাম—কি বলেছেন তিনি?

ক্ষিতীন বলল—তিনি বলেছেন, কখনও যেন জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা না নিই। নিলে আবার ঐ রোগ হতে পারে।

ওর কথা শুনে ভারি কৌতুক বোধ হল। নিজের অপরাধ কেমন অনায়াসে ডাক্তারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল।

বললাম—উনি কি করে বুঝবেন, আপনি এমন কাণ্ড করে বসবেন?

ক্ষিতীন বলল—কিন্তু এখন কি করি বলুন তো? সায়নাইড ছাড়া অন্য কি অষুধ খাওয়া যায়, বলুন দেখি।

ওর অবস্থা দেখে হাসি পেল। কিন্তু গম্ভীর মুখেই বললাম—উপায় একটা হবেই। আপাতত এই অষুধটা খেয়ে ফেলুন দেখি। তারপর কাল সব ঠিক করা যাবে। আমিও একটু ভেবে দেখি।

চাকরকে ডেকে এক গ্লাস জল আনিয়ে ক্ষিতীনকে ঘুমের অষুধ খাইয়ে ওপরে উঠে এলাম। পরদিন সকালে বেরুবার সময় দেখি ক্ষিতীন খুব ঘুমুচ্ছে। দিনে-রাতে রোজ যে দবজা বন্ধ করে শোয়, কাল সে দরজায় খিল দিতে ভুলে গেছে। দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখলাম ক্ষিতীনের ঘর খোলা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই আমাকে দেখে ওর ঘরে ডাকল।

গিয়ে দেখি এক রাত ভাল করে ঘুমিয়েই ওর চোখ-মুখের ভাব বদলে গেছে। দাড়ি কামিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে বেশ ফিটফাট হয়ে বসে আছে। ওর ঘরে আগে কখনও ঢুকিনি। দেখলাম তক্তাপোশের পাশে টেবিলের ওপর হাস্যময়ী তরুণীর একটি ফটো।

আমাকে ছবিটার দিকে তাকাতে দেখেই মৃদু হেসে ক্ষিতীন বলল—এই সেই কাঞ্চন। এখন বলুন দেখি কি করি?

বললাম—কিছু বলার আগে মেয়েটির সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। বিকেলবেলা একবার ওঁকে নিয়ে আসুন।

শুনে ক্ষিতীন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বলল—এইখানে এত লোকের মধ্যে?

বললাম—তাতে কি? আমার ঘরে বসে কথা হবে। বাইরের কেউ তো থাকবে না।

ক্ষিতীন বলল—তা নয়। কিন্তু এইখানে কি ও আসবে?

বললাম—আমার কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন। নিশ্চয়ই আসবেন।

বিকেলে কাঞ্চনকে নিয়ে ক্ষিতীন এল। ২১।২২ বছরের সুন্দর মেয়েটি, বেশ ফর্সা। লম্বা দোহারা গড়ন। মুখখানি ভারি মিষ্টি। সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে। এখনও চোখে-মুখে চাকরির ছাপ পড়ে নি। সারাদিন স্কুলের কাজের পর ঠোঁট দুটি শুধু শুকনো দেখাচ্ছে।

ক্ষিতীন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—ইনিই কাঞ্চন। আপনারা কথা

বলুন। আমি একটু চায়ের যোগাড় করি।

কাঞ্চন বলল—তোমরা খাও। আমি খেয়ে এসেছি।

এই বলে হাত জোড় করে নমস্কার করল। আমিও চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রতিনমস্কার করে বললাম—বসুন।

টেবিলের ওপর ওর হাত-ব্যাগ রেখে কাঞ্চন বসল।

বললাম—কাল রাতে ক্ষিতীনবাবু সায়নাইড চেয়েছিলেন আপনাদের দুজনের জন্য। আমি একটা ঘুমের অষুধ দিয়েছিলাম। তাতেই দেখছি আজ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

কাঞ্চন মৃদু হেসে বলল—ক্ষিতিদা ঐরকমই পাগল। কদিন ধরেই স্নান নেই, দাড়ি-গোঁফ কামানো নেই। পাগলের মত ঘুরছে। আজই হঠাৎ দেখলাম বেশ ফিটফাট।

বললাম—সবই ঐ ঘুমের অষুধের গুণ। ঘুম থেকে উঠে মাথা অনেক ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু আপনারা বিয়ে করছেন না কেন?

কাঞ্চন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—এখন কি করে তা সম্ভব? বিয়ের পর থাকব কোথা? না না, এখন জানাজানি হয়ে গেলে ভারি কেলেংকারী হবে। আচ্ছা, এর কোনো অষুধ নেই?

মাথা নেড়ে বললাম—না নেই।

কাঞ্চন ব্যাগ খুলে একটা শিশি বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল—তাহলে এতে কোনো কাজ হবে না?

দেখলাম কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যেসব গাছগাছড়া সন্ন্যাসী-প্রদত্ত বলে বিক্রি হয় তারই একটি নমুনা।

বললাম—এসবে কিছু তো হবেই না, বরং খারাপ হবে। শেষে জানাজানি তো হবেই, হয়ত-বা প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়বে।

ভয়ে কাঞ্চনের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল—ভাগ্যিস আগে ব্যবহার করি নি! তাহলে কি হবে? কোনো উপায় কি নেই?

জিজ্ঞাসা করলাম—কতদিন হয়েছে?

কাঞ্চন মুখ নিচু করে বলল—সবে মাস দেড়েক।

বললাম—একমাত্র উপায় হল অজ্ঞান করে কিউরেট করা।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল—অজ্ঞান না করে হয় না?

বললাম—না।

কাঞ্চন কি একটু ভাবল। বলল—কতক্ষণ পর জ্ঞান হবে?

বললাম—আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টা। ৩।৪ ঘণ্টা পর বাড়ি যেতে

পারবেন। সেইদিনটা একটু রেস্ট নিতে হবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পাবেন না।

কাঞ্চন বলল—তাহলে স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে দু-একদিনের জন্য এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে থাকি। সেখান থেকেই এসব করা সুবিধে হবে।

এমনি সময় ক্ষিতীন এল। সঙ্গে চাকরের হাতে চা। কাঞ্চন নিল না। চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম—অপারেশন হয়ে গেলেই বিয়েটা সত্যি হবে তো?

ক্ষিতীন বলল—কি অপারেশন?

সব ওকে বুঝিয়ে বললাম। শুনে ক্ষিতীনের মুখ খুশীতে জ্বলজ্বল করে উঠল। মনে হল মস্ত বড় বোঝা যেন ওর ঘাড় থেকে নেবে গেল।

বলল—নিশ্চয়। রেজিস্টারীটা গোপনেই সেরে রাখা যাবে। পরে সুবিধে মত এক সময় বাড়িতে বললেই হবে।

একটা চিঠি লিখে ওদের একজন স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বললাম—ইনি একজন নামকরা চিকিৎসক। পরীক্ষা করে যা দরকার সব ইনি করে দেবেন।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্ষিতীন আর কাঞ্চন বেরিয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন ক্ষিতীনের সঙ্গে আর দেখা হল না। একদিন দুপুরে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি সিঁড়ির মুখে হঠাৎ দেখা। মুখখানা খুব খুশী-খুশী।

বলল—আচ্ছা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন বটে! অজ্ঞান করতে হবে, অপারেশন করতে হবে। সেই বিশেষজ্ঞ দেখে বললেন, ওসব কিছু না। একটা অষুধ খেতে দিলেন। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে গেল।

বললাম—তাহলে তো আরো ভাল। বিয়েটা এবার হচ্ছে কবে?

শিগ্‌গিরই হবে বলে ক্ষিতীন বেরিয়ে গেল।

তারপর যখনি দেখা হত, বলত শিগ্‌গিরই হবে কিন্তু বিয়ে ক্ষিতীন করল না। দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করতাম। ক্ষিতীনও হেসে হেসেই জবাব দিত। শেষে দেখলাম, হাসে না। গম্ভীর হয়ে যায়। বিরক্ত হয়। পরে দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে নিত। এড়িয়ে চলত।

ওর ব্যবহার দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। দেখতাম আবার আগের মত ওর ঘরের দরজা সারাদিন বন্ধ থাকে। হঠাৎ কখনও দেখা হলেও ওর সঙ্গে কথা বলতে আর ইচ্ছে হত না। ক্ষিতীনও নিজে থেকে কোনো কথা বলত না। মুখ গোমড়া করেই থাকত।

মাস কয়েক পরে একদিন বিকেল বেলা আমার বসবার ঘরে কাঞ্চন হঠাৎ এসে উপস্থিত। ক্ষিতীনের ঘর তালাবন্ধ। কোথায় যেন বেরিয়েছে এখনও ফেরে নি। আমার ঘরে ঢুকে নমস্কার করে কাঞ্চন বলল—ডাক্তারবাবু, আবার আপনার কাছে আসতে হল।

বললাম—বসুন। কি ব্যাপার বলুন তো?

কাঞ্চন বলল—ও একটা চাকরি পেয়েছে এলাহাবাদে একটা ব্যাঙ্কে। ২।৩ দিনের মধ্যেই চলে যাবে। তাই আপনার কাছে এলাম।

বললাম—তাহলে তো ভালই হলো। এইবারে বিয়ের আর বাধা কি?

কাঞ্চন চোখ ছলছল করে বলল—বাধা অনেক। বাড়ির বাধা তো আছেই সেজন্য ভয় পাই না। কিন্তু আসল বাধা ওকে নিয়েই। এখন বলছে আমাদের যা সম্পর্ক তাতে এ বিয়ে নাকি আইনত সিদ্ধ নয়। রেজিস্টারী নাকি হতে পারে না। বলছে, ফরগিভ এ্যান্ড ফরগেট। বলতে বলতেই কাঞ্চনের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ব্যাগ খুলে রুমাল বার করে কাঞ্চন চোখ নাক মুছতে লাগল।

ক্ষিতীনের যা প্রকৃতি, এ কথা শুনে একটুও অবাক হলাম না। কিছু-দিন থেকে এই আশঙ্কাই মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম মেয়েটাকে পথে বসিয়ে ও নিশ্চয় একদিন কেটে পড়বে।

বললাম—বিয়ের জন্য আমি অনেকবার বলেছি তাই আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলে। দেখা হলেও কথা বলে না। আমি আর কি করতে পারি বলুন দেখি?

রুমাল দিয়ে নাক মুছে কাঞ্চন বলল—পারলে একমাত্র আপনিই পারেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।

জানতাম ক্ষিতীন আমার কোনো কথাই রাখবে না। তাই কাঞ্চনের আমার ওপর এই ভরসা দেখে খুবই বিব্রত বোধ করলাম।

বললাম—কিন্তু কি করে?

চোখ নিচু করে দ্বিধাভরে কাঞ্চন বলল—আবার যাতে সন্তান নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা আপনিই শুধু করতে পারেন।

শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বললাম—বলেন কি, আবার?

মাথা নিচু করে দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঞ্চন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল—এইবার মৃত্যু ছাড়া আর আমার কোনো পথ নেই।

শুনলাম কাঞ্চনকে নিয়ে ক্ষিতীন নাকি আবার সেই বিশেষজ্ঞর কাছে গিয়েছিল কিন্তু তিনি রাজী হন নি। বলেছেন আমার সঙ্গে কথা না বলে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। তাই কাঞ্চনকে আমার কাছে ক্ষিতীন পাঠিয়েছে। নিজে আসতে সাহস পায় নি।

শুনে রাগে ঘৃণায় সর্বশরীর যেন জ্বলে পুড়ে গেল। ছি ছি লোকটা এত ছোট? এত নীচ? দেহের শিরায় শিরায় অ্যাড্রিনালিন ছড়িয়ে গেল। দ্রুত রক্ত সঞ্চালন শুরু হল। মাথায় যেন খুন চেপে গেল। মনে মনে শপথ করলাম আজ এর প্রতিবিধান একটা করবই।

বললাম—আপনি অত অধীর হবেন না। ক্ষিতীন আসুক। একটা ব্যবস্থা আজ হবেই, তা সে যেমন করেই হোক।

কাঞ্চন বলল—ও বলেছে সন্ধ্যার সময় ফিরবে।

বললাম—তাহলে আপনি ওপরে গিয়ে বসুন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করুন। ক্ষিতীন এলে আজই একটা ফয়সলা করে দিচ্ছি।

কাঞ্চন প্রথমে একটু ইতস্তত করে পরে বলল—তাই চলুন তাহলে। এইখানে এতক্ষণ বসে থাকলে ও ঠিক চটে যাবে।

ওপরে গিয়ে কাঞ্চনের সঙ্গে আমার স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিলাম। দুজনেই স্কুলের টিচার। সহজেই ভাব হয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা ক্ষিতীন ফিরল। লজ্জিত অপরাধী মুখে আমার ঘরে ঢুকল। বলল—কাঞ্চন এসেছিল?

বললাম—বসুন। আপনার জন্যই বসে আছি। কাঞ্চন এসেছে। ওপরে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে।

ক্ষিতীন ব্যস্ত হয়ে বলল—সে কি? এখনও বাড়ি যায় নি? বাড়িতে সবাই ব্যস্ত হবে।

বললাম—হোক। আমিই যেতে বারণ করেছি। বলেছি বিয়েটা সেরেই বাড়ি যাবে।

ক্ষিতীন অবাক হয়ে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল—সে কি? বিয়ে? কেমন করে?

বললাম আজ রাতেই কাঞ্চনকে আপনার বিয়ে করতে হবে। হিন্দুমতে, মুসলমান মতে কি রেজিস্টারী করে, যেমন করেই হোক। আপনি যে ভেবেছেন একটা মেয়ের সর্বনাশ করে ফরগিভ এ্যান্ড ফরগেট বলে এলাহাবাদ পালিয়ে যাবেন তা চলবে না। আমি তা হতে দেব না। বলুন কি মতে আপনি বিবাহ করতে চান?

আমার কথার রকম শুনে ক্ষিতীন হক্‌চকিয়ে গেল।

বলল—রেজিস্ট্রার তো এ বিয়ে দেবে না। আমাদের দুজনের যা সম্পর্ক —মামাত পিসতুত ভাইবোন—তাতে তিন আইনে এ বিয়ে সিদ্ধ হয় না। হিন্দুমতেও হয় না। মুসলমান হতে আমার সংস্কারে বাধে। কাজেই বিয়ে কি করে হবে?

বললাম—বিয়ে আজ আমি দেবই, তাই হবে। রেজিস্ট্রারকে আপনাদের এই সম্পর্কের কথা বলা চলবে না। বলবেন আপনাদের দুজনের মধ্যে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলেই বিয়ে হয়ে যাবে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে আপনাদের দুজনের একজন ছাড়া অন্য কেউ এ বিয়ে নাকচ করতে পারবে না। আপনি যেমন আদালতে গিয়ে ডিভোর্স চাইলে পাবেন, কাঞ্চনও তাই পাবে। তাহলে আপনার আপত্তি কিসের?

ক্ষিতীন বলল—বিয়ের ব্যাপারে এমনি মিথ্যাচার আমার বিবেকে বাধে।

শুনে রাগে আমার গা জ্বলে গেল। বললাম—একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে আপনার বিবেকে কিন্তু বাধে না! এবারেও কিছু হয়নি না? চমৎকার আপনার বিবেক। আসলে, কাঞ্চনকে বিয়ে করতে আপনার সাহসে কুলোচ্ছে না। আপনার মত এমন ভীরু এমন ইতর, এমন কাপুরুষের এমনি নোংরা বিবেকই হয়। কিন্তু সেই বিবেককে চাবুক মেরে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমি জানি। এখুনি কাঞ্চনকে নিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে যদি আপনার কীর্তি প্রকাশ করি এই বাড়ির এতগুলি লোকের হাতে আপনার কি অবস্থা হবে তা জানেন? তারপর কাঞ্চনের বাবার কাছে সব কথা যদি বলে দি? আপনার বাবা-মা-র কাছে যদি চিঠি লিখি?

এইবার ক্ষিতীন ঘাবড়ে গেল। বলল—কাঞ্চন এই অসিদ্ধ বিয়েতে রাজী?

বললাম—বেশ তো ওপরেই যান না? জিজ্ঞাসা করেই আসুন। সিদ্ধ অসিদ্ধ কিছুই আমি বুঝি না। শুধু জানি বিয়ে আজ আপনাকে করতেই হবে।

ক্ষিতীন আর কোনো কথা না বলে আমার সঙ্গে ওপরে উঠে এল। দেখলাম এই অল্প সময়ের মধ্যেই কাঞ্চন আমার স্ত্রীর সঙ্গে, ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছে। খাবার টেবিলের পাশে বসে আমার ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে হেসে হেসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে। আমরা ঢুকতেই হাসি থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। ক্ষিতীনকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাঞ্চনকে বললাম—আপনার সঙ্গে ইনি কি কথা বলবেন। সামনেই প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। ঘুরে ঘুরে যত ইচ্ছে প্রাইভেট কথা বলে আসুন।

ছেলেটিকে কোল থেকে নাবিয়ে মুচকি হেসে কাঞ্চন ক্ষিতীনের সঙ্গে ছাদে চলে গেল। আমার স্ত্রী মৃদু হেসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হেনে বললেন—কি ব্যাপার? ডাক্তারী ছেড়ে এখন ঘটকালী শুরু করলে না কি?

বললাম—আপত্তি কি? ডাক্তারী করে যা পাই, ঘটকালী করেও তাই পাব। সেই একই বদনাম। ছোকরা এই মেয়েটিকে এতদিন ধরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখন ফেলে পালাবার তালে ছিল। সেটি আজ আর হতে দিচ্ছি না।

স্ত্রী বললেন—কাঞ্চনের কাছে সব শুনলাম। তোমাদের জাতটাই এমনি।

শুনে বুক দুরু-দুরু করে উঠল। কাঞ্চন সব কথাই ফাঁস করে দিয়েছে নাকি?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম--কেমন লাগল মেয়েটিকে?

উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রী বললেন—চমৎকার মেয়ে। বি-এ পাশ করেছে কিন্তু এতটুকুও অহঙ্কার নেই। এই মেয়েকে কিনা ক্ষিতীনবাবু এমন হেলাফেলা করছেন?

যাক, সব তাহলে কাঞ্চন বলে নি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বললাম—তাহলে বিয়েটা দিয়ে ফেলি? কি বল?

তিনি বললেন—নিশ্চয়। এই সব লোককে এমনি ধরেবেঁধেই গছিয়ে দিতে হয়। এ যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।

বললাম—তাহলে তুমিও তৈরী হয়ে নাও। নীচে থেকে ২।৩ জন সাক্ষী যোগাড় করে একসঙ্গেই রেজিস্ট্রারের বাড়ি যাওয়া যাক।

গিন্নী বললেন—আগে ওদের ডাক। না ডাকলে ওদের ফুসুর-ফুসুর আর গুজুর-গুজুর সারা রাতেও শেষ হবে না।

ছাদে বেরিয়ে দেখি এক কোণে পাশাপাশি রেলিং-এ ভর দিয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ওরা তন্ময় হয়ে ফিসফিস করে কিসব বলছে। গলা খাঁকারি দিতে তবে ওরা চমকে উঠল।

ক্ষিতীনকে জিজ্ঞাসা করলাম—হল আপনাদের কথা? কি ঠিক হল?

ক্ষিতীন বলল—হ্যাঁ। আপনি যা বলবেন তাই হবে।

বললাম—তাহলে ঘরে যান। আমার স্ত্রী আপনাদের ডাকছেন।

ওদের ঘরে পাঠিয়ে সাক্ষীর খোঁজে নীচে নাবলাম। রেজিস্ট্রার আমাদের পরিচিত। আগে থেকে নোটিশ না দিলেও বিয়ের কোনো অসুবিধা হবে না। তিনজন সাক্ষী চাই। তারও কোনো অভাব হল না। একবার বলতেই সবাই রাজী হয়ে গেল। কেউ উকিল, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, ছেলেছোকরা লোক, বিয়ে-থা করেনি। ঘর ভাড়া নিয়ে আমার ওখানে থাকে। এই রকম একটা মজার বিয়ের সাক্ষী হতে সকলেরই খুব উৎসাহ।

বললাম—আপনারা তৈরী হয়ে নিন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হব। আমি রেজিস্ট্রারকে টেলিফোন করে আসি।

এই বলে রাস্তায় বেরিয়ে একটা দোকান থেকে রেজিস্ট্রারকে টেলিফোন করে দিলাম। রেজিস্ট্রার বৃদ্ধ। কিন্তু ভারি রসিক। বললেন—গোলমালের বিয়ে? তা বেশ; নিয়ে এস। সব ঠিক করে দেব।

বাড়ি ফিরে ওপরে উঠে দেখি, গিন্নী এই শর্ট নোটিশেই অসাধ্য সাধন করে বসে আছেন। কাঞ্চনকে বিয়ের কনে সাজিয়েছেন। পরনে লাল বেনারসী শাড়ি, গায়ে সিল্কের ব্লাউজ, পায়ে আলতা, কপালে, গালে চন্দনের সাজ; গলায় ফুলের মালা। একটা রেকাবীতে ধানদূর্বা, চন্দনবাটা। মায় টোপরটি পর্যন্ত বাদ যায়নি।

দেখে ভয় হল, আমার ডাক্তারীর মত এই বিয়ে দিতে গিয়েও বুঝি নগদ কিছু খসল। জিজ্ঞাসা করলাম—এত তাড়াতাড়ি, এত বিরাট আয়োজন? কি করে হল?

গিন্নী হেসে বললেন—তোমার ভয় নেই। একটি পয়সাও তোমার খরচ হয়নি। সবই কাঞ্চনের টাকা। আজকে যে ও মাইনে পেয়েছে। ঐ দিয়ে বরের জন্য ধুতি-পাঞ্জাবীও কেনা হয়েছে।

শুনে খুব আনন্দ হল। বললাম—কনেটিকে কিন্তু দেখাচ্ছে বেশ। আমি তো দেখে হঠাৎ চিনতেই পারিনি। তা এই বেনারসীটি কোত্থেকে এল? এটিও কি নতুন কেনা হল নাকি?

গিন্নী বললেন—তোমার যেমন কথা! স্কুল টিচার অত টাকা মাইনে পায় নাকি? ওটা আমার। সেই বিয়ের রাতে একবারই পরেছি। এখনও দেখ কেমন নতুন আছে। আজকের জন্য কাঞ্চনকে পরতে দিয়েছি। ব্লাউজটা নতুন।

বুঝলাম আবার একটি বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। গিন্নীর নিজের বেনারসী দেখেই আমার চেনা উচিত ছিল।

বললাম—তাই বল। দেখেই তাই তুমি-তুমি মনে হচ্ছিল। তা তোমাদের

বরটি কোথায়?

গিন্নী হেসে পাশের ঘরটি দেখিয়ে বললেন—সাজতে গেছে।

পাশের ঘর থেকে নতুন জামা-কাপড় পরে ক্ষিতীন বেরিয়ে এল। দাড়ি-গোঁফ কামানো। চুল পরিপাটি করে ব্রাশ করা। কিন্তু চোখে-মুখে কোনো ফুর্তি নেই। কেমন যেন মলিন বিমর্ষ গোবেচারা ভাব।

দেখে গিন্নী বললেন—বিয়ের দিনে মুখখানা অমন প্যাঁচার মত করে রয়েছেন কেন? এদিকে আসুন। এই মালাটা গলায় পরুন। আর কপালে চন্দনের ফোঁটা।

ম্লান হাসি হেসে ক্ষিতীন এগিয়ে গেল। গিন্নী চন্দন দিয়ে কপাল সাজিয়ে দিয়ে বললেন—এইবার চল। 'আমরা তৈরী। একটা খোলা ট্যাক্সি ডাক।

গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যের পর বেশ হাওয়া। তখনকার দিনে হুড-খোলা বড় ট্যাক্সি চড়ে বেড়াতে ভারি মজা লাগত। চাকরকে বলতেই একটা খোলা ট্যাক্সি নিয়ে এল। দুজন সাক্ষী, বর-কনে, গিন্নী আর আমি, এই ছ-জনে খোলা ট্যাক্সিতে উঠে রেজিস্ট্রারের বাড়ি রওনা হলাম।

ক্ষিতীন বলল—ট্যাক্সির হুডটা তুলে দিলে হতো না?

বললাম—আপনার আবার মাথা খারাপ হল নাকি?

ক্ষিতীন বলল—তাহলে বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে গলি দিয়েই চলুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

ক্ষিতীন বলল—কাঞ্চন এখনও বাড়ি ফেরে নি। ওঁরা ব্যস্ত হয়ে এখানে এসে দেখে ফলো করেন যদি?

শুনে আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

রেজিস্ট্রারের বাড়ি গিয়ে যথারীতি ফরম্ সই করে বিয়ে হয়ে গেল। আমরা তিনজন সাক্ষী হয়ে সই করলাম। একজন উকিল, একজন ইঞ্জিনীয়ার, আর একজন ডাক্তার। রেজিস্ট্রার ক্ষিতীন আর কাঞ্চনকে স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করবার পর গিন্নী বললেন—এইবার মালা বদল হোক।

মালা বদল হলে কাঞ্চন আমাকে আর গিন্নীকে প্রণাম করে বলল—আজ থেকে আপনারা আমার দাদা-বৌদি। আর কিন্তু আপনি বলে ডাকতে পাবেন না। 'তুমি' বলে ডাকা চাই।

গিন্নী খুশী হয়ে বললেন—বেশ ভাই, তাই ডাকব।

কাঞ্চনের দেখাদেখি ক্ষিতীনও গিন্নীকে ঢিপ করে একটি প্রণাম করে বসল। গিন্নী দেখলাম অবলীলাক্রমে ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—

কল্যাণ হোক।

আমি অতটা পেরে উঠলাম না। বললাম—থাক থাক আমাকে আর প্রণাম করতে হবে না।

রেজিস্ট্রারের বাড়ি থেকে বের্বার পথে কাঞ্চন ফিস-ফিস করে আমার কানে কানে বলল—বৌদিকে আবার আমার শরীরের কথা বলে দেবেন না তো?

বললাম—এমন বুদ্ধিমতী হয়েও আবার কি করে এ ফ্যাসাদ বাঁধালে বল দেখি?

মুচকি হেসে কাঞ্চন বলল—এ না হলে ওকে পেতাম কি করে?

ডাক্তারী পাশ করে বছর দুই কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস জমাবার বৃথা চেষ্টা করে ঘরের পয়সা বেশ কিছুটা নষ্ট করে আমার এক সহপাঠী বাইরে একটা ফ্যাক্‌টরীর ডাক্তার হয়ে একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে গেল, অসুখ-বিসুখ হলে যেন আমি একটু দেখি।

ছেলেটি আমাদেরই সমবয়েসী। কিন্তু চেহারা দেখে অনেক ছোট মনে হল। রোগা পাতলা ছিপছিপে লম্বা চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। চোখে পুরু কাঁচের চশমা।

কী কাজ করেন জিজ্ঞাসা করায় একটু হেসে বেশ খানিকটা দম্ভভরে মাথা নেড়ে পুলিন বলল—আমি নিজে কিচ্ছু করি না। স্ত্রী রোজগার করে, ঘরে বসে তাই খাই।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। আবার একটি বেকার রুগী ঘাড়ে এল ভেবে মনটা দমে গেল। তবু বিনয়ের হাসিটি মুখে ফুটিয়ে কোনও রকমে বললাম—আপনি দেখছি ভাগ্যবান পুরুষ। তা আসবেন যখন দরকার। যতটুকু সাধ্য নিশ্চয় করব।

পুলিন বিদায় হলে বন্ধুকে বললাম—কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে বিনে পয়সার একটি রুগী ঘাড়ে চাপিয়ে যাওয়াটা কি বন্ধুর কাজ হল?

বন্ধু হেসে বলল—আরে না, না। একেবারে বিনে পয়সার রুগী এরা নয়। কিছু কিছু দেবে। যা যখন পারে। পুলিনটা চিরদিনই ঐ রকম ঠোঁটকাটা। ঐ মুখের জন্যই ভাল কাজ ও বেশীদিন রাখতে পারে না।

সেই থেকে পুলিনের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। ক্রমে বুঝলাম ছেলেটা সত্যি একেবারে বেকার নয়। সিভিল সার্ভিস এবং আরও অনেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি না পেয়ে ভীষণ ক্ষেপে আছে। লেখাপাড়ায় বরাবর ভাল ছিল, তাই ছোটখাট কাজে মন বসে না। সামান্য কারণে বসের সঙ্গে খটাখটি লেগে যায়। কাজ ছাড়তে হয়। উপস্থিত গোটা দুই ভাল টিউশানি আছে। স্ত্রীও একটা স্কুলের হেড-মিসট্রেস। ছেলেপিলে নেই। দুজনের বেশ চলে যায়।

তখন সবে যুদ্ধ বেধেছে। এবার যে জার্মানিই জিতবে আর ইংরেজ হারবে, তাতে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। দশ দিনের মধ্যেই পোল্যান্ড খতম হয়ে গেল। আর ফাঁকতালে রুশ সৈন্য বিনাযুদ্ধে পোল্যাণ্ডে ঢুকে অর্ধেক দেশ দখল করে গ্যাঁট হয়ে বসে গেল। দেখে আমরা দু-পক্ষকেই বাহবা দিলাম। ভাবলাম বেশ হয়েছে। রুশ-জার্মান প্যাঁচে পড়ে ইংরেজের এবার আর রক্ষে নেই।

সেই সময় শীতের রাতে হঠাৎ একদিন খট্-খট্ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে মনে হল কে যেন দরজায় ঘা মারছে। তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বেলে শাল গায় দিয়ে হাঁক দিলাম—কে?

দরজার কড়ানাড়া বন্ধ করে বিপন্নকণ্ঠে কে যেন বলল—ডাক্তারবাবু আছেন?

দরজা খুলে দেখি পুলিন।

বিস্মিত হয়ে বললাম—এত রাত্রে? কি ব্যাপার?

পুলিন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল—এক্ষুনি একবার আসতে হবে দয়া করে। শিগ্গির চলুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

পুলিন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হল। বলল—কি হয়েছে বুঝলে আর আপনার কাছে ছুটে আসব কেন? আমি কি ডাক্তার? ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি, গিয়ে দেখে বলুন কি হয়েছে।

কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বললাম—কাকে দেখব?

এইবার পুলিন বোধ হয় বুঝল। বলল—দেখুন ভারি ঘাবড়ে গেছি, তাই আসল কথাই বলা হয়নি। বিরজা কেমন যেন করছে। বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে। একা ফেলে ট্যাক্সি নিয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। চলুন শিগ্গির।

বললাম—তা যাচ্ছি। কিন্তু এত রাত্রে আপনার নিজের ঘুমই বা ভাঙল কি করে? আর গিন্নী ঘুমুচ্ছেন না অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তাই-বা বুঝলেন কি করে?

পুলিন বলল—রাত ৯টার শো-তে সিনেমায় গিয়েছিলাম। ফিরে এসে খেয়েদেয়ে শুতে শুতে বারোটা বেজে গেল। রাত্রে একখানা বই নিয়ে না শুলে আমার আবার ঘুম আসে না। কিন্তু বিরজা বলল, ওর ঘুম পাচ্ছে। আলো নিভিয়ে দিতে। দেই, দিচ্ছি করে একটু দেরি হয়ে গেল। হঠাৎ

গোঁ গোঁ শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি বিরজা দু-হাতে পেট ঠেসে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে শব্দ করছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে? একবার কোনও রকমে বলল—কিছু না। তারপর থেকেই কি রকম করে যেন তাকিয়ে রইল। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। ডাকলেও সাড়া দেয় না। পেটে হাত দিলেও উঃ আঃ কিছুই করে না। তাই ভয় হল বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—ওঁর কি ফিটের ব্যামো আছে নাকি

পুলিন বলল—আগে তো কখনও দেখিনি। আজই দেখছি কি রকম যেন করছে। একবার শুধু বলেছে ডানদিকের পেটে খুব ব্যথা। এ্যাপেণ্ডি-সাইটিস নয় তো?

বললাম—চলুন দেখে আসি।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে ব্যাগ নিয়ে তৈরী হয়ে পুলিনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই বাড়ি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

গিয়ে দেখি শোবার ঘরে লেপ গায়ে দিয়ে বিরজা শুয়ে আছে। মাঝ-বয়েসী ঝি-টি মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলোচ্ছে। এই দারুণ শীতে হাতপাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করছে।

আমরা ঢুকতেই ঝি-টি উঠে দাঁড়াল। বিরজা চোখের পাতা খুলল না। খাটের পাশে চেয়ারে বসে নাড়ী দেখলাম বেশ স্বাভাবিক। হাত ঠাণ্ডা নয়। চোখের পাতা টেনে দেখতেই বিরজা চোখ মেলে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোনো কষ্ট হচ্ছে?

কিছুক্ষণ আমার চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে তাকিয়ে বিরজা বলল—পেটে খুব ব্যথা।

পেটে হাত দিতেই বিরজা উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। যেখানেই হাত দিই, বলে, ভীষণ ব্যথা। ভাল করে আস্তে আস্তে সমস্ত পেটটা টিপে দেখে মনে হল, সে রকম ব্যথা কোথাও কিছু নেই। আসলে রোগটা মনের।

পুলিন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল এ্যাপেণ্ডিসাইটিস নয় তো?

গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললাম—না। সে রকম কঠিন কোনো অসুখ তো মনে হচ্ছে না।

পুলিন বলল—তাহলে হজমের গোলমাল থেকেই হয়েছে। কি বলেন?

ব্যাগ থেকে একটা বড়ি বার করে বললাম—তা হতে পারে। এই বড়িটা খাইয়ে দিন, এক্ষুণি ব্যথা কমে যাবে। তারপর কাল সকালে দেখা যাবে।

পুলিন তক্ষুনি বড়িটা খাইয়ে দিল। আমিও উঠলাম।

দেখে পুলিন বলল—আর একটু দেখে যান।

অনেক ভরসা দিয়ে বললাম—ব্যথা এমনিতেই অনেক কমে গেছে। অষুধে আরও কমে যাবে, ঘুম হবে। আর বসবার দরকার নেই।

তবু পুলিন ছাড়ল না। একটু বসুন, একটু বসুন বলে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখল।

শীতের রাতে ঘুম থেকে উঠে এই রকম নিউরটিক রুগীর কাছে বিনা প্রয়োজনে বসে থাকতে কার ভাল লাগে বলুন দেখি?

কিন্তু পুলিন কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা বিরজার কাছে গিয়ে বসলাম। নাড়ী দেখে বললাম—এই তো দেখছি ব্যথা বেশ কমে গেছে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হয়েছে। এইবার আলো নিভিয়ে দিয়ে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

বিরজা আমার হাত চেপে ধরে বলল রাত্রে আবার বাড়বে না তো?

বললাম এই ওষুধের কাজ ছ-ঘণ্টা পর্যন্ত থাকবে। কাজেই রাতে আর কিছু হবে না। এখন আর কথা বলবেন না। আলো নিভিয়ে দিক। নইলে হয়ত মাথা ধরবে। অষুধের কাজ ভাল হবে না।

কাল নিশ্চয় একবার আসবেন বলে বিরজা আমার হাত ছেড়ে দিল।

ভেবেছিলাম, পরদিন ভোর না হতেই পুলিন এসে দরজা ধাক্কাবে, কিন্তু বেলা ন-টা বেজে গেল পুলিনের দেখা নেই।

বুঝলাম বিরজা নিশ্চয় ভাল আছে। তবু বেরুবার মুখে ওদের বাড়িই আগে গেলাম। দেখলাম স্নান-খাওয়া সেরে পোশাক পরে বিরজা স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত। আমাকে দেখেই সলজ্জ হেসে বলল—আসুন।

পুলিন মুখ গোমড়া করে খবরের কাগজ নিয়ে বসে ছিল।

আমি ঢুকতেই বলল—এই দেখুন কত করে বারণ করলাম স্কুলে যেতে। কিন্তু একটা দিনও রেস্ট নেবে না। এই নিয়েই সকাল থেকে কথা কাটাকাটি তাই আর আপনার কাছে যাওয়া হল না।

বিরজা একটু হেসে বলল—অসুখ হলে কামাই তো করতেই হবে; কিন্তু মিছিমিছি কামাই করব কেন?

আমাকে বলল—আচ্ছা বলুন দেখি আমার সত্যি কি ছুটি নেওয়া দরকার?

জিজ্ঞাসা করলাম—কাল আর কোনো কষ্ট হয়নি তো? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না, আপনার কোনো অসুখ আছে।

বিরজা লজ্জা পেল। হেসে বলল—আপনি যাবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালে উঠে মনেই হল না কাল অত কষ্ট গেছে। মিছিমিছি আপনাকে শুধু ভুগিয়েছি।

বললাম—তাহলে যান স্কুলে।

বিরজা বলল—সন্ধ্যেবেলা আপনার কাছে যাব। তখন একবার ভাল করে দেখে একটা অষুধ-টষুধ কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন।

সেই থেকে বিরজাও আমার কাছে আসতে শুরু করল। ওকে পরীক্ষা করে ওর দেহে কোথাও রোগ আছে বলে মনে হল না। কখনও বলে কোমরে ব্যথা, কখনও মাথায়।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম চার-পাঁচ বছর আপনাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনও বাচ্চা হয়নি কেন?

একটু দ্বিধা করে বিরজা বলল—আমরা চাইনি তাই।

বললাম এইবারে বাচ্চা না হলে আপনার শরীর কিন্তু সারবে না।

ম্লান হেসে বিরজা বলল সেকথা ওঁকে বলবেন। বাচ্চা টাচ্চা উনি ভালবাসেন না।

পরদিন পুলিন এলে ওকে বুঝিয়ে বললাম এইবার একটি বাচ্চা হওয়া কেন এত দরকার।

কিন্তু পুলিন বুঝবে না।

বলল—এই নিয়ে আমাদের অনেক কথা হয়েছে। বাচ্চা আমরা এক্ষুনি চাই না। আমার একটা ভাল কাজ হলে তখন এসব বিলাসিতার কথা ভাবা যাবে। এসব ব্যাপারে বিরজা খুব র‍্যাশনাল। ওর সংগে কথা বলে দেখবেন, এসব ঝামেলা ও এখন চায় না।

বললাম—আমি পরীক্ষা করে দেখেছি ওঁর শরীর ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। অষুধে কিচ্ছু হচ্ছে না। হিস্টিরিয়ার সব লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। আজ মাথাব্যথা, কাল কোমরে ব্যথা, পরশু বুক ধড়ফড়। শেষে যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়?

এইবার পুলিন যেন একটু ভয় পেল। বলল—বিরজার হিস্টিরিয়া হয়েছে নাকি? আমি তো জানি ওর মন খুব শক্ত।

বললাম—শক্ত বলেই এতদিন চেপে আছেন। কিন্তু আর পারবেন না। তাড়াতাড়ি একটা বাচ্চা না হলে দেখবেন শরীর আরও ভেঙে পড়বে। পাগল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

পুলিন ঘাবড়ে গিয়ে বলল—বলেন কি? এই থেকে আবার পাগল হয়ে যায় নাকি?

খুব বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে হেসে বললাম—তা যায় বইকি! রিস্ক নিতে চান, নিয়ে দেখুন। বড় ডাক্তার কাউকে যদি দেখান, তিনিও দেখবেন এই কথাই বলবেন।

চিন্তিত মলিন মুখে পুলিন উঠে গেল। মুখ দেখে মনে হল ওর বুঝি সর্বনাশ হয়েছে। হয় চাকরি গেছে, নয় যথাসর্বস্ব চুরি হয়েছে।

তারপর অনেকদিন ওরা কেউ আর এল না।

তখন জার্মানির জয় জয়কার। পোল্যান্ড গেছে। ফ্রান্সও খতম হয়েছে। ইটালী-জর্মান-জাপান মিলে অক্ষশক্তি তৈরী হয়েছে। কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট শুরু হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যের সময় পুলিন আবার এল। কোট-প্যান্ট পরা। ছোট করে চুল-ছাঁটা।

বললাম—কি খবর?

হেসে পুলিন বলল—নতুন চাকরি। তাই একটু ব্যস্ত ছিলাম। অনেকদিন এদিকে আসা হয়নি।

শুনলাম গভর্নমেণ্টের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টে ভাল একটা কাজ পেয়েছে। খুব খুশী হলাম।

বললাম—বাড়ির খবর কি?

পুলিন বলল—সেইজন্যই তো এলাম। চলুন একবার।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

পুলিন বলল—যা চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে। তখন বলেছিলেন বাচ্চা না হলে শরীর খারাপ হবে। এখন দেখছি হবার সম্ভাবনা থেকেই শরীর খারাপ হয়েছে। আজ মাসখানেক থেকে কিছুই খায় না। পুষ্টিকর কিছুই পেটে থাকে না। আজে-বাজে ছাইভস্ম কিসব সারাদিন খায়। এবার দেখছি আমিই পাগল হয়ে যাব।

বললাম—এতে আর ভয় পাবার কি আছে, প্রথম প্রথম অনেকেরই এরকম হয়। চলুন দেখে আসি।

গিয়ে দেখি বিরজা বিছানায় শুয়ে কি একটা বই পড়ছে। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি বইটা বালিশের নীচে লুকিয়ে উঠে বসে সলজ্জ হাসি হেসে বলল—আসুন।

দেখলাম, চেহারা বিশেষ খারাপ কিছু হয়নি। মুখখানা একটু যেন

শুকনো। চোখ দুটি খুশীতে বেশ উজ্জ্বল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কষ্ট কিছু নেই তো?

মৃদু হেসে বিরজা বলল—না। এতদিন কিছু খেতে পারতাম না। এখন তো সব খাচ্ছি।

পরীক্ষা করে একটা ভিটামিন আর আয়রন-টনিক লিখে দিলাম। বললাম—এইবার শরীর ক্রমশ ভাল হবে। একটু কিছু খারাপ মনে হলেই খবর দেবেন।

সেই থেকে প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতে হত। সময় হবার মাসখানেক আগে একদিন আমাদের হাসপাতালে দেখিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর আর একদিন হাসপাতালে ভরতি করে দিলাম। বাচ্চা হতে কোনো গোলমাল হল না। দিন সাতেক হাসপাতালে থেকে একটি ছেলে নিয়ে বিরজা একদিন বাড়ি ফিরে এল।

তখন প্রায়ই পুলিন আসত। আমাকেও ওদের বাড়ি যেতে হত। আজ ছেলের পেট খারাপ, কাল জ্বর।

এমনি করে মাস ছয়েক কেটে গেল। আমি তখন এ আর পি-র ডাক্তার। জাপানী বোমার ভয়ে লোকে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে।

একদিন পুলিন আমার পোস্টে এসে বলল—আপনি কী মন্ত্র যে বিরজার কানে দিয়ে এসেছেন, জন্ম-নিরোধের কোনো ব্যবস্থা আর নেওয়া যাবে না।

বললাম—প্রয়োজনই বা কিসের? দুজনেই তো এখন চাকরি করছেন।

পুলিন বলল—তাই বলে ছ-মাসের মধ্যেই আবার সন্তান-সম্ভাবনা হবে? এতে বিরজার শরীর টিঁকবে?

বললাম—যত্ন নিলে কেন টিঁকবে না? এটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পুলিন বলল—কি জানি। এত ঘন-ঘন ছেলেপিলে হওয়া আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া ওর শরীর টিঁকলেও আমার টিঁকবে না। এত ঝামেলা আমি সইতে পারব না। জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা যখন নেওয়া যাচ্ছে না, তখন এইবার বাচ্চা হলে ওর একটা অপারেশন করিয়ে দিন।

শৌখিন সমাজে মেয়েদের এই অপারেশন তখন সবে শুরু হয়েছে। এখনকার মত হাসপাতালে এত বেশী টিউব লাইগেশন তখনও রেওয়াজ হয়নি। যাদের পয়সা আছে, তারাই শুধু নার্সিংহোমে থেকে এই লাই-গেশন করাতে পারত।

বললাম—বিরজা এতে রাজী হবে কি?

হেসে পুলিন বলল—ওই তো আপনার কাছে আমায় পাঠালে।

বললাম—মেয়েদের বেলায় অজ্ঞান করে পেট কেটে জরায়ুর দুপাশের টিউব বার করে কেটে বেঁধে দেওয়া হয়। ১০।১৫ দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়।

পুলিন বলল—তা বিরজা জানে। ওর এক বন্ধুর নাকি হয়েছে।

বললাম—তার চেয়ে আপনি নিজেই কেন ভ্যাসেক্‌টমি করিয়ে নেন না? অজ্ঞানও করতে হবে না। শুয়েও থাকতে হবে না।

পুলিন জিজ্ঞাসা করল—ওটা কি অপারেশন?

বললাম—ইন্‌জেকসন্‌ দিয়ে অসাড় করে কুঁচকির দুপাশ কেটে যে টিউব দিয়ে বীজ যায়, সে দুটি কেটে বেঁধে দিলেই হল। কোনো ঝামেলা নেই। ছোট্ট অপারেশন।

পুলিন বলল—কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধে হয় না?

বললাম—না। যৌবন ফিরে আসে। ক্ষরণও ঠিকই হয়। শুধু সন্তান হয় না।

পুলিন বলল—বেশ তাই করে দিন তাহলে। কত খরচ হবে?

বললাম—আপনি মন ঠিক করুন। ওসব হবে পরে।

পুলিন বলল—মন আমার ঠিক আছে। আপনি খবর নিন।

বললাম—বেশ কাল আসবেন। সব বলে দেব।

সেই যে পুলিন গেল, আর এল না। দেখতে দেখতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নেবে জার্মানী হাবুডুবু খেতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হল।

আবার একদিন পুলিন এল। বলল—বিরজার হাসপাতালে যাবার সময় হয়েছে। একবার দেখে একটু ব্যবস্থা করে দিন।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার সেই অপারেশনের কি হল?

পুলিনের মুখ যেন একটু লাল হল। বলল—আমি তো রাজীই ছিলাম, কিন্তু বিরজা কিছুতেই রাজী হল না। বলল, এইবার বাচ্চা হলে ও নিজেই লাইগেশন করিয়ে নেবে।

বললাম—কিন্তু এ অপারেশন তো হাসপাতালে হবে না। মাত্র দুটি বাচ্চা, কোনো সার্জন হাসপাতালে এসব করবে না।

তাহলে নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করুন। খরচ যাই হোক সন্তান মানুষ করবার চেয়ে তো আর বেশী হবে না?

ওর কথায় সার্জনদের সঙ্গে পরামর্শ করে একবার ঠকেছি। এবার

তাই চট্ করে আর রাজী হলাম না।

বললাম—বিরজাকে একদিন নিয়ে আসুন। অপারেশনের সুবিধে অসুবিধে সব উনি শুনুন। তারপর নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করা যাবে।

পুলিন বলল—তাহলে আজই চলুন। এই শরীরে ওর এখানে আসা কি ঠিক হবে?

বললাম—বেশ তাহলে কাল আসবেন। কাল গিয়ে কথা বলে আসব।

পরদিন পুলিন এসে ওদের বাসায় নিয়ে গেল। বিরজাও দেখলাম এই অপারেশনে খুব রাজী। বলল—দুটির বেশী সন্তানের আমার দরকার নেই। আপনি সব ঠিক করুন।

স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ একজন সার্জনকে দেখিয়ে নার্সিং হোমে সব ব্যবস্থা করে দিলাম। ঠিক হল যেদিন বাচ্চা হবে তার পরদিন লাইগেশন হবে।

একদিন সময় মত বিরজা নার্সিং হোমে গেল। সেদিনই রাত্রে ওর আর একটি ছেলে হল।

পরদিন বেলা ১২টায় অপারেশন। বিরজাকে রেডী করা হয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সার্জন এসে পড়বেন। এট্রোপিন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হল। দেখলাম বিরজার মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

বিরজা আমার হাত শক্ত করে ধরে রইল। দেখলাম হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। বুঝলাম ভয় পেয়েছে।

ভরসা দিয়ে বললাম—অপারেশনের আগে সকলেরই ভয় হয়। কিন্তু সত্যি ভয় কিছু নেই। কিছু টের পাবেন না।

বিরজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। আমার হাত আরও শক্ত করে ধরে বলল—অপারেশনের ভয় আমার নেই।

গলার স্বর শুনে চমকে উঠলাম। বললাম—তা হলে?

বিরজা পাশের বেবী-খাটে ওর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল—এটা ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হত !

এইবারে বুঝলাম। বললাম—তাতে কি হয়েছে? অপারেশন তাহলে এবার থাক।

দেখলাম বিরজার মুখের সেই পাংশু ভাব কেটে গেল। চোখে মুখে হাসির আভা খেলে গেল।

বলল—কিন্তু ওঁকে কি বলব?

বললাম—সেজন্য ভাববেন না। বলা যাবে, কাল যে পরিমাণ রক্ত ক্ষয় হয়েছে তাতে এ অপারেশন এখন আর করা চলবে না। আপনি শুধু বলবেন কেন ডাক্তার অপারেশন করল না তা আপনি জানেন না।

বিরজা খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার হাতটা একটু ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল।

নার্সকে ডেকে বললাম—অপারেশন হবে না। রুগীকে খেতে দিন।

নার্স অবাক হয়ে গেল। বলল—সে কি? কেন?

কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম—গোলমাল আছে।

সার্জনকে টেলিফোন করে বারণ করে নীচে নেমে দেখি পুলিন বসে আছে।

উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করল—কখন হবে?

মুখ খুব গম্ভীর করে বললাম—কাল ভীষণ হেমারেজ হয়েছে। এ অবস্থায় অপারেশন চলবে না।

পুলিনের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল—তাহলে?

বললাম—আবার একটি হোক। তখন হবে। না হয় আপনি নিজেই এবার ভ্যাসেক্‌টমি করিয়ে নিন না?

পুলিন বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

॥ ১৫ ॥

হাসপাতালের কাজ শেষ করে বেরুবার মুখে সেদিন হঠাৎ যোগেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় বিশ বছর আগে। বি-এ পাশ করে ও তখন একটা স্কুলের মাস্টার। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী আর গান্ধী-টুপি পরত। আজ দেখলাম পাক্কা সাহেব। সদ্য পাটভাঙা ট্রপিক্যাল সুট-পরা। হাতে বিলিতি চামড়ার বড় একটি পোর্টফোলিও।

আমাকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে হাত ধরে খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যোগেশ বলল—আরে ডাক্তার যে! এইখানে? কতদিন পর দেখা হল বলুন তো?

হেসে জবাব দিলাম—তা দশ-বারো বৎসর হবে বইকি। এই হাসপাতালেই তো পাঁচ বছর কেটে গেল। কিন্তু আপনি? ভোল বদলে কোত্থেকে উদয় হলেন?

যোগেশ নিজের পোশাকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে হেসে বলল এই ভোলটি আছে বলেই এখনও চাকরিটি আছে। শালারা যখন পয়সা দেয়, তখন খরচ করতে ভয় কিসের? এই স্যুটটা মাদ্রাজ থেকে করিয়েছি আজ তিন বছর; কিন্তু দেখুন এখনও মনে হচ্ছে যেন নতুন। এইমাত্র আপনাদের মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর অফ মেডিসিন বললেন তিনি যে স্যুটটা এবার করিয়েছেন, তার চেয়েও এটা ভাল।

চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। এইবারে নিশ্চিত বুঝলাম যোগেশ বিলিতি অষুধের সেলস্‌ম্যান।

জিজ্ঞাসা করলাম—কবে থেকে এ কাজে ঢুকলেন? কোন কোম্পানী?

খুব বড় একটা আমেরিকান কোম্পানীর নাম করে যোগেশ বলল—যুদ্ধের সময় সেই যে মাস্টারী ছেড়েছি, আর ওদিকে মাড়াই নি। কিছুদিন দালালী-ফালালী করে শেষে এই কাজটা পেয়ে গেলাম। এদের সঙ্গেই আছি আজ দশ বছর। এতদিন বাইরে বাইরে ঘুরিয়ে শালারা এতদিনে আবার কলকাতায় পোস্ট করেছে।

দশ বছর যখন এক জায়গায় আছে, কাজও নিশ্চয়ই ভালই করছে। বললাম—এরা তো মাইনে খুব ভাল দেয় শুনেছি।

যোগেশ বলল—তা মন্দ নয়। বাইরে যখন ঘুরি ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া ট্র্যাভেল করি না। ট্যাক্‌সি ছাড়া চড়ি না। ফার্স্ট ক্লাস হোটেল নইলে উঠি না। এদের খরচায় দেখুন কেমন আরামসে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে নিলাম।

বললাম—আপনি খুব লাকি তো! চলুন ঘরে বসে কথা বলি।

যোগেশ বলল—আপনাকে পেয়ে খুব সুবিধে হল। চলুন ডাক্তারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

আমাদের বসবার ঘরে ওকে নিয়ে বসালাম। চাকরকে চা দিতে বললাম। যোগেশ পকেট থেকে সোনালী রঙের পাতলা সিগারেট কেস থেকে দামী সিগারেট বার করে আমাকে একটি দিয়ে নিজে একটি ধরালো।

ওকে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলে কেমন যেন নতুন নতুন লাগল। কে বলবে এই সেই খালের ধারের মাইনর স্কুলের খদ্দরপরা হেডমাস্টার। সেই মুখচোরা লাজুক যোগেশ!

ওর স্ত্রী মণিকার কথা মনে পড়ল। ওরা তখন সবে বিয়ে করেছে। উত্তর কলকাতার খালের ধারে ছোট্ট একখানা ঘর নিয়ে থাকে। দুজনেই কাজ করে। যোগেশ ছেলে পড়ায়; মণিকা মেয়ে।

শনিবার রাত্রে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যেতে হত। মণিকা মাংস রান্না করে খাওয়াত। অমন চমৎকার রান্না কখনও আগে খাইনি। অল্প রোজগার তবু ঘর-দোর, পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিমছাম ফিটফাট। নোংরা দেখিনি।

বছর তিনেকের মধ্যে পর পর তিনটি সন্তান হয়ে মণিকার অমন সুন্দর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেল। রক্তশূন্য, পেট খারাপ, পা-ফোলা সব একসঙ্গে দেখা দিল।

তখন কলকাতায় পা-ফোলার এপিডেমিক। লোকে বলত বেরিবেরি। ডাক্তাররা বলত এপিডেমিক ড্রপ্‌সি। কেন এ রোগ হয়, তা জানা নেই। ঘরে ঘরে লোকের পা ফুলছে, বুক ধড়ফড় করছে। হঠাৎ কারু কারু আবার মৃত্যুও হচ্ছে। বাঙালী ঘরেই এ রোগ বেশী দেখা গেল।

ভাত-খাওয়া বাঙালী। তাই সন্দেহ হল চাল থেকেই হয়ত এ রোগ হয়। ট্রপিক্যাল স্কুলে রিসার্চ চলতে লাগল। শোনা গেল কলের চাল থেকেই এ রোগ হয়। ঢেঁকিছাঁটা চাল যারা খায়, তাদের এ রোগ হয় না। আটা যারা খায়, তাদেরও হয় না।

বাজারে ঢেঁকিছাঁটা চালের দর বেড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বাঙালী ঘরে জাঁতা-ভাঙা আটা খাওয়া শুরু হল।

তবু পা-ফোলা কমে না। চোখের গোলকের ভিতর জল বেড়ে গিয়ে গ্লোকোমা হয়ে লোকে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে শোনা গেল। মেডিক্যাল কলেজে গ্লোকোমার অপারেশন বেড়ে গেল।

এমনি সময়ে ট্রপিক্যাল স্কুলের রিসার্চের ফল বেরুল। শোনা গেল, চাল থেকে এ রোগ হয় না। হয় সরষের তেল থেকে। শহরের লোকে যে তেল খায়, তাতে আর্জিমোন বলে একরকম ভেজাল থাকে, তা থেকেই এ রোগ হয়। সেই থেকে বাঙালী-ঘরের হেঁসেলে দালদা ঢুকে গেল।

সেই সময় যোগেশ একদিন এসে বলল—মণিকাকে নিয়ে আর তো পারি না। আবার শুনছি নাকি বাচ্চা হবে। দেখুন দেখি কি মুশকিল!

শুনে চমকে উঠলাম। এই শরীর মণিকার, তার ওপর এই কাণ্ড! খুব রাগ হল।

বললাম—অপরাধটা কার? মণিকার, না আপনার?

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে যোগেশ বলল—নিশ্চয়ই মণিকার। ওর শরীর ও যদি না বোঝে, আমি তার কি করব? জন্ম-নিরোধের কোনো ব্যবস্থাই ও পেরে ওঠে না। এখন কি করি, বলুন তো?

ওর কথা বিশ্বাস হল না। একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—তা ওকে কিছুদিন বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেই তো পারতেন। কটা মাস অন্তত একটু বিশ্রাম পেত।

যোগেশ বলল—সে সুখ কি আর আমার কপালে আছে? শ্বশুর-শাশুড়ী কেউই বেঁচে নেই। শালারা সব নাবালক। একবার চলুন। যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা দিয়ে আসুন। ক-দিন থেকে উঠতেই পাচ্ছে না। তার ওপর ছোটটার আবার জ্বর। আমাকে দেখছি এরা পাগল করে ছাড়বে।

হাতে কাজ ছিল। বললাম আপনি যান। ঘণ্টাখানেক পরেই আমি যাচ্ছি।

সন্ধ্যের সময় ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি যোগেশ উনুন ধরিয়ে রান্না বসিয়েছে। মণিকা তক্তাপোশে শুয়ে। ঘরদোর সব নোংরা।

আমাকে দেখে মণিকা বলল—দেখুন তো এই বাচ্চাটার আবার কি হল? জ্বর হয়েছে। সর্দিও রয়েছে খুব। বুকে আবার সর্দি বসে যায়নি তো?

বাচ্চা মেয়েটাকে পরীক্ষা করে মনে হল বুকে কোনো দোষ নেই। গলাটা দেখে একটা মিক্‌শ্চার লিখে দিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কেমন আছেন?

মণিকা বলল—দেখতেই তো পাচ্ছেন ঘরদোরের কি অবস্থা। উঠতেই পাচ্ছি না বিছানা থেকে। এবার ঠিক মরে যাব।

ওর অবস্থা দেখে মায়া হল। এই শরীর নিয়ে কি করে ও এতদিন চালাবে ভেবে পেলাম না।

একটা গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দিয়ে বললাম—কাল চলুন বিশেষজ্ঞ কাউকে দেখাই। তারপর দেখা যাক কি করা যায়।

আমাদের এক সহপাঠী তখন নতুন একটা হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। তার কাছেই মণিকাকে নিয়ে গেলাম।

সব অবস্থা বুঝিয়ে বললাম—এবার এটা বার করে দেওয়া যাক। নইলে ও বাঁচবে না।

সহপাঠী একটু সন্দিগ্ধস্বরে বলল—তোমার অত গরজ কেন? ভেতরে কোনো গড়বড় আছে নাকি? তাছাড়া হাসপাতালে কি এসব হবে? আচ্ছা দেখি পরীক্ষা করে।

এক সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া অন্য সব দেশে সন্তানসম্ভাবনা হলে তা নিজের ইচ্ছায় নষ্ট করা বে-আইনী। তাই এর নাম ক্রিমিন্যাল এবরশন। ব্যতিক্রম শুধু ডাক্তারের বেলায়। চিকিৎসক যদি মনে করেন প্রসূতির জীবন রক্ষার জন্য ভ্রূণ বার করে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই, তাহলে সেটা হয় জাস্টিফিএবল অথবা থেরাপিউটিক এবরশন। আইনের এই রন্ধ্রপথেই সব দেশে এই কাজটি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে অতি সংগোপনে ঘটে। তাই যাদের অর্থ অথবা প্রতিপত্তি আছে তারাই শুধু এ সুযোগ পায়। যাদের নেই তারা ভোগে।

সোভিয়েট দেশে বিপ্লবের পরেই নিয়ম হল যার ইচ্ছে জন্মনিরোধ অথবা এবরশন করাতে পারবে। গভর্নমেণ্ট ক্লিনিক খুলে দিল যাতে নিখরচায় মেয়েরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে এ কাজ করাতে পারে। চিকিৎসকরা শুধু বুঝিয়ে দিতেন এ করালে মায়ের কি ক্ষতি হতে পারে। বার বার করালে ইচ্ছে থাকলেও পরে আর সন্তানধারণ করা যায় না। সময় হবার আগেই বেরিয়ে যায়।

দেখা গেল প্রথম প্রথম মেয়েরা যত বেশি এ কাজ করাতো ক্রমেই তা কমে যাচ্ছে। পরে জার্মানির সমরসজ্জা দেখে আত্মরক্ষার জন্য দেশের লোকসংখ্যা বাড়ানো দরকার মনে করে সোভিয়েট সরকার আবার এটা বন্ধ করে দেয়।

তারপর সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রী বুলগানিন ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রী ক্রুশ্চেভের বাণী শুনতে যেদিন ময়দানে কলকাতার লাখো লাখো লোক জড়ো হয়ে 'হিন্দী-রুশী ভাই ভাই' ধ্বনি তুলল, সেদিনই সোভিয়েট সরকার বিশ বছর পরে আবার এবরশন আইনসঙ্গত করে দিল। রুশ মেয়েরা এখন ইচ্ছে হলেই সরকারী হাসপাতালে গিয়ে বিশেষজ্ঞ দিয়ে আবার এ-কাজ করিয়ে আসতে পারবে। আইনে বাধবে না, পয়সাও লাগবে না।

মণিকাকে পরীক্ষা করে আমার সহপাঠী বলল ওর শরীরটা দেখছি খুবই দুর্বল। এপিডেমিক ড্রপসি, এনিমিয়া তার ওপর প্রেগন্যান্সী। কিন্তু ঠিক মত চিকিৎসা করালে আর যত্ন নিলে কেন সন্তানধারণ করতে পারবে না?

বললাম--এই তো এদের অবস্থা। চিকিৎসাই বা হবে কি করে, আর যত্নই বা নেবে কে?

সহপাঠী বলল—তবু ভাই তুমি একবার প্রফেসরকে দেখাও। তিনি যদি বলেন আমি হাসপাতালে ভরতি করে এটা করে দেব।

বুঝলাম নিজে ও দায়িত্ব নিতে ভরসা পায় না। অগত্যা প্রফেসরকেই দেখলাম।

বলাবাহুল্য, তিনি রাজী হলেন না। বললেন--এর যদি টি বি হত তাহলে আমরা করে দিতাম। এখন ওসব হবে না।

কিছুই করা গেল না। ফিরে এলাম।

মণিকা কয়েকদিন গ্লুকোজ নিয়ে আবার উঠল। কিন্তু এনিমিয়া আর পা ফোলা ওর গেল না। লিভার এক্স্ট্রাক্ট ইনজেকশন দিয়ে আর আয়রন খাইয়েও কোনো ফল হল না। তবু যথাকালে ওর আট পাউন্ডের একটি মেয়ে হল।

কিন্তু তার পরেই যে মণিকার জ্বর শুরু হল তা আর ছাড়ে না। ঘুষ-ঘুষে জ্বর। রোজ একটু করে হয়। হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসে মাস-খানেক পরে একদিন ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হল। খুব সর্দি কাসি।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেটা কমে গেল, কাসিটা গেল না। গলায় পেন্ট লাগিয়েও কোনো কাজ হয় না, বুকে একটা আওয়াজ পাওয়া যায়। একদিন বললাম, একটা এক্সরে করা দরকার।

শুনে মণিকা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল—এই ভয়ই আমার ছিল। এবার আমি আর বাঁচব না। কিন্তু এই বাচ্চাগুলির কি হবে?

অনেক করে ভরসা দিয়ে বুঝিয়ে একদিন এক্সরে করিয়ে আনলাম।

দেখা গেল বুকের দুদিককেই টি বি। থুতু পরীক্ষা করে যক্ষ্মার বীজাণু পাওয়া গেল। শুনে যোগেশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ভয় পেয়ে ব্যাকুল হয়ে বলল—এখন উপায়?

তখনকার দিনে বুকের একদিকে টি বি হলে তবু কিছু করা যেত। কিন্তু দুদিকে হলে শুইয়ে রাখা ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা আমাদের ছিল না। অনেক তম্বির করে তাই খালের ধারে একটা হাসপাতালে ওকে রাখা হল।

কিন্তু বেশী দিন শুয়ে মণিকা থাকল না। মাস চারেক পর রক্ত তুলে একদিন মারা গেল।

আজ যোগেশকে দেখে সেদিনকার সেই যোগেশকে আর খুঁজে পেলাম না। চা খেতে খেতে যোগেশ বলল—আমাদের কোম্পানী টি বি-র যে অষুধটা বার করেছে, অন্য সব ব্র্যাণ্ড থেকে সেটা অনেক ভাল। আপনারা নিশ্চয়ই এতদিনে তা দেখেছেন। আপনাদের এই হাসপাতালে কিন্তু এটা চালাতে হবে।

বললাম—বেশ তো; সুপারিণ্টেণ্ডেটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ওঁকে বলুন। পরে আমি আবার না হয় মনে করিয়ে দেব। উচ্ছ্বসিত হয়ে যোগেশ বলল—আপনি যখন আছেন, এখানকার অর্ডার যে পাবই তা আমি জানি। চলুন না একদিন বাড়িতে। চন্দনা আপনাকে দেখলে খুব খুশী হবে।

বললাম—ওর কি এখনও আমাকে মনে আছে? সেই কতটুকু দেখেছি।

হো-হো করে হেসে যোগেশ বলল—ওকে আপনি আবার দেখলেন কবে? বিয়েই তো করেছি মাত্র পাঁচ বছর আগে। চমৎকার রাঁধে কিন্তু। মাংস যা রাঁধে জীবনে কখনও খাইনি। চলুন আজ রাতে। একেবারে ডিনার খেয়ে ফিরবেন।

রাত ন-টার শো ছাড়া সিনেমা দেখা আমার হয়ে ওঠে না। কোনো ডাক্তারেরই বোধহয় হয় না। লাইট হাউসে একটা ভাল ছবি দু-তিন হপ্তা চলে যেদিন শেষ হয়ে গেল; সেদিনই লাস্ট শোর টিকিট কেটে অন্ধকার ঘরে ঢুকে চেয়ারের দুই সারির মাঝখানের ফাঁক দিয়ে ঠেলে ঠুলে কোনও রকমে নিজের সিটটায় গিয়ে বসে পড়লাম।

তখন নিউজ রিল চলছে। পণ্ডিত নেহরু কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন, কোনখানে কোন পরিকল্পনার গোড়া পত্তন করেছেন, কোন মিটিংএ কি বক্তৃতা দিয়েছেন, কত লোক হয়েছে সব দেখানো এবং শোনানো হচ্ছে।

নিজের সিটে অন্ধকারে বসে আছি। চোখ দুটো তখনও অন্ধকারে দৃষ্টি হানতে ঠিক তৈরী হয়নি। পর্দার ছবি ছাড়া আশেপাশের আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ সামনের সিটের একটি মাথা পাশের সিটের মাথাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল। তাকিয়ে দেখি একটি যুবক আর একটি যুবতী। শুনলাম ফিস্-ফিস্ কথা; আর খুক্-খুক্ চাপা কাসি।

নেহরুজীর সফর দেখা আর হল না। সামনের ঐ মাথা দুটির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সোজা হয়ে বসলাম। পণ্ডিতজীর কথায় ওরা কী এমন হাসির খোরাক পেল জানবার জন্য চোখ কান খাড়া করে রাখলাম। নড়ে-চড়ে সামনে ঝুঁকে মনে হল মাথা দুটির একটি যেন চেনা! হ্যাঁ, বেশ ভাল করেই চেনা।

অমন করে মাথার চুল দুপাশে ফাঁপিয়ে খোঁপা বেঁধে ফুল গুঁজতে একজনকেই শুধু দেখেছি। এ নিশ্চয় সেই ঝুনু। পাশের ছেলেটি মাথা সরিয়ে আবার সোজা হয়ে বসতেই ঝুনু মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে হাসিমুখে তাকাল। ততক্ষণ অন্ধকারে আমার চোখ দুটি বেড়ালের মত খুলে গেছে। এবার চিনতে আর কোনো অসুবিধে হল না। সত্যি সেই ঝুনু। অন্ধকারের মধ্যেও হাসিটি তেমনি মিষ্টি লাগছে। মুখখানা সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঝুনুদের বাড়ির সব্বাইকেই আমি চিনি। ওর বন্ধুদেরও অনেকবার

দেখেছি। কিন্তু এই ছেলেটিকে কখনও তো দেখিনি! দুজনে পাশাপাশি ঘেঁষে বসেছে। হেসে হেসে একজন আর একজনের গায়ে যেন ঢলে পড়ছে।

হঠাৎ মনে হল আমি না হয় ওদের দেখেছি কিন্তু ওরাও যদি আমায় দেখে ফেলে তাহলে ওরা ভারি লজ্জা পাবে। আজকের এই শো-টাই ওদের মাটি হবে। ইনটারভ্যালের আগেই তাই চট্‌পট উঠে পড়লাম। লাইট হাউসের সামনে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরালাম। ইনটারভ্যালের শেষে ঘর অন্ধকার হলে চুপি-চুপি গিয়ে আবার ওদের পেছনে নিজের সিটে বসে পড়লাম।

আসবার সময় এবার দেখলাম ঝুনুর হাতখানা ছেলেটির কোলে। দুহাত দিয়ে চেপে ধরে হেসে হেসে ছেলেটি কি যেন বলছে। আর ঝুনু ওর ঘাড়ের কাছে মুখ এনে মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

শো আরম্ভ হয়ে গেল। ঝুনু ছেলেটির কাঁধে মাথা রাখল।

এই ঝুনুকে প্রথম দেখি বছর পাঁচেক আগে। তখন ওর সতের বছর মাত্র বয়েস। ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এসে কলেজে ভরতি হয়েছে। বাবা বিহারের একটা গ্রামে থাকেন, জমিদারি আছে; ব্যবসাও করেন। দুটি মাত্র মেয়ে। দুজনেই কলেজে পড়ে। ঝুনু ফার্স্ট ইয়ার। ওর দিদি থার্ড ইয়ার। যাতে লেখাপড়া ভাল হয় সেইজন্য কলকাতায় একটা বাসা করেছেন। ওদের এক আত্মীয় আমার পুরনো রুগী। তাঁর মাধ্যমেই এদের সঙ্গে পরিচয় হল।

একদিন ওর দিদি এসে আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। ঝুনুর অসুখ। গিয়ে দেখি একতলার দুখানা ঘর নিয়ে একটা ফ্ল্যাটে এরা দু-বোনে থাকে। অভিভাবক কেউ নেই। শুধু বুড়ী এক ঝিয়ের ওপর ভরসা করে বাপ মা কি করে এত বড় দুটি মেয়ে একলা ছেড়ে দিয়েছেন ভেবে ভারি আশ্চর্য বোধ হল।

এত বেশী আশ্চর্য বোধ হল যে কথাটা চেপে রাখা গেল না। বলে ফেললাম—বাড়িতে দেখছি বড় কেউ নেই। আপনারা দুজনেই তো কলেজে পড়েন। হোস্টেলে কি সিট পাওয়া গেল না?

ঝুনুর দিদি বলল—আমি তো বরাবরই হস্টেলে থেকেছি। আই-এ পাসও করেছি হস্টেলে থেকে। এই ঝুনুর জন্যই এতদিন পরে এবার বাসা করতে হল।

এই বলে কী এক অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ঝুনুর দিকে তাকালো। ঝুনু দেখলাম যেন লজ্জা পেল। লাজ-মাখা হাসি হেসে চোখ নিচু করল।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না। কেমন যেন ধোঁকা লাগল।

আর কথা না বাড়িয়ে ঝুনুকে দেখলাম। সামান্য হজমের গোলমাল। একটা কারমিনেটিভ মিকশ্চার লিখে চলে এলাম।

সেই থেকে প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতে হত। একটু কিছু হলেই ডাক পড়ত। ক্রমে ওদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। ওদের 'তুমি' বলে ডাকতে শুরু করলাম।

একদিন ঝুনু বলল—আমার তলপেটটা কেমন যেন বড় বড় মনে হচ্ছে। দেখুন তো কি হয়েছে?

পরীক্ষা করে কোনো দোষ পেলাম না। বললাম—পেট তো দেখছি ঠিকই আছে কিন্তু মাথার ভেতর বোধ হয় কিছু ঘটেছে।

ঝুনু অপ্রস্তুত হল না। হেসে বলল—ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ভাল করে দেখুন। ইউরিন স্টুল রক্ত সব পরীক্ষা করুন। তারপর বলুন কি হয়েছে।

বললাম—বেশ তাই হবে।

ওদের বাবার টাকা ওরা খরচা করবে। আমার তাতে কি? সব পরীক্ষা করানো হল, কোনো দোষ পাওয়া গেল না। তবু একটা ভিটামিন টনিক লিখে দিয়ে বললাম—এইটে মাসখানেক খেয়ে দেখ সব ঠিক হয়ে যাবে।

তখন সেপ্টেম্বর মাস। সামনেই পুজোর ছুটি।

ছুটিতে দেড় মাস বাপ মার কাছে কাটিয়ে এসে ঝুনু বলল—আপনার অষুধ এক মাসের জায়গায় দুমাস খেলাম। তবু কিছু ফল হল না। তলপেটটা দেখুন আরও ফুলেছে।

পরীক্ষা করে তলপেটটা একটু শক্ত লাগল। মনে হল বোধ হয় ও ইচ্ছে করেই মাংসপেশী সব শক্ত করে রেখেছে। সত্যি কিছু ফুলেছে বলে মনে হল না।

তখন রাত প্রায় ৯টা। শীতের রাত। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা শোবার উদ্যোগ করছে। এমনি সময় আমি গিয়ে পড়েছি।

দেখলাম ওর বিছানার ওপর বড় একটা রবার ক্লথ পাতা। তার ওপর চাদর। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা আবার কি?

ঝুনু লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করে মুচকি হাসতে লাগল।

ওর দিদি বলল—এতদিনে আপনার কাছে ও ধরা পড়ে গেল। ওর আসল রোগ রাতে বিছানা ভেজানো। ছেলেবেলা থেকে এটা ওর আর গেল না। তাই কারু বাড়ি রাতে ও থাকতে পারে না। হস্টেলেও তাই

ওকে রাখা যায় না। এইজন্যই এত খরচ করে এই বাসাটা করতে হয়েছে।

শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। ঝুনুর রোগটি যে আসলে মনের তাতে আর কোনো সন্দেহই রইল না। ওর বাবা মা-ই বা কেমন? অমন সুন্দর মেয়েটার এই রোগ এতদিন পুষে রেখেছেন? হস্টেলে না রেখে আলাদা বাসা করে টাকা খরচ করছেন অথচ কোনো মনের রোগের বিশেষজ্ঞ দিয়ে চিকিৎসা করাননি। ভারি অদ্ভুত মনে হল।

জিজ্ঞাসা করলাম—এতদিন কোনো চিকিৎসা হয়নি?

ওর দিদি বলল—বাবা অনেকবার কলকাতায় এসে বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন। সবাই বলেছেন বড় হলে সেরে যাবে। কিন্তু সারল কই?

বুঝলাম বড় বড় অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এসব সারাতে পারেন সেই মনোবিদ কাউকেই দেখানো হয়নি।

বললাম—এই সব রোগ আজকাল বিশেষজ্ঞরা রুগীর সঙ্গে শুধু কথা বলেই সারিয়ে দেন। আমার মনে হয় এঁদের কাউকে এক্ষুনি দেখানো উচিত।

ঝুনুর দিদি বলল—বেশ তাই করুন। কবে দেখাবেন?

বললাম—দেরি করে আর লাভ কি? কালই দেখানো যাক।

পরদিন বিকেলে ওকে একজন বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি সব শুনে একলা ঘরে আধ ঘণ্টা ধরে ওকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদিন পর আবার যেতে বললেন।

আমাকে গোপনে ডেকে বললেন—কেস্‌টা খুব জটিল কিছু নয়। কয়েকটা সিটিং নিলেই সেরে যাবে।

রাস্তায় এসে ঝুনু বলল—আপনার এই ডাক্তার কিচ্ছু জানে না। বলে রাতে বিছানা ভেজাতে আমার নাকি ভাল লাগে। তা কি কখনও সম্ভব? এই শীতের রাতে ভেজা বিছানায় শুয়ে থাকতে কার ভাল লাগে বলুন দেখি?

মনঃসমীক্ষণের এইটেই যে গোড়ার কথা তা ওকে কি করে বোঝাই? রোজকার জীবনে যা আমরা চাই অথচ পাই না স্বপ্নে তাই যে পেয়েছি দেখি।

জিজ্ঞাসা করলাম—এতক্ষণ ধরে আর কি কথা হল?

ঝুনু বলল—ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল আমি স্বপ্ন দেখি কি না। যখন বললাম 'খুব দেখি' তখন কাল কি দেখেছি জানতে চাইল। বলে দিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি বললে?

ঝুনু বলল—কাল দেখেছি আমি যেন একজন অপ্সরা। ব্যালে নাচে যে রকম সাদা টাইট পোশাক পরে তেমনি আমার পোশাক। দুই বাহু যেন দুটি ডানা। মেঘের কোল থেকে ডানা মেলে উড়ে এসে পাহাড়ের এক চুড়ায় বসে পা ঝুলিয়ে দিলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরঝর করে ঝরনা নাবছে। ঝরনার জল নদী হয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। পা দিয়ে ঝরনার সেই জল আমি ছিটিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ ঝড় এল। ঝরনার জলের সঙ্গে আমিও নদীতে এসে পড়লাম। নদীর জলে ডুব দিয়ে ওপারে উঠে দেখি ঘন বন। আমি একটা বড় গাছের নীচে বসে আছি। সামনে দেখি তীর ধনুক হাতে করে এক ছোকরা শিকারী। অমনি ঘুম ভেঙে গেল।

বললাম—তাহলে আর ভাবনা নেই। তোমার এ রোগ আমি সারিয়ে দেব।

মুচকি হেসে ঝুনু বলল—কি করে?

হেসে বললাম—প্রহার দিয়ে।

খিলখিল করে হেসে ঝুনু বলল—সত্যি যদি সেরে যায় আমি খুব রাজী।

পরদিন বিশেষজ্ঞ বললেন—ও যে রকম স্বপ্ন দেখে আর ছেলেবেলা থেকে যা অভ্যাস হয়ে গেছে; তাতে মনে হয় ২০।২৫টা সিটিং-এর কমে এটা যাবে না।

বললাম—তা লাগুক। কিন্তু সারবে তো?

বিশেষজ্ঞ বললেন—সারবে বলেই তো মনে হচ্ছে।

ঝুনু কিন্তু খুশী হল না। বলল—আমার পেট ফোলা তো যাচ্ছেই না, ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছে, এ চিকিৎসায় আমার কোনো ফল হচ্ছে না। এখানে আর আসব না।

মনঃসমীক্ষণ শুরু হলে রুগীরা প্রথমে এ রকমই বলে। সমীক্ষকের ওপর বীতরাগ হয়। তাই ওর কথায় কোনো কান দিলাম না।

সপ্তাহে তিন দিন করে মনঃসমীক্ষা চলতে লাগল।

দিন দশেক পর একদিন ঝুনু বলল—আপনারা কেউ আমার পেটটা দেখছেন না। দেখুন দেখি এত বড় পেট কখনও আমার ছিল কি? এইবার দেখলাম সত্যি পেটটা অনেক বড় দেখাচ্ছে। বেশ ভাবনা হল। মনোবিদের কাছে ওকে নিয়ে পেটটা দেখিয়ে বললাম, এটা তো আর এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সত্যি অনেক বড় হয়েছে। ভেতরে নিশ্চয় কিছু আছে। পেটটা

বাজিয়ে মনে হচ্ছে যেন জল আর গ্যাস এই দুটো মিলে এতটা ফেঁপে উঠেছে।

পরামর্শ করে ঠিক হল একটা ক্যাথিটর দিয়ে প্রথমে ইউরিনটা বার করে দেখা হবে। তারপর ফ্লেটাশ টিউব ঢুকিয়ে গ্যাসটা বার করা যাবে। ক্যাথিটর দিয়ে সামান্য একটু ইউরিন বেরুল এবং ফ্লেটাশ টিউব দিয়ে একটুখানি মাত্র গ্যাস। পেট ফোলা তাতে কিছু কমল না।

এইবার আমি ঘাবড়ে গেলাম। পেটের ভেতরে তাহলে জল নাকি? মনোবিদ বললেন, প্রেগ্‌নান্‌সী হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। একজন গাইনোকোলজিস্ট দেখিয়ে রাখা ভাল।

সন্তান সম্ভাবনা হয়ে পেট এঁত বড় হলে হাতে কিছু পাওয়া যাবে না তা হতেই পারে না। পেট টিপে টিউমারও কোথাও মনে হয় না। তাহলে? এত জলই বা হবে কি করে?

হাসপাতালে পেটে জল হয়ে এতখানি ফুলতে আগে যা দেখেছি তার সবই প্রায় লিভারের অসুখ হয়ে। সিরোসিস হয়ে। অথচ ওর লিভারে কোনো দোষ পাওয়া যাচ্ছে না। পেট টিপে বাজিয়ে জল আর গ্যাস ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কেন এত জল?

যখনি কোনো বিপদে পড়ি তখনি আমার গৃহচিকিৎসক সেই বন্ধুটির কাছে যাই। এবারও তাঁর শরণাপন্ন হলাম। তিনিও দেখে বললেন, পেটে জলই হয়েছে। কিন্তু কেন?

বন্ধু বললেন—টিউবারকুলোসিস কিনা দেখুন। একটা এক্‌স্‌রে করান।

এই কথাটা আগে মনে হয়নি। জ্বর নেই, পেট খারাপ নয় অথচ টিউবারকুলোসিস হয়ে পেটে এত জল হয় আগে কখনও দেখিনি।

এক্‌স্‌রে করানো হল। বুকে পুরনো টি বি-র চিহ্ন পাওয়া গেল। পেটে যে সত্যি জল তাও দেখা গেল।

মেডিক্যাল কলেজের এক প্রফেসর অব মেডিসিনকে এনে দেখালাম। তিনি সব পরীক্ষা করে বললেন, এটা টিউবারকুলার পেরিটোনাইটিস। পেটের ভেতরে অন্ত্রের ওপরে যে পর্দা থাকে তার টি বি।

শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। প্রফেসর বললেন—যুদ্ধের পর টি বি-তে এরকম পেট হামেশাই ফুলছে। চিকিৎসায় আবার সেরেও যাচ্ছে। হাসপাতালে হরদম এই কেস্‌ আসছে।

চিকিৎসার ব্যবস্থা হল স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন; পি এ এস আর পেটের জল

কমাবার জন্য নেপটাল।

ঝুনুকে একদম শুইয়ে রাখা হল। বাড়িতে বড় কেউ নেই। এত বড় কঠিন রোগ। এর দায়িত্ব কে নেবে?

ওর বাবা-মাকে টেলিগ্রাম করতে বললাম।

ঝুনুর দিদি বলল—আপনি কিছু ভাববেন না। কী দরকার বলুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। বাবা-মা যতদিন না আসেন আমি নিজেই সব দায়িত্ব নেব। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হতে দেব না।

উনিশ বছরের মেয়ে একটুও ঘাবড়াল না দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। এতদিন ঝুনুর জ্বর হয়নি। এইবার হল। প্রথম দিন ১০১। পরদিন ১০৩। পেটের মাপ দেখলাম ৩৬"।

রোজ দুবেলা করে যাই। ইন্‌জেক্‌শন দেই। ঝুনুকে খুব সাহস দিয়ে আসি। কিন্তু নিজের মনে ভরসা পাই না। আগে এ রোগ হলে বাঁচবার কোনো আশাই থাকত না। এখন অষুধ বেরিয়েছে তাই যা একটু আশা। কিন্তু অষুধে যদি না ধরে?

নিজে ভরসা পাই না, তাই বন্ধুর কাছে ছুটে যাই। ঝুনুর অবস্থা সব বলি। বন্ধু ভরসা দেন। আবার হাসিমুখে ঝুনুর কাছে যাই। ওকে সাহস দিয়ে আসি।

প্রফেসর আর বন্ধুর পরামর্শমত পরপর দুদিন নেপ্‌টাল ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে পেটের ফোলা তিন ইঞ্চি কমে গেল। ঝুনুরা খুব খুশী। ভাবল এইবার বোধ হয় সেরে যাবে।

ঝুনু বলল—কতদিন আর ফুঁড়বেন?

বললাম—তিন মাস তো চলুক। তারপর দেখা যাবে।

চোখ দুটো কপালে তুলে ঝুনু বলল—তিন মাস?

রোজ যখন ইন্‌জেক্‌শন দিতাম, ঝুনু একবার করে জিজ্ঞাসা করত—লাগবে না তো? সত্যি বলছেন?

ইন্‌জেক্‌শন হয়ে গেলে বলত—নাঃ একটুও লাগেনি। আপনার হাতখানা ভারি পাকা।

পরদিন আবার বলত—লাগবে না তো?

দিন পনের ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর জ্বর ক্রমশ কমে আসতে লাগল। পেটের ফোলাটাও একটু একটু করে কমতে লাগল। ওর মা এসে পড়লেন। এক মাস পরে জ্বর ছেড়ে গেল। পেটের মাপও ২৭" হল।

এই অসুখে ভুগে ঝুনুর আগের সেই অসুখটা সেরে গেল। মাস

দুই পরে বিছানায় রবার ক্লথের আর দরকার থাকল না।

ইন্‌জেক্‌শন কমিয়ে একদিন পরপর দিতে লাগলাম। তিন মাস পূর্ণ হলে ঝুনু বলল—এইবার ফোঁড়াফুঁড়ি বন্ধ হবে তো?

বললাম—আরও এক মাস তো চলুক।

এমনি করে দশ মাসে নব্বুই গ্রাম স্ট্রেপ্টোমাইসিন দিয়ে ইন্‌জেক্‌শন বন্ধ করে দিলাম। তারপর থেকে ও ভালই আছে। আর পেট ফোলেনি।

এক বছর কলেজ কামাই করে আবার ভরতি হয়েছে। এবার বি এ পাশ করেছে। এখনও প্রতি মাসেই ও একবার করে আসে। মাস তিনেক আগেও একবার এসেছিল। সেদিন ওকে বলেছিলাম—এইবার তুমি বিয়ে করতে পার।

তিন মাস পর আবার এই সিনেমায় বসে পেছন থেকে ওকে দেখছি। ডাক্তারের উপদেশ কখনও ঝুনু অমান্য করেনি। আজও দেখলাম সেই উপদেশ মানবারই প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। যে রেটে ও এগুচ্ছে মনে হচ্ছে আজকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে বুঝি।

ছেলেটির চেহারা আর পোশাক যতটুকু দেখেছি তাতে শিকারটি তো বেশ ভাল বলেই মনে হচ্ছে। খাসা ঝুনুর টিপ্‌। কেমন কাত হয়ে ঝুনুর দিকে এলিয়ে পড়েছে।

কিন্তু বাঙালী ঘরের অমন ছেলে শেষ পর্যন্ত টিঁকবে কি? অসুখের কথা টের পেয়েও কি অমন করে বোকার মত ঝুলে থাকবে? প্রাণভয়ে বঁড়শী ছিঁড়ে দৌড়ে পালাবে না?

॥ ১৭ ॥

বাসন্তীর সঙ্গে বিশ বছর পরে এক মুমূর্ষু রুগীর পাশে হট-ওয়াটার ব্যাগ হাতে দেখা হবে কোনোদিন ভাবি নি। তাই রুগীর ঘরে ঢুকে ওকে দেখেও চিনতে পারলাম না।

বড়লোক রুগী। বয়েস হয়েছে। এ যাত্রায় টিকবেন বলে কারু ভরসা নেই। তবু ঘটা করে চিকিৎসা হচ্ছে। বড় বড় ডাক্তার দিনের বেলা ৩।৪ বার করে এসে দেখে যাচ্ছেন। দিনে রাতে পালা করে দুজন নার্স ডিউটি দিচ্ছে। রাত ৯টা থেকে বাসন্তীর ডিউটি পড়েছে।

রুগীর জ্ঞান নেই। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। নাড়ী দেখে ব্লাড-প্রেসার দেখবার যন্ত্রটি বার করলাম। বাসন্তী রুগীর পায়ে হট-ওয়াটার ব্যাগ রেখে এগিয়ে এল। টেবিল-ল্যাম্প জেবলে রুগীর হাতখানা কম্বলের নীচে থেকে বার করে ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রটি ধরে রাখল। পরীক্ষা হলে রুগীর হাতখানা আবার কম্বলের নীচে গুঁজে টেবিল থেকে খাতা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—কি লিখব?

এইবার ওকে ভাল করে দেখলাম। বেঁটে-খাট মোটাসোটা। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। মুখখানা বেশ লাবণ্যমাখা। চোখে কৌতুকের হাসি।

লেখা হয়ে গেলে হেসে কাছে এসে বলল—আমাকে চিনতে পারেন নি তো?

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্বীকার করতে হল, ওকে চেনা তো দূরের কথা জীবনে কখনও ওকে দেখিনি। একটু ইতস্তত করে আন্দাজে বললাম—ঠিক মনে পড়ছে না। কত আগে দেখেছি।

বাসন্তী বুঝল আমি ভেবে ভেবে কূল কিনারা কিছুই পাচ্ছি না; শুধুই হাবু-ডুবু খাচ্ছি। তাই আর ধোঁকায় না রেখে সোজা করে বলল—তা অনেক দিন হল বইকি। আসামের বিনোদকে মনে পড়ে? আমি তার ছোট বোন বাসন্তী। আপনাদের মেসের গলির একটা বাসায় কিছুদিন ছিলাম। সেই বারই আপনি ডাক্তারীতে ঢুকলেন।

ব্যস্। আর বলতে হল না। বিশ বছর আগেকার ঘটনা চট্ করে মনে পড়ে গেল। তখন আমি মেডিক্যাল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।

ওর দাদা বিনোদের সঙ্গে আগে একসঙ্গে পড়েছি। একই হোস্টেলে দু-বছর কাটিয়েছি। খুব বন্ধুত্ব ছিল। অনেক দিন চিঠি লেখালেখিও চলেছে। ওদের বাড়িতে আমাকে একবার নিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছে বিনোদ অনেকবার কিন্তু আমার নিজের দোষেই যাওয়া হয় নি। যাচ্ছি যাব বলেও শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া ঘটে নি।

সেই সময় একদিন বিনোদের একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে ওর ছোট বোন বাসন্তী আর তার স্বামীকে নিয়ে ও কলকাতায় আসবে। বাসন্তীর স্বামী ঘোড়া থেকে পড়ে হাত ভেঙেছে মাসখানেক হল। এখানে এসে এক্স্রে করিয়ে যদি কোনো ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা করবে। আমি যেন একটা বাসা ঠিক করে রাখি।

তখনকার দিনে বাসা পাওয়া খুব সহজ ছিল। আমাদের মেসের কাছেই দুখানা ঘরওয়ালা একটা বাসা পাওয়া গেল। একদিন ভোরবেলা দাদা আর স্বামীর সঙ্গে বাসন্তী শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নামল। সেই ওকে প্রথম দেখলাম। বেঁটে-খাট রোগা পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি, বছর ষোল বয়েস। মুখখানা আর চোখ দুটি ভারি মিষ্টি। এই প্রথম কলকাতায় এল। কিন্তু খুব চটপটে। নতুন জায়গায় এসে নিমেষের মধ্যে সব গুছিয়ে নিল।

ওর স্বামী খুব শৌখিন লোক। পয়সাকড়ি আছে। রোজ ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস। শখ করে নতুন একটা ঘোড়া কিনে সওয়ার হতে গিয়ে ছিটকে পড়ে ডান কাঁধে লাগে। দিন দশ পনের পরে ব্যথাটা কমে আসে কিন্তু হাতটা বেশি দূর তুলতে পারেন না। হাতের কাজে কোনো কষ্ট হয় না। লিখতে, ধরতে, হাত ঝুলিয়ে চলতে কোনো কষ্ট নেই। জোরও বেশ আছে। ডাম্বেল চাপতে পারেন কিন্তু হাত মাথায় তুলতে পারেন না। কাঁধ বরাবর উঠেই আটকে যায়। আরও তুলতে গেলে বগলে লাগে। মুগুর ঘোরাতে পারেন না সেইটেই ওঁর আপসোস।

বললেন—আমরা মফস্বলে থাকি। তাও আবার আসামের জংগলে। ধারে কাছে ভাল ডাক্তার নেই। এখানে যাতে এটা সারানো যায় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

বললাম—এক্স্রে তো করানো যাক। তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।

তখনকার দিনে এক্স্রে করা এত সহজ ছিল না। এত বেশি যন্ত্র ছিল না। সামান্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁদেরই একজনের কাছে

এ'কে নিয়ে গেলাম।

ছবি তুলে দেখা গেল ডান বাহুর হাড়টি ফেটে মাথা থেকে ইঞ্চি তিনেক নীচে পর্যন্ত হাড়ের একটি চাক্‌লা নিয়ে ঝুলে আছে। খানিকটা জয়েন্‌টের মধ্যে, কিছুটা বাইরে। নীচের দিকে নতুন হাড় জমে ওটাকে আটকে রেখেছে। এমনভাবে ভেঙেছে যে অজ্ঞান করেও ওটা ঠেলে ঠুলে আর আগেকার জায়গায় নিয়ে আসা যাবে না।

হাড় ভাঙলে প্লাস্টার করার চিকিৎসা তখনও এখানে চল হয় নি। কাঠের স্পিল্‌ন্‌ট্‌ আর ব্যান্ডেজ বেঁধেই চিকিৎসা হত।

রেডিওলজিস্ট বললেন—ছবিটা সার্জনদের দেখাও। চিকিৎসা বিশেষ কিছু যে হবে তা মনে হয় না।

আমাদের মেসের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট তখন হাসপাতালের প্রথম সার্জনের সিনিয়র হাউস সার্জন। এই প্রথম সার্জন তখন কলকাতার সেরা সার্জন।

অস্ত্রবিদ্যায় এ'র সমকক্ষ কেউ তখনও হন নি। তাঁর সিনিয়র হাউস-সার্জন ছবিটি দেখে বললেন, এরকম ভাঙা হাড় হাসপাতালে চিকিৎসা হতে তিনি দেখেন নি। অপারেশন করে ঐ ভাঙা হাড়টা বার করে দেওয়া যায় বটে কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? জয়েন্ট কেটে হাড়ের টুকরো বার করা কি সোজা কথা? অপারেশনের রিস্ক তো আছেই তার পরেও যে হাত মাথায় তোলা যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যতখানি নাড়াচাড়া এখন সম্ভব হচ্ছে অপারেশনের পরেও তার থেকে বেশি কিছু সুবিধে হবে কিনা সন্দেহ। জয়েন্টের অপারেশন এখানে হয় না।

সব শুনে বিনোদ খুব দমে গেল। বলল—তাহলে অপারেশন থাক। সার্জনকে একবার দেখিয়ে বাড়ি ফিরে যাই।

ভগ্নীপতিটি কিন্তু একটুও দমলেন না।

বললেন—কলকাতায় চিকিৎসা হয় না তা হতেই পারে না। এরা সব ছেলে-ছোকরা। সদ্য সদ্য পাশ করেছে তাই ভয় পায়। বড় সার্জন দেখুক। নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা হবে।

বড় সর্জন দেখলেন। আগে রুগীকে, তারপর এক্‌স্‌রে প্লেট। মুখের ভাব কিছুমাত্র পরিবর্তন হল না। ছবিটি দেখে আবার রুগীর হাত নাড়িয়ে জয়েন্ট টিপে পরীক্ষা করলেন।

গম্ভীর মুখে বললেন—অপারেশন করা যাবে। ভাঙা হাড়টা বার করে ফেলতে হবে। এ ছাড়া আর চিকিৎসা নেই।

শুনে ভদ্রলোক খুব খুশী।

বাইরে এসে বললেন—দেখলেন. বড় সার্জনের কথাই আলাদা। এতটুকু ভয়-ডর নেই। নিজের উপর কী অপরিসীম বিশ্বাস। আমি অপারেশনই করাব।

বিনোদ কিন্তু ভরসা পেল না। আমিও অনেক করে বোঝালাম; কিন্তু ভদ্রলোকের সেই এক কথা। হাতটা এই রকম জখম রেখে ওঁর চলবে না। অপারেশন ছাড়া যখন আর চিকিৎসা নেই তখন তা করাতে হবে বইকি।

বাসন্তীও অনেক চেষ্টা করল কিন্তু ওর স্বামী কোনো বাধা মানলেন না। কারু কথা শুনলেন না।

কাজেই একদিন আমাদের হাঁসপাতালে ওঁকে ভরতি করে দিলাম। ভদ্রলোক সবচেয়ে ভাল কেবিনটা পছন্দ করলেন। বিনোদ বাসন্তীকে নিয়ে আমাদের মেসের কাছে ঐ বাসাটায় থেকে গেল। তখন রোজ ওদের বাড়ি যেতাম। সন্ধ্যার পর হাসপাতাল থেকে ওরা ফিরলে বিনোদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে মেসে ফিরতাম। বাসন্তী রোজই চায়ের সঙ্গে কিছু একটা খাবার নিজের হাতে তৈরি করে খাওয়াত। বলত ওর স্বামী ভাল হয়ে বাড়ি ফিরলে একদিন ভাল করে ভোজের ব্যবস্থা করবে।

হাসপাতালে ভরতি হবার পর ওর স্বামী কয়েকদিন বেশ ফুর্তিতে কাটালেন। তারপর ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ভেবেছিলেন ভরতি হলেই বুঝি অপারেশন হয়ে যাবে; কিন্তু দেখলেন শুধুই দেরি হচ্ছে। ও'র পরে যারা ভরতি হয়েছে তাদেরটা আগে হয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমার তখন মাত্র ফার্স্ট ইয়ার। হাসপাতালে কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় নি। শুধু আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেই সিনিয়র হাউস-সার্জনকেই চিনি। তাঁকে গিয়ে ধরলাম। বললাম—রুগী তো বিরক্ত হয়ে উঠছে। এত দেরি হচ্ছে কেন? কবে অপারেশন হবে?

তিনি বললেন—সাহেব কেন যে দেরি করছেন তা ভাই বলতে পারব না। যখনি এ কেসটার কথা বলি তখনি বলেন, এখন থাক পরে হবে।

বাসন্তীর স্বামীকে সে কথা বলতে ভদ্রলোক বললেন—হাউস-স্টাফরা যখন কেউ কিছু বলতে পারে না, তখন সাহেব যখন রাউন্ড দিতে আসবে আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করব।

রুগীদের বড় সাহেবকে এসব প্রশ্ন করা তখনকার দিনে চলত না। তাই বারণ করলাম। বললাম—সাহেব অসন্তুষ্ট হবেন। তাতে আপনার ক্ষতি

ছাড়া লাভ কিছু হবে না।

কিন্তু ভদ্রলোক কোনো মানা শুনলেন না। পরদিন রাউণ্ডের সময় সাহেবকে হাত-জোড় করে কথাটা বলে ফেললেন।

তাতেই কিন্তু কাজ হল। প্রায় মাসখানেক খামোখা হাসপাতালে বসে থেকে এইবার অপারেশনের দিন ঠিক হল।

সুপারিনটেনডেণ্ট মেসে ফিরে সেদিন খুব মজা করে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে বললেন—এইবার সাহেব দিন ঠিক করতে বলেছে। ৩।৪ দিনের মধ্যেই এটা হয়ে যাবে। তোমার রুগীর সাহস আছে মানতে হবে। কেমন তাক্ মাফিক কথাটি সাহেবের কাছে পেড়ে ফেললে।

তারপর একদিন সত্যিই অপারেশন হয়ে গেল। শুনলাম খুব ভাল অপারেশন হয়েছে। ভাঙা হাড়ের টুকরাটি বার করে দেওয়া হয়েছে।

কলেজ থেকে ফেরবার আগে রোজ একবার করে ভদ্রলোকের কেবিনে গিয়ে দেখে আসতাম। বাসন্তী দিনর বেলাটা ওখানেই থাকত। সন্ধ্যার পর ভিজিটিং-আওয়ার শেষ হলে বিনোদের সঙ্গে বাড়ি ফিরত।

অপারেশনের পর খারাপ কিছু হল না। ভদ্রলোক ক্রমশ সেরে উঠতে লাগলেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—সেলাই কাটবে কবে?

বললাম—সাতদিন যাক। তারপর খোঁজ নেব। মেসের সুপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে রোজই দেখা হয়। রোজই বলতেন রুগী ভাল আছে। শিগ্গিরই সেরে উঠবে।

সাতদিন পর যেদিন সেলাই কাটবার কথা সেদিন দুপুরে হাসপাতাল থেকে ফিরেই সুপারিনটেনডেণ্ট সোজা আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন।

বললেন—সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। তোমার সেই রুগীর টিটেনাস্ হয়েছে। আজ সেলাই কাটতে গিয়ে দেখি রুগী চোয়াল নাড়তে পাচ্ছে না। তাই কথাও ভাল করে বলতে পাচ্ছে না। শুনলাম সকাল থেকেই ঘাড়ে ব্যথা। তুলে দেখলাম ঘাড় শক্ত। তক্ষুনি এ টি এস ইন্জেক্শন দিলাম ইনট্রাভেনাস।

শুনে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভয়ে আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেল।

কোনও রকমে বললাম—কি সর্বনাশ! কেমন করে হল?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন—সব ভাই কপাল। নইলে একই দিনে আরও পাঁচটি অপারেশন হয়েছে, তাদের তো কিছু হয় নি? একটা সেপটিকও হয়েছে, তবু তো এ রোগ হয়নি? এখন গজ তুলো সব

কালচারে পাঠানো হবে। দেখা হবে কোনটায় টিটেনাসের বীজাণু আছে। এক মাসের মধ্যে আর হাসপাতালে অপারেশন হবে না। যাদের ভরতি করা হয়েছিল সব ছুটি দেওয়া হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু এই রোগী বাঁচবে কি?

সুপারিনটেনডেন্ট বললেন—ওকে নিয়েই তো সকাল থেকে সবাই মত্ত। সিরাম, মরফিন, অক্সিজেন সব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না। ওর স্ত্রী আর তার ভাই ওখানেই আছেন। এই বেলাটা কাটবে কিনা সন্দেহ।

জামা গায় দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। হাসপাতালে যেতেই শুনলাম ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে। কেবিনে ঢুকে দেখি বাসন্তী ওর স্বামীর বুকের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পরদিন বিনোদ বাসন্তীকে নিয়ে দেশে চলে গেল। যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল—যতদিন বাঁচব এই মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখব। ওর কোনো অভাব আমি রাখব না। বাবার যা কিছু আছে দু ভাই বোনে সমান ভাগ করে নেব। ওকে সাদা থান পরতে আমি দেব না।

তারপর আর বাসন্তীকে আমি দেখিনি। আজ এই রাত্রে রুগীর বাড়িতে ডিউটি দিতে এসে ওকে দেখলাম।

বাসন্তী বলল—পাশের ঘরে আপনার বিছানা পাতা আছে। চলুন দেখিয়ে দিই। ডাক্তারদের বেশ মজা। মশারীর ভিতর ঢুকে আরাম করে শুয়ে দিব্বি নাক ডাকাবেন। আর রুগীর পাশে সারারাত জেগে বসে মশার কামড় খাব আমি।

মুখে ও যাই বলুক. দেখলাম ও বেশ ভাল আছে। কাজ করে আনন্দ পাচ্ছে। দেহে মনে খুশী যেন উপছে পড়ছে। চোখে-মুখে সর্ব অঙ্গে পরিতৃপ্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—নার্সদের থাকা নিয়ে আজকাল আর কোনো অসুবিধে নেই। অনেক নার্সিং ইউনিয়ন হয়েছে। কোনটায় তুমি আছ?

মুখ টিপে হেসে বাসন্তী বলল—ইউনিয়নে থাকতে যাব কোন দুঃখে? ঘর সংসার আছে না? কর্তা এখন আর এ সব কাজে আসতে দিতে চান না। আমি বলি—ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে এখনই তো সুবিধে! একদিন আসুন না আমার বাড়িতে?

মনে পড়ল বিনোদের সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার দেখা হয়েছিল। নিজের ছেলেমেয়ের কথা বলেই উঠে যাচ্ছিল। আমিই বাসন্তীর কথা

তুললাম।

অপ্রসন্ন মুখে বিনোদ বলল—ওর কথা আর বোল না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের ছেড়ে ও চলে গেছে। এই কলকাতাতেই কোন গলি-টলিতে আছে। একেবার গোল্লায় গেছে। ওর নাম শুনলেও গা ঘিনঘিন করে।

॥ ১৮ ॥

বর্ষাকালটা আমার ঠিক সহ্য হয় না। বর্ষাতি গায় দিয়ে ব্যাগ হাতে ট্রামে-বাসে ঘুরে ডাক্তারি করা যে কি ঝকমারি, যারা করে, তারাই শুধু জানে। তার ওপর বাড়ি ফিরেও শান্তি নেই। ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ে। অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হলেই ছাদে জল জমে। চুইয়ে চুইয়ে সেই জল ঘরে পড়ে। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেলেও ঘরে জল পড়া বন্ধ হয় না।

ছাদ সারানো নিয়ে কাজে কাজেই বর্ষার অনেক আগে থেকেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। তাগাদা দেই। ভদ্রলোক সবিনয়ে বলেন—মিস্ত্রিকে খবর দিচ্ছি। দু-এক দিনের মধ্যেই ছাদে পিচ ঢেলে ফুটো বন্ধ করে দিয়ে যাবে।

এমনি করেই বর্ষা নামে। মিস্ত্রি কিন্তু আর আসে না। একদিন বাড়িয়ালার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে যায়। তারপর আরও কয়েকদিন ভুগিয়ে ভদ্রলোক অবশেষে একদিন মিস্ত্রি ডাকেন। পিচ ঢালা হয়। কিছুদিন জল পড়া বন্ধ থাকে। আবার হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, নতুন এক ফুটো দিয়ে টুপটাপ করে ঘরে জল পড়ছে। এমনিই চলে চারটি মাস; বর্ষা যতদিন থাকে। এই চলে আসছে আজ দশ বছর; যতদিন এ-বাড়িটায় আছি।

তাই বর্ষার শেষে যখন শরৎ আসে, মনটা খুশী হয়ে ওঠে। জলের জন্য ঘরের বিছানাপত্র, চেয়ার-টেবিল আর এধার-ওধার সরাতে হবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

সেবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর শরৎকালেও একদিন রাত্রে এমন বৃষ্টি হল, যা সারা বর্ষাতেও আগে কখনও হয়নি। রাস্তায় জল জমে গেল। আমার ঘর ভেসে গেল।

মনে-মনে বাড়িয়ালার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে বিছানা গুটিয়ে জল পড়ে না এমন একটি কোণে চেয়ার সরিয়ে আলো জেবলে বই নিয়ে বসলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, কাল ভোরেই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা এস্পার কি ওস্পার করে ফেলব। কালকের মধ্যেই ছাদ যদি না সারায়, বাড়ি ছেড়ে উঠে যাব।

এমনি সময় রাত্রি শেষে দরজার কড়া নড়ে উঠল। দিনরাত রুগী দেখে

সময় পাই না, এমন প্র্যাকটিস আমার কখনও হয়নি। তার ওপর এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে কে আমার কাছে আসবে? হঠাৎ মনে হল, টেলিগ্রাম নয়ত?

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখি, খাকী রংএর উর্দি-পরা একটি লোক। হাতে একখানা চিঠি।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি চাই?

লোকটি বলল—ডাক্তারবাবুকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে। গাড়ি নিয়ে এসেছি। চিঠিতে সব লেখা আছে।

ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ে দেখি, একজন নামকরা বড় ডাক্তার লিখেছেন, এক্ষুনি রুগীর বাড়ি যেতে হবে। আমি গেলে তবে তিনি বাড়ি যাবেন। দাঙ্গার পরে শেষ রাত্রে এই দুর্যোগে অত বড় ডাক্তার যখন রুগীর বাড়ি এসে বসে আছেন বুঝলাম রুগী শুধু অবস্থাপন্নই নন, প্রতিপত্তি-শালীও বটেন।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলম—বড় ডাক্তারবাবু কতক্ষণ এসেছেন?

ড্রাইভার বলল—ঘণ্টাখানেক আগে। এসে সায়েবকে দেখে অক্সিজেন আর কি সব অষুধ আনতে বলবেন। অক্সিজেন নিয়ে আসতেই বললেন, আপনার কাছে আসতে। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।

জিজ্ঞেসা করলাম—কোথায় যেতে হবে?

ড্রাইভার বলল—বালীগঞ্জ।

বললাম—এক্ষুনি যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে, তৈরী হয়ে, ব্যাগে ব্লাডপ্রেসার দেখার যন্ত্রটি আর প্লুকোজ দেওয়ার বড় সিরিঞ্জটি নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

তখনও টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় জল জমে গেছে। তারই ওপর দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলল। দেখলাম, শুধু আমার ঘরটিই নয়, সমস্ত শহরটাই জলে ভেসে গেছে। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। ছক্-ছক্ করে স্টীমারের মত জল কেটে আমাদের গাড়িটাই শুধু ভাসমান রাস্তা দিয়ে চলেছে।

রুগীর বাড়িতে এসে দেখি, মস্ত বড় বাড়ি। মনে হল যেন রাজবাড়ি। চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে গেট। ভেতরে ফুলের বাগান। সব ঘরেই আলো জ্বলছে। আমাদের গাড়ির শব্দ শুনে দারোয়ান ছুটে এসে গেট খুলে দিল। ঢুকতেই দেখলাম বড় ডাক্তারের গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে।

একতলার বসবার ঘর। সেই ঘরেই আমাকে নিয়ে গেল। দেখলাম বড়

ডাক্তার বসে আছেন। আমাকে দেখে খুশী হয়ে বললেন—তোমার জন্যেই বসে আছি। চল, কেস্‌টা বুঝিয়ে দিই।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলাম—কেস্‌টা কি?

বড় ডাক্তার বললেন—ইউরিমিয়া। বড্ড দেরিতে আমাদের ডেকেছে। এখন একজন ডাক্তার সব সময় কাছে থাকা চাই। তাই তোমাকে ডেকেছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—এঁদের গৃহচিকিৎসক কেউ নেই?

বড় ডাক্তার বললেন—তাঁকে ডেকে পাওয়া গেল না। শরীর নাকি ভাল নেই। সন্ধ্যের পরে একবার দেখে গেছেন, আবার কাল সকালে আসবেন বলেছেন। কাজেই তোমাকে ডাকত হল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কাল সকালে তিনি এলে আমার ছুটি তো?

বড় ডাক্তার বললেন—না। তোমাকেই চার্জ নিতে হবে।

বুঝলাম, বড়লোকের বাড়ি, চিকিৎসা বিভ্রাট হয়েছে। গৃহচিকিৎসকের চাকরিটা আজ গেল।

রুগীর ঘরে গিয়ে দেখি, বেশ বড় একটি ঘর। খাটের পাশে গদী আঁটা বড় একটি হাতলঅলা চেয়ারের ওপর তোষক-চাদর বিছিয়ে, শ্লিপিং সুট পরা এক ভদ্রলোক বালিশে হেলান দিয়ে কাত হয়ে পড়ে আছেন। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা। হাত দুটি মুঠো করা; চেয়ারের হাতলে পড়ে আছে। নীচে কার্পেটের ওপর ছোট একটি জলচৌকিতে বালিশের ওপর খোলা পা দুটি ছড়ানো। এত বেশি ফোলা, শুধু চোখে দেখা যায়। মাথার ওপর ইলেকট্রিকের পাখা; এক পয়েন্টে আস্তে আস্তে ঘুরছে। পাশে খাটের ওপর রুগীর মাথার কাছে বসে একটি মহিলা হাতপাখা দিয়ে মাথায় হাওয়া করছেন।

বড় ডাক্তার রুগীর নাড়ি দেখলেন। পাশের ছোট টেবিল থেকে একখানা খাতা টেনে নিয়ে দেখালেন, কি কি করা দরকার, সব তিনি লিখে রেখেছেন।

বললেন—একটা গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দাও। আর ব্লাডপ্রেসারটা আধ ঘণ্টা অন্তর দেখ। আর এই সব ইন্‌জেক্‌শন চলুক। দরকার হলেই ফোন করো।

এই বলে রুগীর ভার আমার ওপর চাপিয়ে তিনি চলে গেলেন। স্টেথোস্কোপ দিয়ে রুগীর বুক দেখে, ব্লাডপ্রেসার নিয়ে, সিরিঞ্জ রেডি করে, গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দিতেই ভদ্রলোক একটু নড়ে উঠলেন। বিরক্ত হয়ে আঃ বলে চিৎকার করে এক হাত দিয়ে টান দিয়ে অক্সিজেনের নল খুলে

ফেললেন। ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কি একটা বলবার চেষ্টা করেও বলতে পারলেন না। ভুরু কুঁচকে গেল। খুব রেগে গেছেন মনে হল। অক্সিজেনের নল নাকে দিতে গেলেই মাথা সরিয়ে আবার আঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

মহিলাটি বললেন—রবার টিউব নাকে দেওয়া ওঁর পছন্দ নয়। ফানেল দিয়েই দিন।

একটু ইতস্তত করে বললাম ফানেলে কাজ ভাল হয় না। টিউবটাই আবার দেবার চেষ্টা করা যাক।

মহিলা বললেন—না থাক। জোর করে দিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে অক্সিজেনটার রেগুলেটর বাড়িয়ে দিন। ফানেল দিয়ে জোরে গ্যাস আসুক।

কোথায় আমিই বলব, কোনটা রুগীর পক্ষে ভাল, তা নয় উল্টে আমাকেই শুনতে হল কি করা হবে। এরই নাম প্রাইভেট প্র্যাকটিস। বিশেষ করে শিক্ষিত বড় ঘরে।

তাই করা হল। ভদ্রলোক আবার ঘুমুতে লাগলেন। মহিলাটি রুগীর মুখের কাছে ফানেল ধরে বসে রইলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মহিলা। লম্বা ভরাট চেহারা। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস মনে হল।

বাইরে তখনও টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এত বড় বাড়ি, রুগীর ঘরে আর কোনো লোক নেই। মহিলাটি একা রুগীর পাশে বসে আছেন। আমারও কোনো কাজ নেই। চুপচাপ বসে আছি। দেয়ালে দেখলাম, মহিলাটির এনলার্জ-করা বড় কয়েকখানা ছবি। সংগে সাহেবী পোশাক-পরা এই ভদ্রলোক। কোনোটা পাহাড়ে তোলা, কোনোটা বা সমুদ্রে।

মহিলাটি বললেন—আপনি বরং পাশের বসবার ঘরে গিয়ে একটু রেস্ট নিন। দরকার হলেই ডাকব।

পাশের ঘরে উঠে এলাম। এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। বছর চল্লিশ বয়স। ঘরে ঢুকতেই বললেন—কেমন দেখলেন?

বললাম—অবস্থা তো ভাল নয়। একই রকম চলছে। কি করে এমনটা হল?

ভদ্রলোক বললেন—মিঃ রায় আমার ভগ্নীপতি। বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়র। নিজের চেষ্টায় ব্যবসা করে বড় হয়েছেন। একরোখা লোক। কারু কথা শোনেন না। কতদিন থেকে বলছি, তবু কোনো বড় ডাক্তার দেখাবেন না। আজ নেহাত অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তাই আপনাদের আনা গেল।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—এতদিন চিকিৎসা হয়নি? বলেন কি?

ভদ্রলোক বললেন—মাস ছয়েক থেকে ভুগছেন। এণ্টালীতে কে এক অবধূত আছেন, তাঁর কাছ থেকেই কি সব অষুধ আসছে। তাই এতদিন চলেছে। তার ওপর আছে বন্ধু এক ডাক্তার। রোজ দুবেলা করে আসে। আমার বোনকে মেমসায়েব বলে ডাকে। শুনেছি ইউরিন ব্লাড কি সব পরীক্ষা করে। সেই রিপোর্ট শুনে অবধূত নাকি অষুধ দেয়।

শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। অবস্থাপন্ন শিক্ষিত ঘরেও যে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হত।

জিজ্ঞাসা করলাম—বন্ধু ডাক্তারটি কে?

ভদ্রলোক যাঁর নাম করলেন, তাঁকে আমি চিনি। বড়লোকের ছেলে। বড় ঘরে চিরদিন প্র্যাকটিস করেন। বন্ধু মহলে ভাল চিকিৎসক বলে খ্যাতি আছে। মেডিক্যাল কলেজেও ভাল ছেলে বলেই নাম ছিল। আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র। তিনি কি করে এই চিকিৎসা মেনে নিলেন, ভেবে পেলাম না। এঁরা পয়সাওয়ালা লোক; সবচেয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে কি বাধা ছিল?

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার বোন এই চিকিৎসায় রাজী হলেন?

ভদ্রলোক বললেন—তাইতেই আমরা অবাক হয়ে গেছি। মিনি কি করে ছ-মাস ধরে এটা মেনে নিয়েছে, সেইটেই অদ্ভুত লাগছে। বি এ পাশ বিলেত-ফেরত মেয়ে স্বামীর এই কঠিন অসুখে দৈব চিকিৎসায় নির্ভর করে রয়েছে দেখে আমরাও আশ্চর্য হয়ে গেছি। দেখেছি এই অসুখের কথা নিয়ে ওঁরা কেউ আমাদের পরামর্শ নেয় না। জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলে না। কেমন যেন এড়িয়ে যায়। তাই আমরাও বিরক্ত হয়ে খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অনেকদিন পর কাল রাত্রে এসে রুগীর অবস্থা দেখে আর ফেলে যেতে পারলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছিল?

ভদ্রলোক বললেন—মিঃ রায়ের বাবার ব্লাডপ্রেসার ছিল। ওঁর নিজেরও আছে। মাঝে মাঝে বেড়ে যায়। ইদানীং মাস ছয়েক থেকে পা ফুলছে। তখন নাকি এক বড় ডাক্তারকে দেখনো হয়েছিল। তারপর থেকেই ঐ বাড়ির ডাক্তার আর অবধূত দেখছে। সপ্তাহে একদিন গাড়ি করে স্বামী-স্ত্রী দুজনে অবধূতের কাছে যায়, কি সব অষুধ আনে। গত পনের দিন থেকে পা এত ফুলেছে যে, আর উনি হাঁটতে পারেন না। বিছানায় শুতে পারেন

না। হাঁফ ধরে। শুধু ঐ চেয়ারটায় বসে থাকেন। ঐখানে বসেই খান। ঐখানেই ঘুমোন। মাস দুই হল ব্যবসা সব গুটিয়ে উইল করে নগদ টাকা সব আমার বোনের নামে দিয়ে গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কাল কি হল?

ভদ্রলোক বললেন—কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ বললেন, তলপেটে খুব ব্যথা। ইউরিন হবে মনে হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না। ছটফট করতে লাগলেন। বাড়ির ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল। সে এসে ক্যাথিটর দিল, কিন্তু তবু ইউরিন বেরুল না। তারপর ডাক্তার একটা কি অষুধ দিল। বলল এতেই ব্যথা কমে যাবে। ঘণ্টাখানেক পর মিঃ রায় যন্ত্রণায় ছটফট করে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন মিনিকে বলে বড় ডাক্তার ডাকা হল। বাড়ির ঐ হতভাগা ডাক্তারটাই রায় সাহেবকে মারলে। এমন পাষণ্ড; বড় ডাক্তার আসবার পর গাড়ি পাঠালাম, তবু ব্যাটা এল না। অথচ এই বাড়ি থেকে মাসে ওর তিন চারশ টাকা রোজগার হয়। যতবার আসে সব লিখে রাখে, বিল পাঠায়। মিনি কি করে যে লোকটাকে সহ্য করে ভেবে পাই না।

বুঝলাম ভগ্নীপতির এই অবস্থা দেখে বোন-ভগ্নীপতিকে বোঝাতে না পেরে ভদ্রলোক ডাক্তারের ওপরই ক্ষেপে আছেন। যতক্ষণ মিঃ রায়ের জ্ঞান ছিল, ইনি পাত্তা পাননি। এখন জ্ঞান নেই, তাই সুযোগ পেয়েছেন এবং সব রাগটা গিয়ে পড়েছে ডাক্তারের ঘাড়ে।

কিন্তু ডাক্তারটিরও তো দোষ কম নয়। নিজে বিজ্ঞানী হয়ে কি করে এই সঙ্কটকালেও রুগীকে অবধূতের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন? রোজ একবার করে এসে ভিজিট নিয়ে ইউরিন স্টুল পরীক্ষা করিয়ে অবধূতের চিকিৎসা মেনে নিচ্ছেন?

মনে পড়ল, আমার এক আত্মীয় একদিন জরুরী তলব করেছিলেন। গিয়ে শুনি, ওঁদের একতলার ভাড়াটের বছর পাঁচেক একটি মেয়ের তিনি টন্‌সিলের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করবেন। বই দেখে অষুধও তিনি ঠিক করেছেন। কিন্তু কোন দিকের টন্‌সিলটা খারাপ, তা ধরতে পাচ্ছেন না। ডানদিকেরটা হলে এক অষুধ, বাঁ-দিক হলে অন্য। তাই আমাকে দেখে দিতে হবে, কোন দিকটা খারাপ। মনে আছে, রাগ করে সেদিন ও-বাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম।

কিন্তু এখানে ডাক্তারের দায়িত্ব কত বেশি। প্রাণের আশঙ্কা যেখানে, সেখানেও ডাক্তার কি শুধু উপার্জনের কথাই ভাববে? রুগীর বিপদের কথা জেনেও ঐ দৈব চিকিৎসার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখবে? শুনে

ভারি আশ্চর্য বোধ হল। ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস হল না।

এমনি সময় চাকর এসে খবর দিল, রুগীর ঘরে আমার ডাক পড়েছে। ঘরে যেতেই মিসেস রায় বললেন—অক্সিজেনটা বোধহয় ফুরিয়ে গেল। দেখুন তো আর আছে নাকি?

চাবি ঘুরিয়ে দেখলাম, ঘড়ির কাঁটা শূন্যের ওপরে ওঠে না। জলে নল ডুবিয়ে দেখলাম, সত্যি গ্যাস নেই।

বললাম এটাতে আর অক্সিজেন নেই। আর সিলিণ্ডার আছে?

মিসেস রায় বললেন—আর একটা তো আনবার কথা। আমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি এনেছে কি না।

সেই ভদ্রলোক বললেন, যাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে, তিনি এখনও ফেরেন নি।

অক্সিজেন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রুগীর শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেল। ছটফট করতে লাগলেন।

বললাম নাকে টিউব দিয়ে অক্সিজেন দিলে এত তাড়াতাড়ি এটা শেষ হত না। রুগীর কষ্ট কমাতে হলে এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা করতে হয়। আমার বাড়িতে একটা ছোট সিলিণ্ডার আছে। আপনার ড্রাইভারকে বলুন, আমাকে নিয়ে চলুক।

মিসেস রায় বললেন—আপনি চিঠি লিখে দিন। ড্রাইভার নিয়ে আসুক।

বললাম চিঠি পড়ে ওটা বার করবে, এমন কেউ এখন বাড়িতে নেই। কাজেই আনতে হলে আমাকেই যেতে হবে।

মিসেস রায় বললেন—বেশ তাহলে যান। তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন।

বাইরে বেরিয়ে দেখি সবে ভোর হয়েছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু রাস্তার জল এখনও সরে নি। বাড়ি এসে দেখি, ছেলে দুটি ঘুমুচ্ছে। চাকরকে ডেকে বললাম কখন ফিরি ঠিক নেই। রান্না করে খাবার যেন ঢেকে রাখে। আলমারি থেকে অক্সিজেনের ছোট সিলিণ্ডারটি বার করে আবার রুগীর বাড়ি ফিরে গেলাম। অক্সিজেন দিতে আবার রুগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হল।

ইতিমধ্যে একজন দুজন করে রুগীর আত্মীয়রা এসে পড়লেন। মেয়েরাও কয়েকজন এলেন। সকলে পরামর্শ করে ঠিক হল, সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে আনানো হোক।

এমনি সময়ে এঁদের গৃহচিকিৎসক এলেন। একতলায় রুগীর এত

আত্মীয়দের দেখে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—রায় কেমন আছে?

সব্বাই দেখলাম এ'র ওপর খুব বিরক্ত। কেউ কথার উত্তর দিল না। এত লোকের মাঝে আমাকে দেখে ভদ্রলোক একটু যেন ভরসা পেলেন। কাছে এসে বললেন—তুমি এখানে?

বললাম—কাল শেষ রাত থেকেই আছি।

ভদ্রলোক বললেন—রুগী কেমন?

বললাম—ভাল নেই। ঐ একই রকম।

ভদ্রলোক বললেন—বয়েস হয়েছে, তোমাদের মত রাত্রে বেরুতে পারি না। তার ওপর কালকে ঐ দুর্যোগে বাতটা আবার বেড়েছে। দশ গ্রেন এস্‌প্রিন খেয়ে আজ ভোরে বেরুতে পারলাম।

হঠাৎ কে একজন আমাকে বললেন—তাহলে সবচেয়ে বড় ডাক্তারকেই একটা ফোন করে ঠিক করুন, সকালেই দেখানো হোক।

গৃহচিকিৎসকটি বললেন—বড় ডাক্তাররা আজকাল ফোন করলেই আর আসেন না। তিন দিন পরে আসেন।

বললাম—জায়গাবিশেষে আবার আসেনও তো দেখি। একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

মিসেস রায়ের ভাই বললেন—আপনি ফোন করুন।

তখন ভোর সাড়ে ছটা। ফোনে বড় ডাক্তারকে পাওয়া গেল। বললেন, বেলা সাড়ে এগারটায় তিনি আসবেন।

তাই শুনে কাল রাতে যিনি এসেছিলেন, তাঁকেও ফোন করে বললাম, ঐ সময়ে আসতে। এই বন্দোবস্ত করে ওপরে রুগীর ঘরে এলাম। গৃহ-চিকিৎসকও সঙ্গে সঙ্গে এলেন। রুগীর ঘরে ঢুকে কাল রাতে বড় ডাক্তার দেখে যা যা ব্যবস্থা করেছেন, সব দেখে ভদ্রলোক পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন।

মিসেস রায় কিন্তু একটি কথাও ওঁর সঙ্গে বললেন না। ইতিমধ্যে এঁদের আত্মীয় এক বড় ডাক্তার এসে গেলেন। গৃহচিকিৎসক আর তিনি পাশের ঘরে বসে কথা বলতে লাগলেন। ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় বড় ডাক্তার দুজন এলেন। দুজনেই মেডিসিনের প্রফেসর। রুগী দেখা হলে পাশের ঘরে ডাক্তারদের বৈঠক বসল।

কাল থেকে রুগীর ইউরিন হচ্ছে না। পা দুটি পাঁউরুটির মত ফুলে উঠেছে। কোমরে ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর ফুটো দিয়ে জল বেরোয়। সর্ব-শরীরে জল জমে গেছে। হার্টের যে রকম অবস্থা, ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে ইউরিন বাড়িয়ে এই জল বার করা যাবে না। তাহলে উপায়?

সবচেয়ে বড় ডাক্তার বললেন—পারবেন ছুরি দিয়ে পায়ের ওপর লম্বা করে কেটে দিতে? তার ওপর গজ চাপা দিয়ে রাখতে?

বললাম—এতে যদি রুগীর উপকার হয়, নিশ্চয় পারব।

বড় ডাক্তার বললেন—যদি পারেন, খুব উপকার হবে। অনেক জল বেরিয়ে যাবে। রুগীকে বাঁচাতে হলে এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।

বললাম -তাহলে নিশ্চয়ই করব।

অষুধ পথ্য ইন্‌জেক্‌শনের সব ব্যবস্থা করে এঁরা চলে গেলেন। পায়ের ওপর ছুরি চালান হবে শুনে অনেকে ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু মিসেস রায় ঘাবড়ালেন না। ওঁর ভাই বললেন—আমাদের আত্মীয় একজন সার্জন আছেন। তাঁকে ডাকি?

বললাম- বেশ তো তিনি এসেই করে দিন।

তাঁকে ফোন করা হল। তিনি কিন্তু রাজী হলেন না। বললেন, কাঁটা-ছেঁড়া করে কোনো লাভ হবে না। তবু তিনি আসবেন। এসে আমার সঙ্গে কথা বলবেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এলেন। গৃহচিকিৎসকটি তখনও বসে। তাঁর সঙ্গে কোনো কথা না বলে আমাকে বললেন—আমিও এঁদের আত্মীয়। এতদিন থেকে ভদ্রলোক ভুগছেন, কোনোদিন আমাকে ডাকেন নি। আমি নিজে থেকে অনেকবার অসুখের কথা জানতে চেয়েছি, পরামর্শ দিতে এসেছি, কিন্তু এঁরা এড়িয়ে গেছেন। আজ এই শেষ সময়ে যদি আমি ছুরি চালাই, পরে বলবেন, এই কাঁটাছেঁড়ার জন্যই মৃত্যু হয়েছে। কাজেই আমি এসবের মধ্যে নেই। আপনিই এটা করে দিন।

গৃহচিকিৎসকের ওপর ইনিও দেখলাম খুব বিরূপ। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা কথাও না বলে চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন—এই লোকটাই এই সর্বনাশের মূল।

রুগী যদি তোমার চিকিৎসা না মানে, তবু তুমি রোজ আস কেন? কেন স্টুল ইউরিন পরীক্ষা করে হাতুড়ে চিকিৎসায় সাহায্য কর? ভাবলাম, হোক না শুধু ছুরী দিয়ে কাটা, তবু এটা তো সার্জারী। এঁদের পয়সারও কোনো অভাব নেই। একজন সার্জনকে কেন ডাকি না?

মিসেস রায়ের ভাইকে বললাম—আপনাদের আত্মীয়টি যখন রাজী হলেন না, তখন অন্য কোনো সার্জন দিয়ে তাড়াতাড়ি এটা কাটাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ, তাই করুন।

আমাদের হাসপাতালের সার্জনকে ফোন করে দিলাম। তিনি এসে দেখে দু পা ফালা-ফালা করে কেটে গজ তুলো চাপা দিয়ে, ওপরে একটা আল্‌গা ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেলেন। এক ড্রাম গজ রাখা হল। ভিজে গেলে বদলে দেওয়া হবে। ছুরী দিয়ে পা কাটা হল, কিন্তু এক ফোঁটাও রক্ত বেরুল না। রক্তের বদলে জল বেরুতে লাগল।

সার্জন চলে গেলে আমি একবার বাড়ি আসতে চাইলাম। কিন্তু এ'রা ছাড়লেন না। গৃহচিকিৎসকটি বাড়ি গেলেন। বললেন, বিকেলে আবার আসবেন।

পা কেটে দেওয়ার ফলে খুব জল বেরুতে লাগল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই গেলো গজ পাল্টে দিতে হল। দেখতে দেখতে ড্রাম-ভরতি গজ তুলো শেষ হয়ে গেল। শেষে ব্যাণ্ডেজের ওপর টার্কিস বাথ টাওয়েল দিয়ে মুড়ে রাখা হল।

সন্ধ্যার সময় বড় ডাক্তাররা আবার সব এলেন। গৃহচিকিৎসকও এলেন। আমি রুগীর এই অবস্থায় পা কেটে দিতে পেরেছি দেখে ও'রা খুব খুশী। বললেন রুগী যদি বাঁচে এইতেই বাঁচবে। রুগী পরীক্ষা করে, ওষুধের ব্যবস্থা করে সবাই চলে গেলেন।

গৃহচিকিৎসক বললেন-ছ মাস আগেই আমি একে বলেছি, সাবধানে থাকতে। নিয়মমত ওষুধপত্র খেতে। তা কোনো কথা শুনবে না। বলে, এরকম ইন্‌ভ্যালিড হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই আমার ভাল। মেমসায়েবও অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছু হয়নি। ছ মাস আগে প্রথম এই অসুখ ধরা পড়ার পর থেকে ওঁর মনের সাংঘাতিক পরিবর্তন হল। বুঝল একবার যখন হার্ট খারাপ হয়েছে, পা ফুলছে, তখন আর রক্ষে নেই। তাই আমাদের চিকিৎসা ছেড়ে দৈব চিকিৎসা ধরল।

বললাম--রুগীর যে চিকিৎসায় বিশ্বাস তাই সে করাতে পারে। কিন্তু দৈব চিকিৎসার সঙ্গে একজন বিজ্ঞানী যদি নিজেকে জড়ায় তার একটা দায়িত্ব থাকে না কি?

গৃহচিকিৎসক বললেন—ওর এই দৈব চিকিৎসায় আমি নিজেকে জড়িয়েছি তোমায় আবার কে বললে?

বললাম—ছ মাসের মধ্যে যতবার ইউরিন ব্লাড পরীক্ষা হয়েছে তার রিপোর্টে ডাক্তারের জায়গায় আপনার নামই তো দেখেছি লেখা আছে।

গৃহচিকিৎসক হেসে বললেন—আমি এদের বাড়ির পুরনো ডাক্তার। ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ইউরিন ব্লাড দিয়ে এসে ডাক্তারের নাম যদি আমার

লিখে দেয় তাহলে আমি কি করতে পারি?

বললাম—কিন্তু আপনি তো জানেন এরা আপনার নাম ব্যবহার করেন, যদিও চিকিৎসা করে অন্য লোকে? রোজই তো আসেন, কেন এটা বারণ করেন নি?

গৃহচিকিৎসক বললেন- এরা আমার অনেক দিনের পুরনো রুগী। আমি একে দেখতে আসি বন্ধুভাবে। কী চিকিৎসা হয় তা জিজ্ঞাসা করি না; আমার নাম নিয়ে যে ইউরিন পরীক্ষা করায় তাও জানি না। আমি চিকিৎসা করি এর স্ত্রীর। আর ছোট দুটি ছেলেমেয়ের। ওর আত্মীয়-বন্ধুরা সবাই ওকে ছেড়েছে। আমিই শুধু টিঁকে আছি।

গৃহচিকিৎসক চলে গেলে মিসেস্ রায়ের ভাই বললেন—এই ডাক্তারটিকে আমরা কেউ সহ্য করতে পারি না। তবু রোজ ও আসবে। ও বেশ বোঝে কেউ ওকে চায় না তবু আসা চাই। এইবার বাছাধন ভারি জব্দ হয়েছেন। এমনি সময় রুগীর ঘর থেকে ডাক এল। গিয়ে দেখি পায়ের ওপর রাখা টার্কিশ তোয়ালে ভিজে গেছে।

মিসেস্ রায় বললেন -ইউরিনও হয়েছে মনে হচ্ছে। চেয়ারের ওপর যে তোষক চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা ভিজে গেছে।

বললাম তাহলে তো খুব ভাল।

মিসেস্ রায়ের মুখে হাসি ফুটল। বললেন কিন্তু এই তোষক আর চাদরটা যে বদলাতে হয়।

বললাম -দু তিনজনে মিলে রায় সায়েবকে তুলে ধরুক। আর একজন বিছানাটা বদলে দিক।

কিন্তু তুলতে গিয়ে দেখা গেল রুগীর দেহ যেন পাথর হয়ে গেছে। নড়ানো যায় না। অবশেষে ৫।৬ জন জোয়ান লোক মিলে অনেক কষ্টে তাঁকে তোলা হল। তোষক চাদর বদলানো হল। বোঝা গেল কত জল দেহে জমে অমন ভারি হয়ে গেছে।

পা দুটো কেটে দেওয়া হয়েছে, এখন আবার সেপ্‌টিক না হয় সেই জন্য পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হল। অক্সিজেন চলতে লাগল। রাত দুটোর সময় হঠাৎ দেখা গেল রুগীর পায়ের ব্যাণ্ডেজে লাল রং। বুঝলাম ফোলা কমে গেছে এইবার রক্ত বেরুচ্ছে। সার্জনকে ফোন করলাম। সার্জন এসে ব্যাণ্ডেজ খুলে ফরসেপ দিয়ে শিরা ধরে সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়ে গেলেন।

সারা রাত রুগী বেশ শান্ত থাকলেন। ভোরবেলা চোখ মেলে তাকালেন।

মিসেস্ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ?

মিঃ রায় বললেন—ভাল।

নাকের সামনে অক্সিজেনের ফানেল ধরতেই বললেন- ওটার কোনো প্রয়োজন নেই, সরিয়ে নাও।

মিসেস্ রায়কে বললাম—উনি যখন চাইছেন না ওটা এখন থাক। মুখ ধুইয়ে একটু হরলিক্স খাইয়ে দিন।

মিঃ রায় আমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ বুজলেন। রুগীকে মুখ ধুইয়ে হরলিক্স্ খাওয়ানো হল। ইন্জেক্শন যা দেবার ছিল দিয়ে আমি একবার বাড়ি আসতে চাইলাম।

কিন্তু মিসেস্ রায় ছাড়লেন না।

বললেন এইখানেই চা খেয়ে নিন। তারপর বড় ডাক্তাররা কখন আসবেন ফোন করে ঠিক করুন।

ফোন করে ঠিক হল দুপুরে হাসপাতালের পর এঁরা আসবেন। রুগীর সব ব্যবস্থা করে দেবার পর এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ফিরে যাব বলে আমি বাড়ি এলাম। স্নান করে আজও বাড়িতে খাব না বলে অপর কয়েকটি বাড়ির রুগীর ব্যবস্থা করে আবার ফিরে গেলাম।

গিয়ে দেখি গৃহচিকিৎসক বসে আছেন। বললেন আজকাল দেখছি অনেক নতুন চিকিৎসা হয়েছে। এমন অবস্থায় পা অমনি করে কেটে যে রুগী বাঁচানো যায় আগে তো কখনও দেখিনি!

বললাম- শেষ চেষ্টা তো করা হল। এখন এঁদের ভাগ্য।

দুপুরে বড় ডাক্তাররা সব এসে গেলেন। রুগীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে দেখে সবাই খুব খুশী। আবার সব ব্যবস্থা দিয়ে সন্ধ্যার পর ওঁরা আসবেন বলে চলে গেলেন।

বাড়িতে সকলের মুখেই খুশীর ভাব ফুটে উঠল। এমনি যদি চলে বড়সায়েব ভাল হয়ে উঠবেন এই আশা মনে জাগল। মিসেস্ রায় দিনের বেলা একটু ঘুমিয়ে উঠলেন। সন্ধ্যাবেলা স্নান করে আবার ফিটফাট হয়ে রুগীর পাশে বসলেন।

রুগীর পায়ের ফোলা কমে গেছে। স্বাভাবিকভাবে ইউরিন, স্টুল হয়েছে। ব্লাড প্রেশার ভাল। জ্ঞানও বার দুই হয়েছে। ঘুমুলেই অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। বার কয়েক হরলিক্স্ খাওয়ানো গেছে। কাজেই সকলেরই মনে খুব ফূর্তি হয়েছে।

সন্ধ্যার পরেই একজন বড় ডাক্তার এলেন। তিনিও রুগী দেখে খুব

খুশী। বললেন—অনেকটা যখন ইম্‌প্রুভ করেছে এইবারে আরও ইম্‌প্রুভ করবে।

ইনি দেখে পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন। একটু পরেই আর একজন বড় ডাক্তার এলেন। সিঁড়ির মুখেই তাঁকে রুগীর এই সুখবর দেওয়া হল। খুশী হয়ে হাসি মুখে রুগীর ঘরে ঢুকলেন। প্রথমে পা-টা দেখলেন বললনে—বাঃ, ফোলা তো দেখছি বেশ কমে গেছে। কালকে তাহলে এটা সেলাই করে দিন।

এই বলে রুগীর নাড়ী দেখে ব্লাডপ্রেশারের যন্ত্রটি হাতে বাঁধলেন। স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে একবার দেখে আবার দেখলেন। দেখলাম ডাক্তারের হাসিমুখ ম্লান হয়ে গেল। চোখে মুখে উদ্বিগ্নের চিহ্ন ফুটে উঠল। আবার বার দুই দেখে কান থেকে যন্ত্রটি খুলে আমাকে দিয়ে বললেন আপনি একবার দেখুন দেখি। এই বলে বড় ডাক্তার পাশের ঘরে চলে গেলেন

যন্ত্র লাগিয়ে দেখি ব্লাড প্রেশার সাংঘাতিক কমে গেছে। ১৬০ থেকে হঠাৎ ৭৫-এ নেমেছে। রুগীর হাতমুখ সারা গা ঘেমে উঠেছে। বুঝলাম আর রক্ষে নেই। হার্ট ফেইলিওর হচ্ছে। এক্ষুনি যে এমনটা হবে এইজন্য তৈরী ছিলাম না। মুখ শুকিয়ে গেল।

মিসেস্ রায় অক্সিজেনের ফানেল হাতে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু ইতস্তত করে ওঁর দিকে তাকালাম। মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

উনিই জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠ। একটুও উদ্বেগ ফুটে উঠল না।

বললাম ব্লাডপ্রেশারটা হঠাৎ খুব কমে গেছে।

মিসেস্ রায় বললেন—কত?

বললাম—১৬০ থেকে ৭৫এ নেমেছে।

মিসেস্ রায় বললেন—তাহলে ইন্‌জেক্‌শন দিন।

পাশের ঘরে বড় ডাক্তাররা রয়েছেন। গৃহচিকিৎসকও আছেন 'ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছি' বলে সেই ঘরে পালিয়ে এলাম।

ডাক্তাররা সবাই বুঝেচেন এখন ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে আর বাঁচানো যাবে না। একজন বললেন—এঁদের এখন এই কথাটা বলা দরকার।

মিসেস্ রায়ের ভাইকে ডেকে একথা বলা হল। তিনি শুনে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।

গৃহচিকিৎসক বললেন—ছ মাস আগে হার্টএর জন্যই পা ফুলেছে ভেবে

রায় ধরে নিয়েছিল ও বেশীদিন বাঁচবে না। তাই মোটা টাকার কয়েকটা ইন্সিওর করে গেছে। কাজেই ডেথ্ সার্টিফিকেটে এমন কিছু যদি থাকে যাতে সন্দেহ হয় ছ মাস থেকেই ও ভুগছিল তাহলে বেচারা বিধবা আর দুটি ছেলেমেয়ে পথে বসবে। আমি জানি এ ছাড়া এদের আর কিছু নেই।

বড় ডাক্তার বললেন—ডেথ্ সার্টিফিকেটে সে সব কথা তো থাকবে না। আমরা লিখব ইউরিমিয়া।

গৃহচিকিৎসক বললেন—অনেক টাকার ইন্সিওর, তার ওপর বিলিতী কোম্পানি। যদি এন্কোয়ারী হয় আপনারা কি বলবেন ছ মাস থেকে ও ভুগছিল?

বড় ডাক্তার বললেন—তা কি করে বলব? আমরা তো দেখছি এই শেষ দু দিন। এন্কোয়ারী হলে তাই আমরা বলব।

আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন—কত টাকার ইন্সিওর?

গৃহচিকিৎসক বললেন—তা সব মিলিয়ে প্রায় লাখ টাকা।

পাশের ঘরে রায় সাহেব এখনও বেঁচে আছেন। আর এ ঘরে এইসব কথা শুনতে একটুও ভাল লাগছিল না।

এমনি সময় চাকর এসে বলল—মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন। বড় ডাক্তার একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—মিসেস্ রায় বলেছেন ব্লাড প্রেসার যখন কমে গেছে তখন একটা ইন্জেক্শন দিন। কি দেব?

বড় ডাক্তার বললেন—একটা এট্রোপিন দিন। আর কিছু তো আমাদের করবার নেই। আমরা এবার চলি।

ওঁরা চলে গেলেন। আমি রুগীর ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম মিসেস্ রায় সেই তখনকার মতই অক্সিজেনের ফানেল রুগীর মুখের কাছে ধরে বসে আছেন। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ৩।৪টি মহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

মিসেস্ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—বড় ডাক্তাররা চলে গেলেন? আমি মাথা নেড়ে হাঁ বললাম।

দেখলাম রায় সাহেবের নিঃশ্বাসের কষ্ট বেড়ে গেছে। নাড়ী দেখলাম খুব ক্ষীণ। এট্রোপিন ইন্জেক্শন দিলাম। সিরিঞ্জ স্টেথোস্কোপ ব্যাগে ভরে পাশের ঘরে গিয়ে বসব ভাবলাম। গত ছত্রিশ ঘণ্টার ওপর বিশ্রাম না করে একটানা খেটেছি, এখন হঠাৎ যেন ভয়ানক ক্লান্ত মনে হল। তার ওপর মিসেস্ রায়ের এই অবিচলিত শান্ত সংযত ভাব কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল।

মিসেস্ রায় বললেন—আপনি যাবেন না। রুগীর পাশে বসুন।

অগত্যা বসতে হল।

মিসেস্ রায় বললেন—অক্সিজেনের রেটটা বাড়িয়ে দিন। তাই দিলাম।

রুগী না দেখে মিসেস্ রায়কেই দেখছিলাম। মুখের ভাব একটুকুও পরিবর্তন হচ্ছে না। ফানেল ধরা হাতখানা একটুও কাঁপছে না। চোখের কোণে এক ফোঁটাও জল নেই। দুঃখ, শোক, উদ্বেগের কোনো চিহ্ন মুখে চোখে ব্যবহারে ফুটে উঠল না।

অবশেষে এক সময় রায় সাহেবের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। তখনও মিসেস্ রায় আগের মতই ফানেল ধরে বসে রইলেন। ব্যাগ থেকে স্টেথোস্কোপ বার করে বুকে বসালাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম।

মিসেস্ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো শব্দ পেলেন না? মাথা নেড়ে বললাম—না।

মিসেস্ রায় ফানেলটা সরিয়ে খাটে রেখে এই প্রথম উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তাহলে এটা দিয়ে আর কি হবে?

এই বলে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেলেন।

॥ ১৯ ॥

দেশ স্বাধীন হওয়ার মুখেই কলকাতা শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। পুলিস সে দাঙ্গা বন্ধ করতে পারল না। অবশেষে মিলিটারীদের হাতে শহর ছেড়ে দেওয়া হল। কারফিউ অর্ডার জারি হল। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কারফিউ। মাঝে শুধু ঘণ্টা দুয়েক বাজার করবার জন্য খোলা।

এ পাড়ায় নতুন এসেছি। রুগী পত্তর এমনিতেই বিশেষ কিছু নেই। তার ওপর এই হাঙ্গামায় আর কে আসবে?

চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকি আর গুজব শুনি। শত্রুপক্ষের নৃশংসতার গুজব যেন হাওয়ায় ভেসে আসে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক জানালা খুলে ডেকে গুজব শোনান।

মাঝে মাঝে হঠাৎ এক বাড়িতে শঙ্খধ্বনি হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়িতে। দেখতে দেখতে সব বাড়িতেই ঐ ধ্বনি গর্জে ওঠে। বুঝি, শত্রু-পক্ষের আক্রমণের সংকেত। ছেলেরা ইঁটের থান আর লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সিঁড়ির দরজায় দাঁড়ায়। তবু যুদ্ধ কিন্তু হয় না। রাস্তার ট্যাঙ্কের ঘড়্-ঘড়্ আর মেশিন গানের ফট্-ফট্ আওয়াজে সব গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

মিলিটারীর গুলী খেয়ে দাঙ্গা বন্ধ হয়ে গেল। দোকানপাট খুলল। ট্রাম বাস আবার চলা শুরু হল। গুজব কিন্তু গেল না। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছুট্কো-ছাট্কা ছোরা ছুরি চালানোর খবর আসতে লাগল। রাত নটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত কারফিউ চলতে লাগল।

বড় বড় ডাক্তার, যাঁদের বেশী প্র্যাক্টিস্, তাঁরা ঐ কারফিউর মধ্যেই বেরুবার পারমিট করিয়ে নিলেন। নিজের গাড়ি গ্যারেজে রেখে রুগীদের গাড়িতে করে, ঐ পারমিট নিয়ে নেহাত দরকার হলে রাত-বিরেতে বেরুতে লাগলেন। আমাদের দিনের বেলাতেই কেউ ডাকে না, রাতে আর ডাকবে কে? তাই ঐ পারমিটের ঝামেলায় আর গেলাম না।

এমনি সময় একদিন হঠাৎ এক টাইফয়েডের কেস হাতে এসে গেল। টাইফয়েডের অষুধ ক্লোরোমাইসেটিন তখনও বাজারে বেরোয় নি। তখনকার দিনে টাইফয়েডের রুগী হাতে আসা মানেই ডাক্তারের ঘরে লক্ষ্মী আসা। কমসে-কম মাসখানেকের জন্য একটি রুগী হাতে থাকা, রোজ দু বেলা

করে দেখতে যাওয়া, গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া। পয়সাওয়ালা রুগী হলে ডাক্তার নার্স সকলেরই বেশ কিছু প্রাপ্তির আশা। রোগের যখন কোনো অষুধ নেই তখনই চিকিৎসকের যা কিছু কেরামত। রুগী যদি ভাল হয়, চিকিৎসকের হাতযশ। যদি মৃত্যু হয় তার ভাগ্যদোষ। ভালো হোক, মন্দ হোক, রুগীর একটি জিনিস শুধু ধ্রুব। সেটি হল অর্থনাশ।

শুধুই কি অর্থনাশ? রোগ থেকে বেঁচে উঠলেও কমসে-কম ছ-টি মাসের জন্য দেহের শক্তিনাশ। মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মেধা নাশ। দৃষ্টি, স্মৃতি, শ্রবণশক্তি অথবা বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে কারু হয়ত বা সর্বনাশ।

এমন যে কঠিন রোগ তারও কিন্তু প্রতিষেধক ছিল। এখনও আছে। টি এ বি ইন্‌জেক্‌শন। বৎসরে একদিন অর্ধ সি সি, সাত দিন পর আবার এক সি সি। কর্পোরেশনের টিকা দেওয়ার আপিস থেকে নিলে কারুর একটি পয়সাও খরচ নেই। তবু লোকে নিত না। এখনও যেমন নেয় না।

যে ছেলেটির অসুখ হয়েছে তার দাদা এসে একদিন বলল—ভাইটার আজ ৭।৮ দিন থেকে খুব জ্বর। রোজই বাড়ছে। একবার চলুন দেখে আসবেন।

এই দাদাটির বয়স ২৫।২৬। আমারই জানাশোনা একটা আপিসে টাইপিস্টের কাজ করে। গঙ্গার ধারে পুরনো একটা গলির ভেতর ভাঙাচোরা একখানা ঘর নিয়ে থাকে। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ থেকে বিধবা মা আর বিশ বছরের ছোট ভাইটি এসেছে। তারই আজ ৭।৮ দিন থেকে জ্বর।

জিজ্ঞাসা করলাম—এই সাত আট দিনে জ্বর একবারও ছাড়েনি?

নবীন বলল—আজ্ঞে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—জ্বর কতটা উঠেছে?

নবীন বলল—প্রথম প্রথম ১০২° পর্যন্ত উঠত। ১০০° পর্যন্ত নাবত। আজ দুদিন হল ১০৪° পর্যন্ত উঠছে। ১০২°র ডিগ্রির নিচে আর নাবছে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—জ্বর যখন বাড়ে তখন শীত করে?

নবীন বলল—না। শীতের কথা কখনও বলেনি। গায়ে কাপড় দিলে সরিয়ে দেয়। শুধু বলে, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল, মেনিনজাইটিস্ নয় তো? জিজ্ঞাসা করলাম—জ্ঞান আছে? মাথা ঘাড় নাড়তে পারে?

নবীন বলল—তা পারে। এপাশ ওপাশ ফেরে। ছট্‌ফট্ করে। পরশু থেকে এটা বেড়েছে। মনে হয়, একটু একটু ভুলও বকছে।

বললাম—চল যাই দেখে আসি।

রাস্তায় বেরিয়ে নবীন একটা রিক্‌শা ডেকে দরদস্তুর করে বিনীত কণ্ঠে বলল—দয়া করে উঠে পড়ুন। আমি হেঁটে হেঁটে সঙ্গে যাই।

ওর আপিসের 'বসে'র আমি গৃহচিকিৎসক। 'বসে'র গাড়ি করে 'বসে'র বাড়ি গিয়ে রুগী দেখি। সেই আমাকে ও রিক্‌শা করে নিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর পাশে এসে বসে কি করে?

ওর এই সংকট কাটাবার জন্য একটু হেসে বললাম—তুমি নিচে থাকলে চলবে কি করে? রুগীর কথা আরও জানতে হবে যে। উঠে এস। যেতে যেতে শুনে নিই।

একটু আপত্তি করে একটু অপ্রস্তুত মুখে নবীন সসংকোচে উঠে এল। আমার ব্যাগটা কোলে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রিক্‌শা ডাইনে চালাতে বলল।

জিজ্ঞাসা করলাম—এবার কলেরা টাইফয়েডের ইন্‌জেকশন নেওয়া হয়েছে?

লজ্জিত মুখে নবীন বলল—আজ্ঞে না।

শুনে মোটেই অবাক হলাম না। ইনজেকশন যে নেয়নি আগেই যেন জানা ছিল।

বললাম—কেন?

নবীন বলল—ইন্‌জেকশন নিলে হাতে ব্যথা হয়। জ্বর হয়। তাছাড়া নিলেও নাকি এ অসুখ হতে পারে?

একথার কি জবাব দেব? চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিশ্চিত ধ্রুব বলে কিছু আছে কি? গ্যারাণ্টি তো বিজ্ঞান কখনও দেয় না। দিতে পারেও না। কিন্তু লোকে যে তাই চায়! না পেলে অর্থব্যয় অপব্যয় মনে হয়। সেই ফাঁকে অবিজ্ঞানী ধূর্ত ব্যবসায়ী নিশ্চিত আরোগ্যের লোভ দেখিয়ে জাল ফেলে। সেই জালে বুদ্ধিমান বিত্তবান গরীব মূর্খ সকলেই দেখি এক এক সময় ঘায়েল হয়।

বললাম—এক বাড়িতে একটি আট বছরের ছেলের টাইফয়েড হয়। তিরিশ দিন অজ্ঞান থেকে শেষে বেঁচে ওঠে। সেই বাড়িতে ছেলে বুড়ো সবাইকেই টি এ বি দেওয়া হল। বাদ গেল শুধু একটি বাচ্চা। ছ-মাস তার বয়েস। যেদিন টাইফয়েডের রুগীটির জ্ঞান হল, জ্বর ছাড়ল, তার তিন দিনের মধ্যেই ছোট বাচ্চাটির এ রোগ হল। তিন সপ্তাহ ভুগে বাচ্চাটি মারা গেল।

শুনে নবীন একটু যেন লজ্জিত হল। বলল—আজ্ঞে সেজন্য নয়। প্রতি

বছরই তো ইন্‌জেকশন নিই। এবারও নেব। কিন্তু নিই নিচ্ছি করে দেরি হয়ে গেল। এ নিলে আমার আবার খুব জ্বর হয়।

তা অবশ্য হয়। কারু কারু আবার খুব বেশীই হয়। জ্বর ওঠে ১০৫°। কিন্তু একদিনের বেশী কেউ বড় একটা ভোগে না।

সেই ভয়ে ডাক্তাররাও অনেকে সহজে এ ইন্‌জেকশন নিতে চায় না। বলে—আমাদের এসব রোগ ধরে না। খুব সাবধানে থাকি। বাজারের কোনো খাবার খাই না। জল ফুটিয়ে খাই। এ অসুখ হবে কি করে?

তবু কিন্তু রোগ ধরে। ডাক্তার বলে রেহাই দেয় না। এরোগে ডাক্তারেরও মৃত্যু হয়। অন্তত আগে হত।

নবীন বলল—তাহলে যে শুনি ইন্‌জেকশন নিলেও অসুখ হতে পারে সেটা কি ঠিক নয়?

ঠিক যে নয় তাই বা বলি কি করে? যুদ্ধের সময় দেখেছি তো ইন্‌জেকশন নেবার তিন মাসের মধ্যেই টাইফয়েডে মৃত্যু হয়েছে। অবস্থাপন্ন ঘরের লোক। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি। নামকরা বড় ডাক্তার অনেক এসেছেন। কিন্তু প্রাণ রক্ষা হয়নি। পনের দিনের মধ্যেই রুগীর মৃত্যু হয়েছে।

যুদ্ধের সময় সব জিনিসেই ভেজাল চলেছে। সব দেশে। কিন্তু খাদ্য অথবা ওষুধে আমাদের মত ভেজাল দিতে আর কেউ বোধ হয় পারেনি। তখন দেখেছি, কুইনিনে জ্বর ছাড়ে না। এমিটিনে আমাশা বন্ধ হয় না।

টাইফয়েডের যে ভ্যাক্‌সিন বাজার থেকে কিনে এই ছেলেটিকে দেওয়া হয়েছিল সেটা যে খাঁটি ছিল তাই বা কে বলবে?

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। ওষুধে ভেজাল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ভ্যাক্‌সিন যাতে ঠিকমত রক্ষা করা যায় সেজন্য ওষুধের দোকানে রেফ্রিজারেটার রাখার আইন হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বভাব কিছু বদলেছে কি?

শিশুর খাদ্য যে দুধ তাতেও ভেজাল মেশাতে আমাদের কোনোদিন বাধেনি। এখনও বাধে না। যুদ্ধের আগেও শুনেছি, কলকাতায় খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। এখনও তাই শুনি।

নবীনকে এসব বলে আর লাভ কি? তাই গম্ভীর হয়ে বললাম—ওষুধ ঠিক থাকলে এ ইন্‌জেকশনে রোগ না হবারই কথা।

রিক্‌শা বড় রাস্তা পেরিয়ে একটা গলিতে ঢুকল। এক গলি থেকে আর এক গলি। এ গলি ও গলি পেরিয়ে অবশেষে নবীনদের স্যাঁতসেঁতে

গলির ভিতর ঢুকলাম। আঁকা-বাঁকা সরু গলি। খানিকটা গিয়ে রিক্‌শা পর্যন্ত আর এগুতে পারল না।

নবীন আমার ব্যাগটি তুলে নেবে পড়ল। লজ্জিত বিনীত কণ্ঠে বলল— এইবারে একটু হাঁটতে হবে।

রিক্‌শা ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলাম। এ বাড়ি পার হয়ে ও বাড়ির আঙিনা ডিঙিয়ে অবশেষে ওদের ঘরে গিয়ে পেঁছুলাম।

পুরনো দোতলা বাড়ি। চুনবালি খসা। তারই একতলার একখানা ঘর। মেঝেতে বিছানা পাতা। ঘর-দোর নোংরা। ঢুকতেই একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে এল।

শুনেছি বড় বড় চিকিৎসক রুগীর ঘরে ঢুকেই বলে দিতে পারতেন, কি রোগ এবং পরমায়ু কতদিন। চিকিৎসক জ্যোতিষী নন। তবু বলতেন। অনেক ক্ষেত্রে মিলেও যেত।

আমরা তা পারি না। রোগীর চেহারা দেখে এবং ঘরের গন্ধ থেকে এ অনুমান করা নাকি সম্ভব হত। চূড়ান্তভাবে বোঝা যেত নাড়ী দেখে। রোগীর নাড়ী নিজের আঙুলে অনুভব করে রোগের প্রকোপ চিকিৎসক উপলব্ধি করতেন। এই নাড়ী-জ্ঞানটি বড় সহজ বস্তু ছিল না। নাড়ী ধরে চিকিৎসক মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে দিতেন। নিজের দু-চোখ বন্ধ করে সোজা হয়ে বসতেন। মনে হত, যেন ধ্যানে বসেছেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। একমনে শুধু রোগীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছেন। এক এক সময় আধ ঘণ্টারও ওপর কেটে যেত। তবু নাড়ী দেখা শেষ হত না। এমনি করে ধ্যানস্থ হলে তবে চিকিৎসক মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেতেন। কখনও শুনতেন ধীর মন্থর নিশ্চিত গতিতে মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। অন্ধ বধিরা পিঙল কেশী। কখনও দেখতেন, এগিয়ে এসেও মৃত্যু ফিরে গেল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত লজ্জিত পায়ে।

আমরা তা পারি না। আগেকার চিকিৎসকের মত আমাদের এ নাড়ী-জ্ঞান নেই। তার জন্য আপসোস করি না। লজ্জাও বোধ হয় না। কারণ শুধু নাড়ী দেখে এখন আর চলে না। স্টেথোস্কোপ বসাতে হয়। ব্লাড প্রেশারের যন্ত্র লাগাতে হয়। হৃদয়যন্ত্র বিকল হলে ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাম পর্যন্ত করাতে হয়।

একই রোগে এক এক ঘরে এক এক রকম গন্ধ। হাসপাতালে এক। নার্সিং হোমে অন্য। পরিষ্কার ঘরে এক। নোংরা ঘরে অন্য।

রোগীর চেহারা দেখে কিন্তু অনেক কিছুই ধরা যায়। এইখানেই

চিকিৎসকের বাহাদুরী। অনেক দেখে অনেক শিখে এ বিদ্যা লাভ হয়।

আমাদের প্রফেসর বলতেন, চোখ দুটোকে তৈরি কর। দেখতে শেখ। তোমার হাত তোমাকে ঠকাতে পারে। কান তোমাকে প্রবঞ্চনা করতে পারে। কিন্তু দেখতে শিখলে চোখ কখনও ঠকাবে না। ভুল করবে না। চোখের পিছনে নিজের মগজটাকে খাটাও। দেখতে শেখ।

রুগীর ঘরে ঢুকে সেই প্রফেসরের কথা মনে পড়ল। বুঝলাম চোখ দুটো ঠিক তৈরি হয়েছে। দেখতে শিখেছি। এর যা চেহারা তাতে এর রোগ ও পরমায়ু বলে দিতে নাড়ী দেখবারও আর কোনো প্রয়োজন নেই।

মেঝের একপাশে বিছানায় ২০।২১ বছরের একটি ছেলে শুয়ে। মাথায় এক ঝাঁক রুক্ষ্ম চুল। মুখ দাড়ি গোঁফে ভর্তি। চোখ গাল গর্তে। সরু লিকলিকে রোগা দুখানি হাত। গলার হাড় ফুটে উঠেছে। এই ৮।১০ দিনে গায়ে মাথায় এক ফোঁটাও জল পড়েনি। জামা কাপড় বিছানা সব ময়লা। সমস্ত মিলিয়ে ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ।

আমরা ঢুকতেই নবীনের বিধবা মা একখানা আসন পেতে দিলেন।

বললেন, কাল অমাবস্যা গেছে। জরটাও তাই বেড়েছে। কিন্তু আজও তো কই কমল না?

এ'রা নিম্ন মধ্যবিত্ত। অল্পশিক্ষিত। আচারপরায়ণ। ধর্মনিষ্ঠ। অতি আধুনিকা, বিত্তবতী, শিক্ষিতা, এমন কি মার্কসপন্থী মহিলাদের মুখেও শুনি অমাবস্যা পূর্ণিমায় জ্বর বাড়ে। ব্যথা বেশী হয়। পা ফোলে। দেহ রসস্থ হয়।

কিন্তু অহিন্দুদের তো কই এসব কিছু হয় না?

বিশ্বাস বড় কঠিন জিনিস। যুক্তির সেখানে ঠাঁই নেই। তাই নবীনের মার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বললাম, দেখি আগে পরীক্ষা করে। বসতে গিয়ে দেখি আসনটি বেশ নোংরা। তবু তারই ওপর বসতে হল। ভাবলাম, বাড়ি গিয়েই এই নতুন পোশাকটি ছাড়তে হবে। আর টি এ বি সি ইন্‌জেকশন একটি নিতে হবে।

দেখলাম, রুগীর পেট বেশ ফাঁপা। কোটরগত চক্ষু দুটি ঘোলাটে। জিভের ওপর সাদা পর্দা। জ্বর ১০৪ ডিগ্রী। বিকার চলছে। কিন্তু একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়নি।

বললাম, টাইফয়েডের তো কোনো অষুধ নেই। শুশ্রূষাটাই আসল। বাড়িতে কি তার সুবিধে হবে? হাসপাতালে দিন না?

নবীনের মা বললেন, আমরা গরীব লোক। হাসপাতালে কি আমাদের

কেউ দেখে? যত্ন নেয়?

এই একই কথা শুনে আসছি আজ তিরিশ বৎসর। আগে হাসপাতালে বেড খালি থাকত। রুগী সহজে ভরতি হতে চাইত না। ভাবত, হাসপাতাল একটি জেলখানা। ডাক্তার একটি জল্লাদ।

আজকাল বেড পাওয়া যায় না। যত রুগী তত বেড নেই। তাই তদ্বিরের চল হয়েছে। এই কার্যটি গরীবের কর্ম নয়। আমরা যারা মধ্যবিত্ত তাদেরই একচেটিয়া। ওকে ধরে তাকে ধরে নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোক ছাড়া আর কেউ পারে কি? এজন্য আমরা অনুরোধ করি খোশামোদ করি, অবশেষে ভয় দেখাই। খবরের কাগজে কেচ্ছা বার করি।

কিন্তু হাসপাতালে রোজ আমরা কি দেখি?

এইতো গত হরতালের দিন আমাদের হাসপাতালে দুপুর বেলা হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল। উঃরে বাবারে মরে গেলাম। সেই সাংঘাতিক চিৎকার শুনে রুগীরা চমকে উঠল। আমরা অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলাম। সার্জন আর এস আর আমি।

দেখলাম একটি ১৫।১৬ বছরের জোয়ান ছেলেকে দুই ভদ্রলোক কোলে করে নিয়ে আসছেন। ছেলেটা চ্যাঁচাচ্ছে।

কি ব্যাপার?

টেবিলে শুইয়ে দেখা গেল ছেলেটার একটা হাতের কব্জি শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। নিচে থেকে সবটা হাত ফুলে উঠেছে। নীল হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকটি বললেন, উঠোনের এক পাশে অনেকদিন থেকে কতকগুলি ইঁট পড়ে ছিল। ছেলেটাকে আজ বলেছিলাম সরিয়ে ফেলতে। খান দুই সরাবার পরেই হঠাৎ আঙুলে কি একটা কামড়ে দেয়। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি কব্জিটা বেঁধে ফেলে একটা ডিসপেন্সারীতে নিয়ে যাই। ওরা বলে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে। হরতালের দিন বাস ট্যাক্সী বন্ধ। তাই কাছাকাছি এইখানেই এনেছি।

ছেলেটা সমানে চিৎকার করে চলেছে। ছটফট করছে।

আমাদের সার্জন ছেলেটার হাত দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কিসে কামড়েছে?

ছেলেটা বলল, কাঁকড়া বিছে।

সার্জন জিজ্ঞাসা করলেন, কতক্ষণ বাঁধা হয়েছে?

ভদ্রলোকটি বললেন, তা ঘণ্টাখানেক হবে।

সার্জন আর এস কে বললেন, তাড়াতাড়ি বাঁধনটা কেটে দাও। রক্ত চলাচল হোক। তারপর যেখানে কেটেছে সেখানে নোভোকেন ইনজেক্শন দাও। ব্যথা কমে যাবে।

ভদ্রলোকটি ফস করে বললেন, বাঁধ তো খুলবেন, কিন্তু তার দায়িত্ব নেবে কে? সাপে যদি কেটে থাকে?

আমরা তো স্তম্ভিত! দিন দুপুরে কলকাতা শহরে সাপে কাটবে অথচ কেউ দেখবে না? জানবে না? কাটার দাগও থাকবে না? রক্তও বেরুবে না? ভদ্রলোক বলে কি?

এদিকে বাঁধনটি না খুললে ছেলেটার হাতটি যাবে। শেষকালে কব্জি থেকে কেটে ফেলে হয়ত বাদ দিতে হবে।

কিন্তু ভদ্রলোক তা বুঝবেন না।

বললেন, আপনাদের তো ভুলও হতে পারে। কাগজে দেখেছি আপনাদের ভুলে অনেক রুগী আজকাল মারা যাচ্ছে। এখন যে ভুল হচ্ছে না, তারই বা গ্যারাণ্টি কি?

সার্জন বিরক্ত হলেন। বললেন, তাহলে আপনি বরং মেডিক্যাল কলেজেই নিয়ে যান। বলেন তো আমরা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দিই।

ভদ্রলোক তাতেও রাজী নন।

ছেলেটা এদিকে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে। ওদিকে অপারেশন থিয়েটারে আমাদের কাজ আছে। কে ভদ্রলোককে বোঝাবে? আর এস এর ওপর ভার দিয়ে আমরা ও টিতে চলে গেলাম।

অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করে করে এক সময় ছেলেটা হঠাৎ চুপ করে গেল। আর এস এসে খবর দিল ভদ্রলোক অবশেষে রাজী হয়েছেন। বাঁধ কাটা হয়েছে। ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। ব্যথা কমে গেছে।

অপারেশনের পর বেরিয়ে দেখি ভদ্রলোক বসে আছেন। বিনীত লজ্জিত মুখে সার্জনকে বললেন, কিছু মনে করবেন না। খুব নার্ভাস ছিলাম। খবরের কাগজ পড়ে আরও বেশী ভয় হয়েছিল। যা বলেছি ঘাবড়ে গিয়ে বলেছি। কিছু মিন করে বলিনি।

শুনে আমরা একটু হাসলাম। ভাবলাম ব্যথা কমে গেছে, তাই এখন ভাল ভাল কথা সব বেরুচ্ছে। না কমলে ইনিই অন্য কথা বলতেন। খবরের কাগজে ডাক্তারের হৃদয়হীনতা ও ঔদাসীন্যের আর একটি কাহিনী ফলাও করে ছাপা হত।

সেদিন নবীনের মা যেই বললেন, হাসপাতালে কি গরীবের চিকিৎসা

হয়, তখনই বুঝলাম, এই নোংরা পরিবেশে রেখেই ছেলেটির চিকিৎসা করতে হবে। এখান থেকে সরানো একে যাবে না।

তাই বললাম, রোজ গা গরম জলে মুছিয়ে দিতে হবে। মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারা। ১০৩° ডিগ্রীর ওপর জ্বর থাকলে বরফ। জামা কাপড় রোজ বদলাতে হবে। গায়ে দিতে হবে পাউডার। চার ঘণ্টা অন্তর জ্বর দেখে লিখে রাখতে হবে। জল খাওয়াতে হবে ৪।৫ সের। তাছাড়া গ্লুকোজ ইনজেক্‌শন দেব রোজ দু বেলা। ১০০ সি সি।

নবীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল।

এইবার বলল, আপনি যা বলবেন তাই হবে। ওষুধ পত্র যা লাগবে লিখে দিন।

লিখে দিলাম।

বাইরে বেরিয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নবীন বলল, সন্ধ্যের সময় চিনে আসতে পারবেন তো? না আমি গিয়ে নিয়ে আসব?

বললাম, একবার যখন দেখে গেলাম, চিনে আসব ঠিক।

সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি রুগীর বিছানা জামা কাপড় সব বদলানো হয়েছে। স্পঞ্জ করিয়ে পাউডার দেওয়া হয়েছে। মাথায় আইস ব্যাগ। ঘরে ধূপ ফিনাইল এবং পাউডারের গন্ধ মিশে নতুন এক গন্ধ উঠছে। আমার বসবার জন্যও এসেছে একখানা জল চৌকি।

রুগীর বুক পরীক্ষা করে নাড়ী দেখে গ্লুকোজ ইনজেক্‌শন দিয়ে চলে এলাম।

রোজ দুবেলা ইন্‌জেক্‌শন দিই। রুগীর কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। দিন দুই পর যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাও চলে গেল। ডাকলে আর সাড়া দেয় না। মুখে জল দিলে কখনও খায় কখনও ফেলে দেয়। জ্বর সেই ১০৪° ডিগ্রী। দু ডিগ্রীর নিচে আর নামে না। আট দশ দিন এমনি করে কেটে গেল। একদিন সকালে গিয়ে দেখি বুকে ঘড়-ঘড় শব্দ। নাড়ীর গতি ভাল নয়।

বললাম—একটু অক্সিজেন দেওয়া দরকার।

নবীন তক্ষুনি অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে এল। নাকে নল ঢুকিয়ে অক্সিজেন দেওয়া শুরু হল।

পরদিন রুগীর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মুখে চামচে করে দিলেও গেলে না। বাইরে গড়িয়ে আসে।

দেখে বললাম, খাওয়া বন্ধ হলে বাঁচানো যাবে না কিছুতেই। এমনি না

পারলে টিউব ঢুকিয়ে খাওয়াতে হয়।

অক্সিজেন দেওয়া দেখেই নবীনের মা বুঝেছিলেন, ছেলে বাঁচবে না। টিউব ঢোকাবার কথায় কেঁদে ফেললেন।

বললেন, আর না। অনেক তো হল। আর কষ্ট ওকে দেবেন না।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা অবস্থা দেখে মনে হল আজ রাত আর কাটবে না। সমস্ত বুকে জল জমে গেছে। ঘড়-ঘড় শব্দ বেড়েছে। মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। হার্ট ফেইলিওর শুরু হয়েছে। জ্বর বেড়ে ১০৫° ডিগ্রী উঠেছে। অতি কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে। নাসারন্ধ্র স্ফীত। সঙ্কুচিত গলার মাংসপেশী।

এট্রোপিন, স্ট্রিকনিন, কোরামিন ইন্‌জেক্‌শন দিয়েও কোনো পরিবর্তন আনা গেল না। উপকার হল না। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল।

সন্ধ্যা পেরিয়ে তখন রাত্রি হয়েছে। আটটা বেজে গেছে। নটা থেকে কারফিউ। ভোর ছটা পর্যন্ত।

নবীন মিনতি করে বলল, আজ রাতটা এইখানেই থেকে যান।

রোগের সংগে লড়াই করে করে রুগী এখন হার মেনেছে। মৃত্যু শুধু শিয়রে দাঁড়িয়ে নেই। রোগীর দেহে এসে প্রবেশ করেছে। প্রাণের যেটুকু ক্ষীণ স্পন্দন এখনও বর্তমান, মনে হল, রাত বারোটার মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো ওষুধ, কোনো ইন্‌জেক্‌শনেই আর তাকে জিইয়ে রাখা যাবে না।

এ অবস্থায় আমি থেকে আর কি করব? এদিকে রাত নটা থেকে আবার কারফিউ। আমার কোনো পারমিট নেই। দু তিন ঘণ্টা পর মৃত্যু হলেও যে বাড়ি চলে আসব তারও কোনো উপায় নেই। এদের এই একটি মাত্র ঘর। বাকি রাত থাকব কোথায়?

পয়সাওয়ালা ঘর হলে কিন্তু এত কথা ভাবতাম না। থেকে যেতাম। জানতাম যত কষ্টই হোক বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ পাব। উপার্জন হবে। কিন্তু নবীনকে সে কথা বলা চলবে না। ও যদি বোঝে টাকা দিলেই আমাকে রাখা যায়, তাহলে ধার করে ভিক্ষা করে যেমন করেই হোক টাকা ও দেবেই। এমনিতেই বেচারা এই অসুখে দেনায় ডুবে গেছে। তার ওপর অনর্থক এই বাড়তি বোঝা ওর ঘাড়ে চাপাতে পারব না।

নবীন আবার বলল, আপনার খুব কষ্ট হবে। তবু থাকুন দয়া করে।

বললাম, আমি থাকলে রোগীর জীবনীশক্তি বাড়াবার এতটুকু আশাও যদি থাকত, নিশ্চয় আমি থেকে যেতাম। নিজের কষ্টের কথা কখনও

ভাবতাম না। কিন্তু আমার তো ভাই করবার কিছু নেই। ইন্‌জেক্‌শন যা দেবার ছিল, সবই তো দিয়ে ফেলেছি। রাতে আরও ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া চলবে না। দিলে ক্ষতি হবে।

নিতান্ত অসহায়ভাবে শুকনো মুখে নবীন বলল, তাহলে?

মনে হল কিছু একটা ভরসা ও চায়। একটা কোনো ওষুধ ওর হাতে দিতে হয়। তাহলেও একটু আশা অন্তত থাকবে। জোর পাবে।

রুগী এদিকে ওষুধ পথ্য কিছুই গেলে না। কি দেব?

হঠাৎ মনে পড়ল ব্যাগে তো ইথার আছে। উগ্র তার গন্ধ। দু আউন্সের একটা শিশিতে ঐ ইথার ভরতি করে দিলাম। তুলোয় একটু ঢেলে রুগীর নাকের কাছে ধরলাম।

বললাম, আধ ঘণ্টা পর পর এমনি করে তুলোয় ঢেলে এই ওষুধটা নাকের কাছে ধরে রেখ। কাজ যদি হয় এতেই হবে।

তখন রাত প্রায় নটা। কারফিউ-এর আর দেরি নেই। তাড়াতাড়ি রিক্‌শা করে বাড়ি ফিরে এলাম।

নবীনকে বলে এলাম ভোর ছটায় কারফিউ শেষ হলেই যেন আমার কাছে আসে। খবরটা দেয়।

রোগীর চিকিৎসা শেষ হয়েছে, কিন্তু আমার কাজ এখনও মেটেনি। ডেথ্ সার্টিফিকেট দিতে হবে। ভোরবেলা এটি নবীনের হাতে দিলে তবে আমার ছুটি।

মনের ভেতর উদ্বেগ থাকলে রাতে ঘুম ভাল হয় না। আজও হল না। বার বার মনে হল কে যেন ডাকছে। কড়া নাড়ছে।

এমনিতেই একটু দেরি করে উঠি। আজ কিন্তু ছটার আগেই উঠে পড়লাম। চাকরটাকে ডেকে তুলে চা তৈরি করতে বললাম।

ছ-টা বাজল। কারফিউ শেষ হল। ট্রাম বাস চলা শুরু হল। রাস্তায় লোকজন বেরুল। নবীনের কিন্তু দেখা নেই।

ছ-টা বাজতে না বাজতেই নবীন আসবে। ডেথ্ সার্টিফিকেট নিয়ে যাবে। এ যেন ধ্রুব সত্য ছিল। ওর এই দেরিতে সব যেন কেমন ভেস্তে গেল। মনে হল ভাইএর শোকে নিশ্চয় খুব মুষড়ে পড়েছে। কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিতে বেরিয়েছে। ডেথ্ সার্টিফিকেট নেওয়াটাও যে একটা অবশ্য কর্তব্য, সে খেয়াল হয়নি।

আটটার সময় একটা কাজ ছিল। এক বাড়িতে অপারেশন হবে। সার্জন আসবেন। নার্স আসবে। ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছুতে হবে।

স্নান সেরে পোশাক পরে তৈরী হলাম। তবু নবীনের কোনো পাত্তা নেই। আমিই বা আর কি করব? কতক্ষণ ওর জন্য বসে থাকব? কিন্তু একবার বেরুলে কখন যে ফিরতে পারব, তার কোনো ঠিক নেই। এদিকে ডেথ্ সার্টিফিকেট না পেলে নবীন বেচারা মহা মুশকিলে পড়বে। শবদাহ করতে পারবে না।

কি করি? একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে রেখে যাব? চাকরকে বলব, নবীন এলে ওর হাতে দিতে? কিন্তু তাই বা করব কি করে? সে যে সাংঘাতিক বে-আইনী।

এইবার ওর ওপর রাগ হল। ভয়ানক বিরক্ত হলাম। ওর যদি এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান না থাকে, আমি তার কি করব? ও যদি ভোগে নিজের দোষেই ভুগবে। যে বাড়িতে যাচ্ছি, সেই ঠিকানা চাকরের কাছে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেবে দেখি নবীন আসছে।

কিন্তু এ কি? ওর চলনে ওর মুখে সদ্য শোকের সেই বিষাদক্লিষ্ট করুণ চিহ্ন কোথায়? এ যে হাসি-হাসি জ্বলজ্বলে চোখ মুখ।

মাথা নিচু করে হাঁটছিল। মুখ তুলে আমাকে দেখেই খুশীতে কৃতজ্ঞতায় একগাল হেসে ফেলল। দু হাত তুলে নমস্কার করে বলল, কী চমৎকার ওষুধই যে কাল শোঁকাতে দিয়েছিলেন। বার দুয়েক শোঁকবার পরই নিঃশ্বাসটা সহজ হতে শুরু হল। কষ্টটা যেন কমে গেল। জ্বরটাও কমছে। ভোরের দিকে চোখ মেলে খেতে চাইল। বেশ জ্ঞান হয়েছে। হরলিকস খেয়েছে।

দেখুন দেখি কি কাণ্ড! এদিকে আমি ডেথ সার্টিফিকেট দেবার জন্য সকাল থেকে ছটফট করছি। ভাগ্যিস কথাটা নবীন জানে না। জানলে কি লজ্জাটাই না পেতাম। ওর কাছে প্রেসটিজ বলে কিছু আর থাকত না।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, খুব ভাল খবর। জ্ঞান যখন একবার ফিরেছে, তখন আর ভয় নেই। ওষুধেরও আর এখন দরকার নেই। দুপুরে যাব। তখন দেখে যা হয় ব্যবস্থা দেব।

নবীন তখনও আমার সেই শোঁকাবার ওষুধের অলৌকিক গুণে মুগ্ধ।

বলল, এত ভাল ওষুধ! লাগাতে না লাগাতেই ফল। ওটার নাম কি ডাক্তারবাবু?

এতক্ষণে আমি সামলে গেছি। চোখে-মুখে বিজ্ঞজনোচিত ভারিক্কিভাব আনতে সমর্থ হয়েছি।

ডাক্তারী চালে গম্ভীর হয়ে বললাম, ওটা একটা স্টিমুল্যান্ট।

খুশী-খুশী মুখে নবীন বলল, আশ্চর্য কাজ করেছে কিন্তু। ইন্‌জেক্‌শনের চেয়েও বেশী জোরালো। কি কড়া গন্ধ।

দুপুরে গিয়ে দেখি রুগীর অবস্থা সত্যি খুব ভাল। নিঃশ্বাসের কোনো কষ্ট নেই। বুক পিঠ সব পরিষ্কার। ঘড়ঘড়ানি নেই। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক। পেট ফাঁপা কম। বেশ জ্ঞান হয়েছে। কথা বলছে। হাসছে।

দেখে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। সেই যে রুগী ভাল হতে শুরু করল সাতদিনের মধ্যেই উঠে বসল। ভাত খেল।

প্রফেসরের কথা মনে পড়ল।

বলেছিলেন, চোখদুটোকে তৈরি কর। দেখতে শেখ।

প্রথম যেদিন এই রুগী দেখি ভেবেছিলাম চোখদুটি খুব তৈরি হয়েছে। দেখতে শিখেছি।

আজ বুঝলাম মোটেই চোখ তৈরি হয়নি। দেখতে কিছুই শিখিনি। এখনও কিছু বুঝি না।

॥ ২০ ॥

ডাক্তারের ডায়েরী এইখানেই শেষ। আর লিখব না। কারণটা বলি।

প্রথম যখন লিখি, ভয় ছিল পাঠকদের হয়ত এটা ভাল লাগবে না। এখন সে ভয় নেই। এখন যা ভয় সে অন্য। আমার যারা মক্কেল, যাদের ঘরে চিকিৎসা করে আমি সংসার চালাই, তারাই দেখছি ভয় পেয়েছে। আমার ওপর ভরসা পাচ্ছে না। মনে সংশয় ঢুকেছে কখন না জানি তাদেরই কোনো গোপন কথা ফাঁস করে দিই, ডায়েরীতে লিখে ফেলি।

এই এক বছরে, যেদিন থেকে এই ডায়েরী বেরুচ্ছে, অনেক নতুন রুগী অনেক জায়গা থেকে বহু ক্লেশ স্বীকার করে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠি দিয়েছেন, দেখা করেছেন। দেখেছি সকলেরই ঐ এক ভয়। কবে না জানি তাঁদের কথাও লিখে ফেলি। কথা দিয়েছি, লিখব না।

ভদ্রলোকের কথা, খেলাপ করা চলবে না। তাই এঁদের কথাও লেখা যাবে না। ভাবছি যদি ভদ্র না থাকি, কথা না রাখি তাহলে কি হয়? মজার মজার কত কথাই না বলা যায়। চমকদার কত কাহিনীই না শোনানো যায়। কিন্তু তার উপায় কই? ডাক্তারী করেই যখন খেতে হবে তখন ঐ সব গোপন কথা লিখব কোন সাহসে?

পারা যায়, যদি ডাক্তারী ছেড়ে কলম ধরি, লেখাকেই পেশা করি। কিন্তু সে ক্ষমতাই বা কোথায়, আর সে হিম্মতই বা কই?

বিলেতের কয়েকজন নামজাদা ডাক্তার চিকিৎসা ছেড়ে লিখিয়ে হয়েছেন। লেখাই জীবনের পেশা করেছেন। তাঁদের ভাগ্য ভাল। প্র্যাকটিস করে কখনও যা পান নি, লিখে তা পেয়েছেন। যশ, মান এবং অর্থ।

আমার ভাগ্য অন্য। লিখতে শুরু করে দেখছি পুরোনো রুগী হাতছাড়া হয়ে যায়, আত্মীয় বন্ধুরা চটে যায়, আর বিনা পয়সার রুগী বাড়ে। লিখে যা পাই তা দিয়ে সংসার চলে না। অতএব বলুন দেখি কি করি?

তাই ঠিক করেছি, এখন থেকে ডাক্তারীই শুধু করব। আর লিখব না।

ডাক্তারী যখন পড়ি, মনে হত, ডাক্তার হলেই বুঝি সব দুঃখ কষ্ট দূর হবে। হাতে পয়সা আসবে। বাপ মার কাছে টাকার জন্য হাত পাততে

হবে না।

এখন বাবা-মার কাছে হাত পাতি না ঠিক, কিন্তু রুগীদের কাছে পাতি। কেউ কিছু দেয়, কেউ দেয় না।

পাশ করেই দেখলাম, টাকা ঘরে আসে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ধুতি-পাঞ্জাবী ছেড়ে স্যুট-বুট করাতে হয়, যন্ত্রপাতি সব কিনতে হয়। ঘরের পয়সায় কুলোয় না। ধার হয়।

তখন ধার করতে সংকোচ হত। লজ্জা হত। এখন সে সব হয় না। রোজগার যত বাড়ছে, ধারও ততই বাড়ছে, লজ্জাও ততই কমছে।

রুগীর পকেটের পয়সা নিজের হাতের মুঠোয় আনা, এরই নাম প্রাইভেট প্র্যাকটিস্। এই কাজে যে যত বেশী ওস্তাদ, তার প্র্যাক্‌টিস্ তত বেশী ভাল।

এই কাজটি আবার নিতান্ত সহজ কর্ম নয়। চিকিৎসা-বিদ্যার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় এ বিদ্যাটি শেখায় নি। কাজে-কাজেই এই কায়দাটি আগে কিছুই জানতাম না। এখন বেশ শিখেছি। তবু মাঝে মাঝে ঠকে যাই, বোকা বনি। রুগীর বুদ্ধির কাছে হার মানি। পকেটে পয়সা আছে জানি, তবু তা কৌশলে বার করে নিজের পকেটে আনতে পারি না।

এই বিদ্যাটি শিখতে পাশ করার পরেও অনেকদিন লাগে, অনেক বুদ্ধি খরচ হয়। পাশ করার পর সকালে যখন হাসপাতালে কাজ করি, তখন বিকেলে এক বন্ধুর ডিস্‌পেন্সারীতে আড্ডা দিতে যেতাম। তাস খেলা হত।

একদিন গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক দশ বারো বছরের একটি ছেলেকে দেখাতে এনেছেন। ভদ্রলোক বিজ্ঞানের প্রফেসর। তাঁরই ছোট ভাই আমাশা হয়েছে আজ তিন চার দিন।

বন্ধুটি সব শুনে ছেলেটাকে টেবিলে শুইয়ে পেট টিপে, জিভ দেখে, স্টেথোস্কোপ বার করে বুক দেখল। চোখের পাতা টেনে টর্চ ফেলে চোখ দেখল, কানের ফুটো আর গলা দখল। অবশেষে ব্লাডপ্রেশারের যন্ত্রটি ঐ ছেলের বাহুতে বেঁধে প্রেসার দেখল।

দেখা শেষ হলে বলল—আমাশাই হয়েছে, আর কোনো দোষ নেই। এই ওষুধটা নিয়ে যান। কাল সকালে একবার খবর দেবেন।

এই বলে খস্‌খস্ করে একটা মিক্‌শ্চার লিখে দিল।

ভদ্রলোক ওষুধ নিয়ে বিদায় হলে বন্ধুটিকে বললাম—অতটুকু

রুগী; তার ব্লাডপ্রেশার? প্যাঁচটা কি ভাই?

বন্ধুটি বছরখানেক আগে এই দোকান খুলেছে। এমন একটা ভাব দেখাল যেন আমার চেয়ে কত বেশী পণ্ডিত! কত বেশী সিনিয়র!

ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বলল—তোরা হাসপাতালে কাজ করিস, ওসব বুঝবি না।

বললাম—কেন?

বন্ধু বলল—ঐ প্রেশারটি দেখলাম বলেই ঐ রুগীটি এখানে আটকে গেল। আর কোনো ডাক্তারের কাছে যাবে না। গেলেও এইখানেই ঠিক ফিরে আসবে। এইখানেই বাঁধা থাকবে।

বিস্মিত হয়ে বললাম—কি রকম?

বন্ধু বলল—আর কোনো ডাক্তার তো অত বাচ্চা রুগীর ব্লাডপ্রেশার দেখবে না। কাজেই ও ভাববে এখানেই বেশী যত্ন নেওয়া হয়। ভাল করে পরীক্ষা করা হয়। অতএব এখানেই আসবে। এসব না করে যদি শুধু এম বি ট্যাবলেট আর এণ্টেরো-ভায়োফর্ম লিখে দিতাম তাহলে আমার কি লাভ হত?

তক্ষুনি বললাম—রুগীর রোগ সারত। আর ডাক্তারের সুনাম হত।

বিজ্ঞের মত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বন্ধু বলল—রুগীর রোগও সারত না, আমারও বদনাম হত।

আশ্চর্য হয়ে, তর্ক তুলে বললাম—কেন?

বন্ধু বলল—যতদিন ধরে ওষুধ খেলে অথবা ইন্‌জেক্‌শন নিলে আমাশা সারে ততদিন ওষুধ খায় কে? ইন্‌জেক্‌শন কে নেয়? যেই পেট একটু ভাল হল, অমনি ওষুধ বন্ধ। ইন্‌জেকশ্‌ন বন্ধ।

বললাম—তাতে তোর কি? এডভাইস তো তুই ঠিক দিলি। যদি না মানে সে রোগীর দোষ।

বন্ধু বলল—আরে ভাই, আমার এডভাইস শুনবে কে? প্রথমদিনই যদি ফল দেখাতে না পারি রুগী অন্য ডাক্তারের কাছে যাবে। আর যদি প্রথমেই ঐ এম বি ট্যাবলেট আর এন্‌টেরোভায়াফর্ম লিখে দি, ফল ঠিক পাবে কিন্তু আর ডাক্তার দেখাবে না। যখনি অসুখ বাড়বে দোকান থেকে আমার প্রেস্‌-ক্রিপ্‌সন দেখিয়ে ঐ অষুধ কিনে খাবে। নিজেরও রোগ সারবে না, ডাক্তারকেও কিছু দেবে না। মাঝখান থেকে বদনাম হবে আমার অষুধে রোগ সারে না।

বললাম—কিন্তু স্টুলটা দেখা উচিত ছিল না কি?

বন্ধু বলল—নিশ্চয় ছিল। এবং দেখা হবেও। কিন্তু ধীরে। সইয়ে সইয়ে। পয়লা দিনই অত খরচের ধাক্কায় ফেললে রুগী ভড়কে যায়। ভেগে পড়ে। সস্তার চিকিৎসা খোঁজে। কাজেই সইয়ে সইয়ে এসব করতে হয়।

অনেক ডাক্তার আবার এত ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে পারেন না। প্র্যাক্‌টিসের এই কায়দাটি রপ্ত করতে পারেন না। কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। এক এক সময় ক্ষেপে যান। 'দূর ছাই' বলে প্র্যাক্‌টিস ফেলে চাকরি খোঁজেন। সেদিন রাস্তায় হঠাৎ এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বিশ বছর প্র্যাক্‌টিস্‌ করে এখন চাকরি নিয়েছেন।

বললেন—মশাই, বেশ আছি। প্র্যাক্‌টিস্‌ ছেড়েছি না বেঁচেছি। দু তিনটে ফার্মের ডাক্তার। চাকরি করি। কোনোটায় দু-ঘণ্টা, কোনোটায় বা তিন ঘণ্টা। সব মিলিয়ে যা পাই, সংসারের খরচা বেশ চলে যায়। কখন রুগী আসবে আর কী প্যাঁচ কসে তার পকেট থেকে পয়সা বার করব নিত্য অত ভাবতে হয় না। এ বেশ আছি। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। রোজ সকালে উঠে প্রার্থনা করি হে ভগবান, আর যেন রুগী দেখে পয়সা নিতে না হয়, প্র্যাক্‌টিস্‌ না করতে হয়।

এই পাড়ায় যখন প্রথম আসি, এখানকার এক প্রবীণ চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ হল। প্রাচীন লোক। খুব আমুদে। অনেক সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। খুব ভাল প্র্যাক্‌টিস্‌। সকাল বিকেল সব সময় রুগীরা এঁর বসবার ঘরে ভিড় করে থাকে।

বললেন—প্র্যাক্‌টিস বজায় রাখা ভাই বড় কঠিন। দিনকে দিন আরও কঠিন হচ্ছে। সাংঘাতিক কম্পিটিশন। বাজ পাখীর মত চোখ সর্বদা সতর্ক রাখবে। একটু ঢিল দিয়েছ, একটু অন্যমনস্ক হয়েছ, কি আর একজন এসে তোমার রুগী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। এই দেখ না, এ পাড়ায় প্র্যাক্‌টিস্‌ করছি আজ তিরিশ বচ্ছর। কত ডাক্তার এল, আর কত উঠে গেল। কিন্তু আমি ঠিক টিঁকে আছি।

শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিগলিত হয়ে বললাম—কি করে স্যার? কি সেই সিক্রেট?

ভদ্রলোক বললেন—বাজারের কাছে যে পুরনো তেতলা বাড়িটা দেখছ, ওরা আমার পঁচিশ বছরের মক্কেল। যখন যা হয় আমাকেই ডাকে। সেই বাড়িতে ১০।১২ বছরের একটি ছেলের একবার টাইফয়েড হল। আমি কিন্তু জানি না। আমাকে না ডেকে বাজারের ওপর নতুন ডিস্‌পেন্সারীর

নতুন ডাক্তারকে ডেকে দেখাচ্ছে। সে আবার এক বড় ডাক্তারকে কন্‌সালটে-শনে এনেছে। একদিন ঐ পথ দিয়ে রুগী দেখে ফিরছি, দেখলাম, ঐ বাড়ির সামনে বড় ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়ে। এই বাড়ির অসুখ, বড় ডাক্তার এসেছে, আমায় কোনো খবর দেয়নি, ভারি আশ্চর্য বোধ হল। কেমন একটা খটকা লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি করলেন? বাড়িতে ঢুকে পড়লেন? ভদ্রলোক চটে গেলেন। বললেন—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি প্র্যাক্‌টিস্‌ করবে? তোমার কিচ্ছু হবে না।

বললাম—তাহলে?

ভদ্রলোক বললেন, আর না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। কম্পাউণ্ডারকে পাঠালাম খবর আনতে। নীচের দোকান থেকে কম্পাউণ্ডার সব খবর নিয়ে এল। ছেলেটার সত্যি টাইফয়েড। দিন পনেরো হল। নতুন ডাক্তার দেখছে। আমাকে নাকি আর ডাকবে না।

বিস্মিত হয়ে বললাম—কেন? আপনার ওপর হঠাৎ এত চটল যে?

ভদ্রলোক বললেন—ওসব চটা-ফটা ভাই কিচ্ছু না। সব বোগাস্‌। নতুন নতুন ডাক্তার প্র্যাক্‌টিসের জন্য অনেক ভুজুং-ভাজুং দেয়। বলে বুড়োরা সব ওল্ড ফসিল। নতুন চিকিৎসা জানে না। এই আর কি? রুগীরাও ফাঁদে পড়ে। কিন্তু এই বুড়ো হাড়ে কী ভেল্কি যে খেলে ঐ ছোকরা ডাক্তার তা জানবে কি করে? দিলাম এক খেল্‌ দেখিয়ে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—কি দেখালেন?

ভদ্রলোক বললেন—পরদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। এক হাতে এক ঘটি জল। আর এক হাতে এক মুঠো কাদা।

অবাক হয়ে বললাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন—আমাকে ভেজা কাপড়ে ঐ অবস্থায় দেখে ছেলের বাবা মা তো হতভম্ব। ছেলের বাবা হাত কচলাতে কচলাতে অপ্রস্তুত মুখে বলল—এই যে ডাক্তারবাবু! আসুন, আসুন।

নির্লিপ্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললাম—কাল রাত্রে শুনলাম ছেলেটার টাইফয়েড। দিন পনেরো থেকে ভুগছে। বড় ডাক্তার দেখছে। শুনে মনে ভারি উদ্বেগ হল। আহা, অমন ফুটফুটে ছেলেটা! আমারই হাতে তো ওর জন্ম হয়েছে।

রাত্রে ভাল ঘুম হল না। স্বপ্ন দেখলাম মা কালী এসে যেন বলছেন

এইজন্য কেন মিছে ভয় পাচ্ছিস? কাল ভোরে গঙ্গাস্নান করে একঘটি গঙ্গাজল নিয়ে এসে ফুটিয়ে ওকে খেতে দে। আর ঘাটের পাশের গাছ-তলা থেকে গঙ্গামৃত্তিকা এনে পেটের ওপর প্রলেপ লাগা। সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই বাবা এই একঘটি গঙ্গাজল আর এই এক মুঠো গঙ্গামৃত্তিকা নিয়ে এসেছি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। বললাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন—তারপর আর কি? নতুন ডাক্তার বিদেয় হল। আমার চাকরি পাকা হল। রুগী সেরে উঠল।

আশ্চর্য হয়ে বললাম--সে কি? কি করে?

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন—গঙ্গাজল খেতে দিয়েছি বয়েল করে। আর পেট ফাঁপার জন্য গঙ্গামৃত্তিকার কোল্ড কম্প্রেস্। টাইফয়েডের আর কি চিকিৎসা আছে হে?

এত বুদ্ধি খাটিয়ে, এত হাঙ্গামা করে যে প্র্যাকটিস বজায় রাখতে হয়, এতটুকু অসতর্ক হলে যা তাসের ঘরের মত ভেঙে যায়, খামোখা এই ডায়েরী লিখে তা নষ্ট করি কি করে? এর পরে আরও লেখা চলে কি?

— সমাপ্ত —